ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

[Political Economy of Land Laws
Khas Land, Jalmahal, Acquisition and Requisition, and Land Use Laws, Policies and Implementation Problems in Bangladesh]

স্বত্ব ২০২২ © লেখকবৃন্দ

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে অরনি বারকাত
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৫৮১৫০৩৮১ মোবাইল: ০১৯৭৭৯৯২২৬৮, ০১৭৫৬১৪২৩১৫
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

ISBN: 978-984-95689-4-0

লেখকবৃন্দ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারীবৃন্দের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

এই গ্রন্থের বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট মাঠজরিপ কাজে গবেষণা সহায়তা দিয়েছে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'। গ্রন্থে বিবৃত সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-এর দায়-দায়িত্ব রচয়িতাদের, সহায়ক প্রতিষ্ঠান এইচ ডি আর সি, নিজেরা করি এবং আইসিসিও কোঅপারেশন-এর নয়।

HDRC নিজেরা করি nijera kori icco COOPERATION

মূল্য: ৬০০ টাকা, ইউএস ৪০ ডলার, ইউরো ৩০, ব্রিটিশ পাউন্ড ২৫

উদ্ধৃতি সুপারিশ: বারকাত, আবুল., ওসমান, আসমার., সোহ্‌রাওয়ার্দী, গাজী, মোহাম্মদ., এবং ইসলাম, মো. অলিউল (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

ভূমিহীন-দরিদ্র-প্রান্তিক ও আদিবাসী মানুষকে—

সূচিপত্র

ভূমিকা		*xiii-xv*
কৃতজ্ঞতা		*xvii-xx*
মুখবন্ধ: বড় পর্দায় ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা		**১-৩৩**
অধ্যায়		
১	**সূচনা**	**৩৫**
	প্রেক্ষিত	৩৬
	উদ্দেশ্য	৩৯
	গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্বিয় বিষয়াদি	৩৯
	অধ্যায় বিন্যাস	৫৪
২	**কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত**	**৫৭**
	২.১ ভূমিকা	৫৮
	২.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত	৬০
	২.৩ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	৬৩
	২.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬৬
	২.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা	৬৮
	২.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ	৮৪
	২.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং	৮৯
	২.৮ সুপারিশমালা	৯২
৩	**অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত**	**৯৫**
	৩.১ ভূমিকা	৯৬
	৩.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত	৯৭
	৩.৩ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	৯৯
	৩.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	১০২
	৩.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা	১০৩
	৩.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ	১০৮
	৩.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং	১১৩
	৩.৮ সুপারিশমালা	১১৬

৪ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ১১৯

৪.১ ভূমিকা ১২০
৪.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১২৩
৪.৩ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১২৪
৪.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতি: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১২৮
৪.৫ নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা ১৩০
৪.৬ নীতির ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ১৪০
৪.৭ নীতি এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং ১৪৯
৪.৮ সুপারিশমালা ১৫১

৫ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ১৫৫

৫.১ ভূমিকা ১৫৬
৫.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৫৭
৫.৩ অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ১৫৮
৫.৪ একনজরে বিদ্যমান আইন: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৬২
৫.৫ আইন বাস্তবায়ন সমস্যা ১৬৫
৫.৬ আইনের ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ১৭৩
৫.৭ আইন এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং ১৮০
৫.৮ সুপারিশমালা ১৮৩

৬ ভূমি ব্যবহার ১৮৭

৬.১ ভূমিকা ১৮৯
৬.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৯০
৬.৩ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ১৯১
৬.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৯৪
৬.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা ১৯৬
৬.৬ নীতির ব্যত্যয়: দু'টি বাস্তব উদাহরণ ২০১
৬.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং ২০৭
৬.৮ সুপারিশমালা ২১০

৭ উপসংহার ২১৩

তথ্যপঞ্জি ২২১

ছক

ছক ১ স্কোরিং-মান দিয়ে 'আইন' ও 'আইন বাস্তবায়ন' অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকাঠামো ১৯

সারণি

সারণি ১	"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি সমস্যার নমুনা স্কোরিং	৫১
সারণি ২	"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যার নমুনা স্কোরিং	৫২
সারণি ৩	খাসজমিসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও এর সংশোধনীসমূহ	৬১
সারণি ৪	স্কোরিং—আদর্শ আইন থেকে প্রকৃত আইনের দূরত্ব ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২১৪
সারণি ৫	স্কোরিং—আইন বাস্তবায়নের আদর্শ অবস্থা থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের দূরত্ব ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২১৫

লেখচিত্র

লেখচিত্র ১	"আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন"-এর পরিমাপ-সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহ	২০
লেখচিত্র ২	স্কোরিং—"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি অবস্থা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫১
লেখচিত্র ৩	স্কোরিং—"ঋ-আইন, ২০২২" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫৩
লেখচিত্র ৪	"ঋ-আইন, ২০২১": আইন এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫৩
লেখচিত্র ৫	বাংলাদেশে খাসজমির প্রকারভেদ	৫৯
লেখচিত্র ৬	বিগত ২০০ বছরে খাসজমিসম্পর্কিত আইন ও সংশোধনীর বিবর্তন	৬১
লেখচিত্র ৭	স্কোরিং—'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭'-এর আইনি সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯০
লেখচিত্র ৮	স্কোরিং—'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯১
লেখচিত্র ৯	'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯২
লেখচিত্র ১০	স্কোরিং—'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর আইনি সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১১৪

লেখচিত্র ১১ স্কোরিং—'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১১৫

লেখচিত্র ১২ 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১১৫

লেখচিত্র ১৩ ২০ একরের নিচের জলমহালের ইজারা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ ১৩৫

লেখচিত্র ১৪ স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৪৯

লেখচিত্র ১৫ স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৫০

লেখচিত্র ১৬ 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯': নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৫১

লেখচিত্র ১৭ স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৮১

লেখচিত্র ১৮ স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৮২

লেখচিত্র ১৯ 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭': আইন এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ১৮২

লেখচিত্র ২০ স্কোরিং—'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ২০৮

লেখচিত্র ২১ স্কোরিং—'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ২০৯

লেখচিত্র ২২ 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১': নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ২০৯

লেখচিত্র ২৩ গবেষণাকৃত ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং বাস্তবায়ন সমস্যার তুলনামূলক চিত্র ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো) ২১৬

পরিশিষ্ট		**২৩১**
১	গবেষণাধীন ভূমি আইন ও নীতিমালাসমূহ	২৩৩-৩০৩
২	হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত পূর্বের গবেষণানির্ভর সংশ্লিষ্ট আইনি প্রস্তাবনাসমূহ	৩০৫-৩৫৭
৩	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ	৩৫৯-৩৭৬
৪	এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষণাদল	৩৭৭-৩৭৯
নির্ঘণ্ট		৩৮১-৪১১

ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষ চিরকালই অধিকারবঞ্চিত। বিশেষ করে, যারা অর্থনৈতিক বিচারে দরিদ্র, ধর্মীয় সম্প্রদায়, পেশার নিরিখে সংখ্যালঘু—তাদের বঞ্চনা ও অধিকারহীনতা সর্বত্র। নারী, যারা এ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, তারা কিছু মাত্রায় ক্ষমতায়িত হয়েছেন বটে, তবে তাদের মুক্তি এখনো সুদূরপরাহত। এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, একটি সুসংহত আইনি ব্যবস্থা মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেল, অথচ এমন একটি মানবিক আইনি কাঠামো দাঁড়াল না—যা মানুষের সার্বিক ও মানবিক বিকাশকে সহজ করবে। তার ওপর, আমাদের পুরো আইনি ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনো রয়ে গেছে সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার হীন অভিপ্রায়; অগুনতি আইনি অসংগতির কথা তো বলাই বাহুল্য।

কত রকম সরকারই তো আমরা দেখেছি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়—রাজনৈতিক, অর্ধরাজনৈতিক, ছদ্মরাজনৈতিক, অরাজনৈতিক। দেখেছি নানান রঙে, নানান মোড়কে আচ্ছাদিত প্রশাসনসহ সরকারের নানান হাতিয়ার। ন্যায্য একটি আইনি কাঠামো প্রণয়নে নানান সময়ে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও সেগুলো এতটাই বিচ্ছিন্ন-দূরদৃষ্টিহীন-জনসংযোগহীন ছিল যে ওই আইনি পরিবর্তনের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। পাশাপাশি এ কথাও নিরেট সত্য যে, আমাদের দেশে অনেক নীতি আর আইন আছে বটে– কিন্তু, সেগুলো কালো অক্ষরের ঘেরাটোপে আজো বন্দী; আইন ও তা বাস্তবায়নের মাঝে ব্যবধান বিস্তর। তেমনি, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সদিচ্ছার অভাবে একটি ভালো আইনের মন্দ প্রয়োগও অতি সাধারণ একটি বিষয়। আর এ কথা তো দিবালোকের মতোই পরিষ্কার—আমাদের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোটাই এমন যে তা জনমানুষের দুর্ভোগে বিচলিত নয় মোটেও। উল্টো, ভোগান্তি উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামোই চিরকাল হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটেছে, হাঁটছে।

পরিতাপের বিষয়, যে দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা আবর্তিত হয় জমি-জলা-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে; যে দেশের প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে কৃষকের হাতে—সে দেশের ভূমি আইনগুলো জনবান্ধব নয়, কৃষিবান্ধব নয়, পরিবেশ-প্রতিবেশ বান্ধবতো নয়ই। বিশেষ করে, যারা আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী—দরিদ্র মানুষ, নারী– তাদের জন্য ভূমি আইন যেন আরো বৈরী, খড়গহস্ত। সর্বোপরি, দগদগে ঘায়ের মতো আইন এবং তা বাস্তবায়নের মাঝে চোখে পরে

বিপুল এক দূরত্ব। আইনের ভালোটুকু পালিত হয় না, পালিত হয় মন্দটুকু। আইনে যা বলা আছে তা পালনে বিস্তর অনীহা, যা বলা নেই সেটি পালনের মহোৎসবই যেন সর্বত্র দৃশ্যমান। জাল যার জলা তার নয়, যিনি কৃষক তিনি ভূমিহীন। ভূমির সঠিক ব্যবহার আজো নিশ্চিত হলো না, বেঠিক ব্যবহারই যেন নিয়ম। প্রান্তিক মানুষের নেই ভূমিতে মালিকানা, এমনকি অভিগম্যতাবঞ্চিতও সে। ক্ষমতাকাঠামোর বাইরের মানুষ যারাই—এ দেশের প্রায় সবাই, ভূমি বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমায় তারাই নিঃস্ব, ক্ষতিগ্রস্ত।

এমনি এক বৈরী-প্রতিকূল পরিবেশে, ১৯৮০ সাল থেকে কাজ, করছে 'নিজেরা করি'। আমাদের লড়াই সমাজের ক্ষমতাকাঠামোর সাথে। জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবরকম নির্যাতন ও বঞ্চনামুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রাম নিজেরা করি'র সাংগঠনিক উদ্দেশ্য। শুরু থেকেই আমরা গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য ও বিপন্নতার কারণ নির্ণয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। মজুরিশ্রমিক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি এবং অন্যান্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী প্রথম থেকেই আমাদের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। আমাদের সৌভাগ্য, এই লড়াইয়ের সাথি হয়েছেন দেশে-বিদেশে আমাদের অনেক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। সহমর্মী অনেক সংগঠন হয়েছে আমাদের সঙ্গী। অনেক আনন্দ-বেদনার সহচর আমার সহকর্মী এবং দলের সদস্যদের মানুষের অধিকার আদায়ের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তার কোনো তুলনা নেই। সময়োপযোগী, গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণাগ্রন্থের প্রকাশলগ্নে আমি তাদের সবার ভূমিকাকে অকণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের নিত্য বিশ্বাস, 'চেতনায়নেই উন্নয়ন'। মানুষকে অজ্ঞতায় রেখে কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। আমরা জানি, প্রামাণ্য-গবেষণানির্ভর জ্ঞান ছাড়া যেকোনো অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হয়ে ওঠে দুরূহ থেকে দুরূহতর। খেলো আর চটজলদি বাজার পায় এমন কথায় সভা-সেমিনার গরম করা যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে জীবনপরিবর্তনকারী সংগ্রামে সাফল্যের জন্য চাই প্রামাণ্য দলিল, গবেষণানির্ভর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ।

মাঠে, মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি—আমাদের দেশের মানুষের জীবনে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম; শুধু অর্থনৈতিক উপযোগীতাতেই নয়, ভূমির ওপর পূর্ণ অধিকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। তাই, 'নিজেরা করি' ভূমির ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের যেকোনো উদ্যোগে পাশে থাকতে চেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায়, ভূমিসংক্রান্ত আইনের অগুনতি ব্যত্যয় এবং আইনের অধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদে পদে সীমাহীন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত, 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর গবেষণা এবং 'মুক্তবুদ্ধি'র এই প্রকাশনা উদ্যোগের সাথে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত, আনন্দিত। আমার স্মরণ করতে ভালো লাগছে যে, প্রথিতযশা গবেষক, গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর অনন্য নেতৃত্বে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর একদল দক্ষ গবেষককে বরাবরই পাশে পেয়েছি আমরা। বিশেষ করে অধ্যাপক বারকাতের উজ্জ্বল, অসামান্য মেধা ও পাণ্ডিত্যই শুধু নয়, তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্দীপন,

যেকোনো অশোভনের বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় ভূমিকা নিজেরা করি'র লড়াইকে করেছে বেগবান, যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে গবেষণার ঘাটতি অনস্বীকার্য। বিশেষত, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ—নারীর ক্ষেত্রে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন আলোচনা হলেও, এ বিষয়ে গবেষণানির্ভর গ্রন্থের অভাব রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রকাশনাটি যেমন এসংক্রান্ত সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে, তেমনি ভূমি-অধিকার নিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুসংহত সংগ্রামের জ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের সংগ্রাম চলমান রইবে, জ্ঞান এবং যুক্তির সম্মিলনে—নির্ভরতায়।

সবুজ-বিস্তীর্ণ জমি, টলমলে জলা আর নিবিড় জঙ্গলের ভালোবাসা মেখে বাংলার জনমানুষ আজন্ম লালিত। প্রকৃতির কাছ থেকে ওরা সযত্নে নেয় প্রত্যহের পাঠ। অথচ, তাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে শুধু হতাশা আর বঞ্চনার ছোঁয়া। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা—এই দেশে প্রণীত হোক সঠিক ভূমি আইন, হোক যথাযথ আইনি সংশোধন এবং এসবের সময়নিষ্ঠ-সঠিক বাস্তবায়ন। জীবনের উপবনে দাঁড়িয়ে ভূমির অধিকার হারানো এই মানুষগুলো যেন দেখে প্রত্যাশার নতুন সূর্যের সোনালী কিরণ ওদের জন্য প্রাণের বাণী বয়ে এনেছে—ওরা ফিরে পেয়েছে ভূমির অধিকার। আমাদের অবিচল বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি সেই প্রত্যাশা পূরণে পথ দেখাবে—আলোর সন্ধান দেবে।

খুশী কবির
সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশে ‘ভূমি আইন’ ও ‘ভূমি আইনের বাস্তবায়ন’সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তনির্ভর গবেষণা নেই বললেই চলে। এই বিবেচনা থেকেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘নিজেরা করি’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার’ ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একটি মাঠজরিপভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে। ওই গবেষণা রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছিলেন আবুল বারকাত, গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আসমার ওসমান, হাসনা হেনা শাওলি এবং মো. অলিউল ইসলাম। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণা এবং পরবর্তীকালে মাঠজরিপভিত্তিক এসব তথ্যাদি প্রয়োগে ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিনির্মাণউদ্দিষ্ট এই গ্রন্থটি প্রকাশের সময়োচিত উদ্যোগ নেয়ায় ‘নিজেরা করি’ এবং সংস্থাটির সমন্বয়কারী খুশী কবিরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই দুরূহ কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছেন ‘নিজেরা করি’-এর রেজানুর রহমান রোজ, তাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

দেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-চর-হাওর-বাঁওড়-বনের-পাহাড়ের যেসব মানুষ মাঠজরিপের প্রতিটি স্তরে সাহায্য করেছেন, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। গ্রীষ্মের খরতাপে ঘর্মক্লান্ত সেই কৃষক-জলাজীবী-বনজীবীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, যাঁরা বিনাস্বার্থে আমাদের সাথে মন খুলে কথা বলেছেন। দরিদ্র-ভূমিহীন ওইসব মানুষকে আমরা সবসময় মনে রাখব, যাঁরা অন্তরের গভীর থেকে সত্যটুকু বলেছেন। এ দেশে সত্য কথা বলা যখন দুর্লভ, তখন তাঁদের এই অবস্থান আমাদের প্রাণিত করে।

গ্রামের টিমটিমে আলোর কোনো চা-দোকানের অনেক সন্ধ্যার শাণিত আলাপ, ক্ষেতের আলে কৃষকের দার্শনিক উপলব্ধি, শীতের রাতে ভূমিহীন মানুষের ভূমি গ্রাসের করুণ-নিষ্ঠুর গল্প আমাদের অবনত করে, শেখায়, বিনীত করে। ওই মানুষদের উষ্ণ হৃদয়, সমুদ্রসম আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা, নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও সময়, ঠোঁটের কোণে সবের পরেও লেগে থাকা নির্মল হাসি, এবং সত্য বলবার দুর্মর সাহস ব্যতীত আমাদের মতো ‘বাইরে থেকে যাওয়া অদরিদ্র’ মানুষের পক্ষে এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হতো না। তাঁদের অমূল্য ও সময়নিষ্ঠ সহায়তা না পেলে এই গবেষণাকর্মটির বাস্তবায়ন অসম্ভবই ছিল।

তাঁদের, যাঁদের নাম আমরা প্রকাশ করতে পারছি না গবেষণা নৈতিকতার খাতিরে—প্রত্যেকের শুভার্থী হিসেবেই থাকব আমরা; কামনা করব তাঁদের সুস্বাস্থ্য, এবং মনেপ্রাণেই চাইব যে তাঁরা না-হলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত যেন এই ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা থেকে উদ্ভূত ফাঁদের কবল থেকে মুক্তি পান। আমরা

তাঁদের জন্য এমন একটি শোভন সমাজের অপেক্ষা করব; আমাদের এই গবেষণার মতো ক্ষুদ্র সহযোগিতা সেই যাত্রায় অব্যাহত রাখবার বিনীত অঙ্গীকারও রইল আমাদের পক্ষ থেকে।

বেশকিছু সংগঠনের সদস্য এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মির্জা মোঃ আজিম হায়দার, কর্মসূচি কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), এএলআরডি; সঞ্জীব দ্রং, মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; প্রবীন স্নাল, মানবাধিকার কর্মকর্তা, আইপিডিএস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; পরিতোষ দ্রং, কমিউনিটি সংগঠক, আইপিডিএস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; মিঠুন জাম্বিল, মানবাধিকার কর্মকর্তা, আইপিডিএস, মধুপুর, টাঙ্গাইল; নিগার সুলতানা কেয়া, নারী ভাইস-চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক, নারী উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা সদর, সুনামগঞ্জ; সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ইরা, সুনামগঞ্জ; তৌহিদুল ইসলাম (রুবেল), সাব-রেজিস্ট্রার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধিকার কর্মী জুমলিয়ান আমলাই এবং সুদত্ত বিকাশ তঞ্চংগ্যা তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের বেশি সময় ধরে সংগঠিত এই গবেষণাকর্মে রংপুর, গাইবান্ধা, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল এবং খুলনার 'নিজেরা করি'র স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তারা হলেন—মামুনূর রশিদ, বিভাগীয় সমন্বয়ক, রাজশাহী বিভাগ; গৌতম কুমার দে সরকার, বিভাগীয় সংগঠক, রাজশাহী বিভাগ; আলমগীর হোসেন, অঞ্চল সমন্বয়ক, গাইবান্ধা; জয়শংকর দাস, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; আহসান আলী, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; শিল্পী রাণী মাহাতো, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; সোনিয়া খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; রেবেকা খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, সাঘাটা উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা; আলেয়া খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, সাঘাটা উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা; ফজলুল হক, বিভাগীয় সমন্বয়ক, ঢাকা বিভাগ; মুজিবর রহমান, অঞ্চল সমন্বয়ক টিম সদস্য, টাঙ্গাইল; নিরোদ চন্দ্র রায়, কর্মসূচি সংগঠক, মধুপুর উপকেন্দ্র, টাঙ্গাইল; রেখা খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, মধুপুর উপকেন্দ্র, টাঙ্গাইল; স্বপন কুমার দাস, বিভাগীয় সমন্বয়ক, খুলনা বিভাগ; নাসিমা খাতুন, বিভাগীয় প্রশিক্ষক, খুলনা বিভাগ; সাহাদুল ইসলাম, অঞ্চল সমন্বয়ক, পাইকগাছা, খুলনা; পবিত্র সরকার, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; জেসমিন খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সুপ্রিয়া রায়, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র,

পাইকগাছা, খুলনা; ধ্রুবল চন্দ্র রায়, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; তরুণ দেবনাথ, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা খুলনা; পরিতোষ দেবনাথ, অঞ্চল সমন্বয়ক, নোয়াখালী; আয়েশা সিদ্দিকা লাকী, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; সুরেশ কর্মকার, কর্মসূচি সংগঠক, আখতার মিয়ার হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; ইদ্রিস আলী ফকির, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; মোঃ জসীম উদ্দীন, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; রেজাউল হোসেন, কর্মসূচি সংগঠক, সমীর হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; নিউটন কুমার মণ্ডল, কর্মসূচি সংগঠক, আখতার মিয়ার হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; লিটন চাকমা, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; এবং ইব্রাহীম খলিল, বিভাগীয় সংগঠক, নিজেরা করি।

তথ্য সংগ্রহে আমাদের সহযোগিতা করেছেন কয়েকজন অভিজ্ঞ মাঠগবেষক, যারা মাঠপর্যায়ের সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সফলভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয়, তারা হলেন—কবির আহমেদ, রফিকুল ইসলাম রাসেল, এবং জ্যোতি চাকমা; নিখাদ আন্তরিকতার সাথে তারা কাজটি সম্পন্ন করেছেন, সে জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর সহকর্মী-সহযোদ্ধাদের জন্য রইল সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন নুরুন্নাহার, মো. কবিরুজ্জামান লাপ্পু, মোজাম্মেল হক, সাবেদ আলী, আরিফ মিয়া এবং অজয় কুমার সাহা—এদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি উন্নয়নে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশনাবিষয়ক সমন্বয় করেছেন সেলিম রেজা। আর্থিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করেছেন আবু তালেব। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিল্পসুষমামণ্ডিত প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং গ্রন্থসজ্জার কাজটি সৃজনশীলতা ও স্থিতধীর সমন্বয় ঘটিয়ে সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন শিল্পী সব্যসাচী হাজরা। পাণ্ডুলিপির বানানরীতি এবং ভাষাগত সৌকর্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন এস এম তারিকুল ইসলাম মুন্না। ছাপার কাজটি নিখুঁত ও নান্দনিক করার চেষ্টা করেছেন আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং-এর শাহীন আহমেদ ও তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ। তাদের মঙ্গল কামনা করি।

আমাদের মাঠজরিপ কাজ শেষে জরিপের মূল ফলাফল ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় ওয়েবিনারে উপস্থাপনকালে সম্মানিত আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিকুজ্জামান, অধ্যাপক ও প্রাক্তন

চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রানী ইয়ান ইয়ান, উপদেষ্টা, চাকমা সার্কেল চিফ; এবং শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি—সবাইকে তাঁদের মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। তাঁদের চিন্তা-উদ্রেগকারী বহুমাত্রিক আলাপ-আলোচনা পরবর্তীকালে আমাদের এই গ্রন্থে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে।

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

মুখবন্ধ:
বড় পর্দায় ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা

১। "আইন" কানুন-বিধি-বিধান (law), "আইনের ব্যবহার" (use of law), "আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন" (application and implementation of law)—বাহ্যিক দৃষ্টিতে সোজাসাপটা মনে হলেও এসব বিষয় আসলে জটিল। এসবের আছে বাহ্যিক রূপ (form and appearance) এবং মর্মরূপ বা মর্মবস্তু (content and essence); আছে ইতিহাস ও বিবর্তন (history and evolution); আছে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অর্থ (theoretical and practical meaning)। আর এই সবকিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আছে বিভিন্ন পদ্ধতিতত্ত্বীয় কাঠামো (methodology)। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের এসব কাঠামোর মধ্যে সবচে বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ কাঠামো হলো রাজনৈতিক অর্থনীতির পদ্ধতিতত্ত্ব। এ গ্রন্থে আমরা সেটাই ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।

২। "আইন-নিয়ম-বিধান"-এর কথা এলেই বলতে হয় 'প্রকৃতির weavb' (rule/law of nature) এবং "সামাজিক বিধান" (rule/law of society)।[১] এ দু'টো একদিকে যেমন

---

[১] "প্রকৃতির বিধান" নিয়ে কাজ করে 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' *(natural science)* আর "সামাজিক বিধান" নিয়ে কাজ করে "সামাজিক বিজ্ঞান" *(social science)*। আর জ্ঞানতত্ত্বের নিরিখে *(epistemologically)* "প্রকৃতিবিজ্ঞানের" সাথে "সামাজিক বিজ্ঞানের" সম্পর্কটি পদ্ধতিতত্ত্বগতভাবে *(methodologically)* গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণে—একটা ভ্রান্ত ধারণাকাঠামো *(flawed framework)* ব্যবহার করে আসছেন, যার নাম কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো *(cartesian framework)*। জ্ঞানতাত্ত্বিক ভ্রান্ত এই ধারণাকাঠামো বুঝতে একটু পেছনে যেতে হবে। সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রী রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) বস্তুর গতি, মানুষের মন ও দেহ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা বলেছেন, যা এ রকম: "বস্তু গতিময়; তবে বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর"। গতি ও স্থিতি উভয়ই তৈরি করেন ঈশ্বর। মানুষ হচ্ছে 'দেহ' ও 'মন'-এর সম্মিলিত সংগঠন। দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু; আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা। দেহ আর মন চরিত্রগতভাবে পরস্পরবিরোধী। সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে—যে ভিত্তি সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে (= ঈশ্বর)। মূল সিদ্ধান্ত হলো *"কাজিটো আরগোসাম"*—"আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে"। জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্রগুলো ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন। ঈশ্বরসৃষ্ট বিধায় ওইসব সূত্র সন্দেহাতীত। আর সন্দেহাতীত সূত্রের ভিত্তিতে যুক্তিপরম্পরায় লব্ধ যেকোনো জ্ঞান সঠিক হতে বাধ্য"। এরপর এল জ্ঞানানুসন্ধানে কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো। কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো যা করল, তা হলো এ রকম: দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলল মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' *(res cognitans)* নিয়ে; আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' *(res extensa)* নিয়ে। জ্ঞানজাগতিক এ সবকিছু চ্যালেঞ্জ করে বিজ্ঞানী ফ্রিট্জফ কাপ্রা যা বললেন, তা এ রকম: "প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন হলো কার্টেজীয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলোজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" গ্রহণ করা—অর্থাৎ যে "চিন্তা-অবস্থান" দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণিজগতের সম্পর্ক নিরূপণ করে হবে,... সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে—তারা সামূহিক-আন্তঃসম্পর্কিত গঠনকাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক

এক অথবা সমার্থক নয়, অন্যদিকে "সামাজিক আইন-বিধান" যখন "প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান-নিয়মের" সাথে সাংঘর্ষিক হয় তখন শেষপর্যন্ত জয় হয় "প্রকৃতির বিধান"। আর এ নিরিখে সামাজিক বিধি-বিধান-আইন যদি প্রকৃতির বিধান পাল্টে দেবার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় তখনই বিপদ সৃষ্টি হয়—যে বিপদ শেষপর্যন্ত সংঘবদ্ধ মানবসমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। সুতরাং সমাজদেহের অস্তিত্ব বিপন্ন না করতে চাইলে 'সামাজিক বিধি-বিধান-আইন-কানুন'কে "প্রকৃতির বিধি-বিধান"-এর অনুগত-অধীনস্থ হিসেবে দেখাটাই হবে বিজ্ঞানসম্মত।

৩। "প্রকৃতির বিধান" (law of nature) হলো বস্তুজগতের নিত্যগতির নিয়ামক অবিচ্ছেদ্য পরস্পর সম্পর্ক। এসব সম্পর্কের আছে কার্যকারণ (causality)। এসব কার্যকারণের বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি—প্রকৃতি বিজ্ঞানে আবিষ্কারের বিষয়। এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক শর্ত হলো মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ ও প্রকাশ করার শক্তি। প্রকৃতিজগতের বিধান হতে পারে বিশেষ বিধান, সাধারণ বিধান এবং ব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধান। কথাগুলো এ জন্য বললাম যে, মানুষ যেহেতু প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেহেতু "সামাজিক বিধি-বিধান" হতে হবে "প্রকৃতির বিধি-বিধানের" অধীনস্থ। সমাজবদ্ধ মানুষ আর সেই মানুষের "রাষ্ট্র" (যার উৎপত্তিকাল বেশি দিন আগের কথা নয়) যেসব অনুশাসন বা নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে—তাকেই বলা হয় "রাষ্ট্র বিধান" বা "আইন"। এই আইনের লক্ষ্য হলো মানুষের-সমাজের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। নিঃসন্দেহে এই কাজটি কেউ করে এবং কারো স্বার্থে তা করে। কাজটি করে "রাষ্ট্র"; আর স্বার্থটা "রাষ্ট্র-শাসকশক্তির" অনুকূল। আইনের ইতিহাস বলে রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে যেসব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে তাতে একদিকে থাকে শাসকশক্তির স্বার্থরক্ষার নিয়মাবলী আর একই সাথে অতিগুরুত্বের সাথে থাকে 'নিষেধ'—অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রণীত নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির দণ্ডদানের ক্ষমতা। সুতরাং "আইন" হলো একদিকে রাষ্ট্রের শাসকশক্তির স্বার্থ হাসিলের পথ-পদ্ধতি; আর একই সাথে অন্যদিকে তা হলো রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্রের শাসকশক্তির পক্ষে ওই স্বার্থ বিঘ্নিতকারীকে দণ্ডদানের বিধান। সমাজ যেখানে পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত, আর রাষ্ট্রশক্তি যেখানে উপরতলার শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে—সেখানে 'আইন' কোনো শ্রেণিনিরপেক্ষ বিষয় হবার কারণ নেই—তা উপরতলার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ—কারণ, মানুষে মানুষে শ্রেণিবিভাজন প্রকৃতির বিধানসম্মত নয়—তা প্রকৃতির বিধানবিরুদ্ধ (বিশেষ সময়ে বিশেষ বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হলেও)।

বিভাগে চর্চা করে। ..., জীবনের বিষয়াদি খণ্ডিত করার এবং পৃথক গণ্ডিবদ্ধ করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানে সামাজিক বিজ্ঞানীদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না (বিস্তারিত দেখুন, Capra 1988 : 188-262)।#

৪। যেকোনো রাষ্ট্রে মতাদর্শ ও মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠান—রাজনৈতিক, আইনগত, সাংস্কৃতিক—হলো রাষ্ট্রের উপরিকাঠামো (superstructure)। যে উপরিকাঠামোর নিয়ন্তা হলো অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামো (basic structure)। আর ভিত্তিকাঠামোর নিয়ন্ত্রক হলো উৎপাদনসম্পর্ক (production relations) যার। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার মুখ্য নিয়ন্ত্রক হলো উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য (অন্য কোনো কিছু নয়)। সুতরাং যে রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের (জমি-জলা-জঙ্গল, যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি) মালিক হবেন গুটিকয়েক ব্যক্তি, সে রাষ্ট্রে আইনকানুনও যে তাদের স্বার্থেই প্রণীত ও প্রয়োগ হবে—এসব ধ্রুব সত্য। যেমন অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবকালে অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ বললেন, "আইনকানুন স্বার্থরক্ষা করবে সভ্যতার প্রভুদের (Masters of mankind) ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মালিকদের (manufacture) এবং তা করলে সবার জন্যই মঙ্গল হবে"। আর এরপরে বললেন, "প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করবে"। অর্থাৎ 'আইন' বিষয়টি পুরোপুরি 'শ্রেণিস্বার্থীয়' এবং কোনো অর্থেই 'শ্রেণিনিরপেক্ষ' বিষয় নয়। আবার এডাম স্মিথই একদিকে বলছেন যে "এক অদৃশ্য হাত" বাজার ব্যবস্থার মধ্যস্থতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে; আবার অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জনস্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন। এসব হলো "আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির" মর্মকথা।

৫। 'আইন' (law) এবং "আইনের প্রয়োগ অথবা বাস্তবায়ন" (application or implementation of law)—লক্ষ্যটা একই হলেও তা সমার্থক নাও হতে পারে। পার্থক্যটা গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর ধারণার "জ্ঞানের অধিকারী" (possession of knowledge) এবং "জ্ঞানের ব্যবহার" (use of knowledge)-এর মতো হতে পারে। এসবের অর্থ হলো আইনের ঐতিহাসিকতা আছে। যেমন ১৯৭১-এ আমরা যখন মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ করছিলাম, তখন ওই যুদ্ধটা আমাদের জন্য ছিল আইনগতভাবেই ন্যায়যুদ্ধ—ন্যায়সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের যুদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমাদের যুদ্ধ ছিল শুধু বেআইনিই নয়, রীতিমতো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। একই ধরনের উপসংহার প্রযোজ্য ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনবিরোধী লড়াই-সংগ্রামে মঙ্গলপাণ্ডে-ক্ষুদিরাম-বীরকন্যা প্রীতিলতাদের জন্য। 'আইন' ও 'আইনের প্রয়োগ' নিয়ে এসব কোনো ধাঁধা বা স্ববিরোধ নয়—এসবই স্বাভাবিক ঐতিহাসিকতা।

৬। "ভূমি" এবং "আইন" এই দুইয়েই রয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। একটি রাষ্ট্রে—তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন—ক্ষমতাকাঠামো নির্ণায়ক হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান থাকে। আর এই উপাদানগুলো আবর্তিত হয় সম্পদ কেন্দ্র করে। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেই, আর সেই পথেই রাজনীতি—যা ক্ষমতাকাঠামো ঠিক করে—ঠিক করে ভূমির ওপর প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব, এবং অধিকার কার থাকবে, কার থাকবে না। আবার, ভূমি যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ সসীম ও দুষ্প্রাপ্য এক প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই এই সম্পদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যও তুলনামূলক বিচারে বেশি। আবার, ভূমির ওপর অধিকার-মালিকানা-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব-দখল যেহেতু ক্ষমতার পতাকাও ওড়ায় সগর্বে—তারও একটি মূল্য আছে; যা টাকার অংকে হিসাব করা দূরূহ হলেও তা যে মূল্যবান—সেটি বলবার অপেক্ষা রাখে না।

৭। এ তো গেল ভূমির দিকটা। একই সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভূমিসংক্রান্ত "আইন" (law) এবং "নীতি" (policy)। "আইন" আর "নীতির" মধ্যে কিছু ফারাক থাকলেও, আদতে এ দুইয়ের মাঝে ব্যবধান সূক্ষ্ম। "নীতি" নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার, "আইন" প্রণয়নও করে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার। "নীতি" সরকারের আর্থ-রাজনৈতিক দর্শন, যা সরকারের একটি লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে; "আইন" এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্দেশ করে। এমন কোনো "আইনের" অস্তিত্ব থাকতে পারে না যার ভিত্তিমূলে নেই কোনো না কোনো "সুনির্দিষ্ট নীতি"। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো প্রাচীন রোমান দার্শনিক সিসেরোর (খৃ. পূ. ১০৬-৪৩) প্রশ্ন—*Qui Bono*—কার স্বার্থে, কার লাভ বিবেচনায়? নীতির ক্ষমতা কিংবা মামলা লড়ার ক্ষেত্রে তার সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও বলা যায়: যে বিষয়ে "আইন" নেই, সেখানে "নীতিই" (যদি থেকে থাকে) সর্বোচ্চ আইনি দলিল—জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের হয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি। তাই আমরা "আইন" আর "নীতির" মাঝে মৌলিক কোনো ফারাক করতে যাইনি, দুটিকে দেখেছি একই বিবেচনায়।

৮। "আইনের" রাজনৈতিক অর্থনীতির সুস্পষ্ট জন্ম-ইতিহাস আছে। "আইন" কোথা থেকে এল? এলই বা কেন? ভূমিসংক্রান্ত "আইন"—সবসময় ছিল না, সম্ভবত সভ্যতার বেশির ভাগ সময়জুড়েই ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজের কেনো পর্যায়েই ভূমি আইন বলে কিছু ছিল না—কারণ তার প্রয়োজনই পড়েনি। আদিম সমাজের মানুষ জোটবদ্ধভাবে শিকারবৃত্তি ও সংগ্রহবৃত্তি করেছে। তখন ভূমি ছিল সমাজের সবারই—সার্বজনীন সম্পদ। আর ওই সমাজের ভূমি নীতি (land policy) হলো—প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির ব্যবহার হবে সকলের, জীবিকার উৎস হবে সমান। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। যখন থেকে মানবসমাজ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরিত হয়, তখন থেকে ভূমি দখলের প্রচেষ্টা শুরু—প্রথমে শুরু একক কোনো যুথবদ্ধ গোষ্ঠী, আর পরবর্তীতে শুরু হয় এ নিয়ে এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর বিবাদ। আর এসব বিবাদ মেটাতে

এবং ভূমির ওপর কর্তৃত্ব-দখল-নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করতে প্রয়োজন হয় চুক্তি (contract)। এই চুক্তিরই 'সভ্য' নাম হলো 'ভূমি আইন'।

আদিম যুগে শুরুতে আমরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছোট-ছোট গোষ্ঠী বানিয়েছি; বানিয়েছি দলপতি। একপর্যায়ে দলপতি কিছু সম্পদের মালিক হয়েছেন। আরো সম্পদের মালিকানার জন্য তিনি প্রতিবেশী ছোট গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করেছেন—লড়াইয়ে জিতে পরাজিত গোষ্ঠীর সবকিছুর মালিক হয়েছেন। এখান থেকেই শুরু ভ্রাতৃসুলভ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভাঙন—শোষক-শোষিতে সমাজবিভক্তি। এই প্রক্রিয়াতেই এসেছে দাস ব্যবস্থা (slavery)—যে ব্যবস্থায় একদিকে থাকে গুটিকয়েক দাসমালিক, আর অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শৃঙ্খলে আবদ্ধ দাসশ্রমিক। দাস ব্যবস্থা ভৌগোলিকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগে তা রোমান সাম্রাজ্যে এসে মহাপরাক্রমশালী হয়ে রূপ নেয় রাজার শাসনে, গড়ে তোলে শক্তিশালী রাষ্ট্র: ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্র—নগর রাষ্ট্র। রাজা যুদ্ধ করে গ্রাস করতে থাকেন অন্য দাসমালিকদের ছোট ছোট এলাকা-অঞ্চল। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যেতে রাজাকে পুষতে হয় ভাড়াটে সৈন্যদল, আর এই ভাড়াটে সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে পুষতে অর্থায়নে আবিষ্কৃত হয় সোনা-রুপা-তামার 'অর্থ' বা 'মুদ্রা' ('অর্থ' বা মুদ্রার আবিষ্কার সম্ভবত বাজারের সাধারণ পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্য দিয়ে শুরু হয়নি)। আবার অন্যের মালিকানার সোনা-রুপা দখলের জন্যেও হয়েছে যুদ্ধ। ততদিনে লেখার হরফ আবিষ্কার হয়েছে, আর তা দিয়ে রাজা লিপিবদ্ধ করেছেন দাস রাষ্ট্র পরিচালন ও সম্প্রসারণের আইনকানুন। এই দাস ব্যবস্থাতেই যখন থেকে দাস-মানুষ এবং জমি-জমা বেচাকেনার পণ্যে রূপান্তরিত হলো, ঠিক তখন থেকেই শুরু "প্রকৃতির পণ্যায়ন" (commodification of nature)। যখন অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-জুলুম চরমে পৌঁছে মহাপরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে সমাজ অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত হয়—ঠিক তখনই তার পতন হয়। কিন্তু, দাস শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতনের মানে শোষণব্যবস্থার পতন নয়—নতুন এক শোষণব্যবস্থায় রূপান্তরমাত্র। দাসভিত্তিক শোষণব্যবস্থা রূপান্তরিত হয় ভূমিভিত্তিক শোষণব্যবস্থায়, যেখানে থাকেন—স্বল্পসংখ্যক ভূমিমালিক-ভূস্বামী (landlord)—আর তার অধীনে অনেকসংখ্যক কৃষক, যারা ভূস্বামীর জমি চাষ করেন (ভূমিদাস বা সার্ফ)। কৃষক-প্রজা ভূমিদাস হিসেবে খাওয়াপরাসহ ট্যাক্স (কর) দেবার বিনিময়ে ভূস্বামীর জমি চাষ করেন এবং থাকেন ভূস্বামীর কর্তৃত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পরাধীন সত্তা হয়ে। জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহের বিনিময়ে ভূমিদাস ভূস্বামীকে ভূমিখাজনা (land rent) রূপে ট্যাক্স (বা কর) থেকে শুরু করে সবধরনের নজরানাই দেন—এই সিস্টেমেরই নাম সামন্তবাদ বা ফিউডালিজম (feudalism)। দাস ব্যবস্থায় দাস ও জমি কেনাবেচা শুরু করে যেভাবে 'প্রকৃতির পণ্যায়ন' ঘটেছে, তেমনি সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ট্যাক্স বা কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঘটলো "সমাজের পণ্যায়ন" (commodification of society)। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই সিস্টেম টিকে ছিল এক-দুই হাজার বছর।

সামন্তবাদী সিস্টেম জিইয়ে রাখতে একপর্যায়ে প্রয়োজন পড়ে মহাপরাক্রমশালী 'যোগ্য' কাউকে—আর এই প্রক্রিয়াতেই আগমন ঘটে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ ও রাশিয়ার রানী ক্যাথেরিনার। সামন্তবাদী এই শোষণব্যবস্থা একদিকে জমির উর্বরতা নিশ্চিহ্ন করে, আর অন্যদিকে পরাধীন কৃষককে নিঃস্ব করে ছাড়ে। এ ব্যবস্থা টেকাতে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হয়, যা পুষতে প্রয়োজন পড়ে প্রচুর অর্থের (যে 'অর্থ' বা মুদ্রা ইতিমধ্যেই দাস ব্যবস্থাতে আবিষ্কৃত হয়েছে)—যে অর্থ জোগাড়ে আর রানীমাতাদের বিশাল অপচয় অব্যাহত রাখতে কৃষক-প্রজাদের ওপর জুলুম বাড়ে। তবে তাতেও হয়নি—অর্থ ধার করতে ধরনা দিতে হয় অর্থের মালিক—ব্যবসায়ী ও অর্থলগ্নিকারীদের কাছে। এই সুযোগে চতুর ব্যবসায়ী ও অর্থলগ্নিকারীরা "মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব" (*"Liberty-Equality-Fraternity"* বা *"Liberté-égalité-fraternité"*) স্লোগান তুলে 'বিপ্লব'-এর নামে সামন্তবাদী শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদ করে দেন। পরিণতি, ঠিক দাস ব্যবস্থার মতোই—সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটে—কিন্তু, শোষণ ব্যবস্থার পতন ঘটে না—মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ ব্যবস্থার একটা রূপভেদ ঘটেমাত্র। আর, নতুন এই শোষণ ব্যবস্থার নাম—পুঁজিবাদ (capitalism)। আমরা এখন সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই বাস করছি। এ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক গুটিকয় ব্যক্তি। পুঁজিবাদের এ প্রক্রিয়ায় গ্রামের মানুষকে তাড়িয়ে শিল্পকারখানায় আনা হয়; জোরজবরদস্তি করা হয় কারখানায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য। শোষণ-শাসন-কর্তৃত্ব-আধিপত্যের লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয় উপনিবেশ; বাজার বিস্তৃতির জন্য হয় ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিশ্বযুদ্ধ; সমরশক্তি বাড়ে; প্রয়োজন হয় মহাপরাক্রমশালী দলপতির—আবির্ভূত হয় সাম্রাজ্যবাদ (প্রথমে ব্রিটিশ, আর এখন মার্কিনি)। এই সিস্টেমে 'জুলুমবাজি' (tyranny) শুধু শারীরিক নির্যাতন-নিপীড়নে সীমাবদ্ধ না থেকে শুরু হয় কাঠামোগত জুলুম (যেমন: সম্পত্তির অধিকার)। একই সাথে চলে আইন-বিচার প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে জুলুম, যা মানুষ একপর্যায়ে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায় (যেমন, আইনের শাসন বা rule of law; বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০২০: xx-xxiii)।

মোটা দাগে, এভাবেই আর এ কারণেই "আইনের" সৃষ্টি; এবং এভাবেই এর ব্যবহার (অপব্যবহার?) হচ্ছে।

৯। ভূমি আইনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক অতি জোরালোভাবেই প্রকাশিত। রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতার (power) একটি হাতিয়ার, তাই এই হাতিয়ার ব্যবহার করে ভূমি-সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা-দখল-কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা সবসময়ই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে আইন, বেশির ভাগ সময়ই, হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর শ্রেণির রাজনৈতিক-সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। "আইন"—রাজনীতির গতিমুখ ঠিক করতে সক্ষম নয়, বরঞ্চ অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর স্বার্থরক্ষণকারী রাজনীতিই নির্ধারণ করে আইন কেমন হবে অথবা কেমন হবে না।

অর্থাৎ, ভূমির ওপর মানুষের অধিকারের নিরিখে বিষয়টি মোটা দাগে কয়েকটি প্রপঞ্চ দিয়ে দেখা সম্ভব: ভূমির অর্থনীতি; ভূমির রাজনীতি; আইনের অর্থনীতি; আইনের রাজনীতি; আইন বাস্তবায়নের অর্থনীতি, এবং আইন বাস্তবায়নের রাজনীতি।

কিন্তু এগুলোর একে অন্যের সাথে রয়েছে নানামুখী, নানামাত্রিক, নানান মাত্রায় নানান সম্পর্ক। ভূমির রাজনীতির সাথে কখনো মেলে আইনের রাজনীতি। আবার, আইনের অর্থনীতির সাথে মেলে ভূমির অর্থনীতি। এমন পারমুটেশন-কম্বিনেশনের অংক—তত্ত্বেই ঘটে। বাস্তব জীবনে এগুলো আলাদা হয়ে থাকে না, আলাদা করাও যায় না। যদি 'ভূমি আইন বাস্তবায়ন'কে একটি একক প্রপঞ্চও ধরে নিই, তাহলেও এটির রাজনীতিকে এর অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করা যাবে না। আর এসবের কোনো কিছুকেই "রাষ্ট্র" (state) নামক হাতিয়ার থেকে বিযুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ বিযুক্ত করা যাবে না "ক্ষমতা" (power) থেকে। আর শোষণভিত্তিক যেকোনো সমাজ-রাষ্ট্রে ক্ষমতা ততক্ষণ অবৈধ (illegitimate), যতক্ষণ তার বৈধতা (legitimacy) প্রমাণিত না হচ্ছে। আর ওই বৈধতা প্রমাণের দায়িত্ব (burdent of proof) সবসময় বর্তায় যারা ক্ষমতায় আছে—তাদের ওপর।

এখানেই আসে "রাজনৈতিক অর্থনীতি" (Political Economy)—শাস্ত্রগতভাবে যা অর্থনীতিশাস্ত্রসহ মানুষের জীবন-জীবিকাসংশ্লিষ্ট সম্পদের উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ সূত্র অনুসন্ধান করে।[২] এটি পরিষ্কার করে বলা ভালো যে 'ভূমি আইনের

---

২ "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য নয়। তবে গ্রন্থের মর্মকথা অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে বিধায় বলে রাখা সমীচীন হবে যে অর্থনীতিশাস্ত্র (Economics)—প্রকৃতিবিজ্ঞান (natural science) নয়, তা নীতিশাস্ত্র (moral science)। আর আজকের অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবসূত্রেই নামকরণ ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি। আর যে কারণে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের প্রধান ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রিক ও অর্থনীতিশাস্ত্রিকদের মূল গ্রন্থসমূহের শিরোনামে হয় সরাসরি "রাজনীতি" না-হয় "রাজনৈতিক অর্থনীতি" প্রত্যয় সংযুক্ত ছিল। যেমন ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম পেটির মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনাম ছিল "Political Arithmetic" (প্রকাশকাল ১৬৯০) এবং "The Political Anatomy of Ireland" (প্রকাশকাল ১৬৯১); স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট-এর গ্রন্থের শিরোনাম "An Inquiry into Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৭৬৭); ফরাসি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই-এর গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮০৩); ব্রিটিশ ধর্মযাজক এবং একই সাথে অর্থনীতি ও জনমিতিশাস্ত্রের স্বীকৃত পণ্ডিত থমাস রবার্ট ম্যালথাসের গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১০-২০ এর মধ্যে); ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর গ্রন্থের শিরোনাম "Principles of Political Economy and Taxation" (প্রকাশকাল ১৮১৭); সুইজারল্যান্ডের ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রিক লিওনার্দ সিসমন্ডির গ্রন্থের শিরোনাম "New Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১৯); ব্রিটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর গ্রন্থের শিরোনাম "Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৪৮); আর কার্ল মার্কসের গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "A Contribution to the Critique of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৫৯) এবং "Das Capital: Critique of Political Economy" (প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৭)। অর্থনীতিশাস্ত্রের উল্লেখিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ শুধু শিরোনামগতভাবেই নয় অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর নিরিখে সুস্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতি। বিংশ

রাজনীতি'র সাথে 'ভূমি আইনের অর্থনীতি'কে সরলরৈখিকভাবে যুক্ত করলে তা কোনো অর্থেই 'ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, 'অর্থনীতি + রাজনীতি' ≠ রাজনৈতিক অর্থনীতি'। এসব দেখতে হবে দ্বন্দ্বসূত্র দিয়ে।

আবার, অর্থনীতি বলতেই যেন আমরা 'চাহিদা', 'যোগান', 'মুদ্রা', 'সুদ হার', 'উপযোগ', 'ভোক্তার পছন্দ/বাছাই' —এসবের অতি সরলীকরণে পড়ে না যাই। আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে অর্থনীতির বিস্তার প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক। বড়জোর, সরলীকরণের চেষ্টা করলে আমরা একে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়াদির সাথে মেলাতে পারি—যার ব্যাপ্তিও বিস্তৃত-বহুমাত্রিক। বিশেষায়িতকরণ (specialisation) এর চক্করে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি 'খুপড়িভুক্ত' (compartmentalised-এর বাংলা যদি ধরি 'কামরাভুক্ত', তবে আমাদের সচরাচর বিচরণ এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে—বড়জোর অপরিসর এক 'খুপড়ি' ঘরে) দৃষ্টিভঙ্গিতে, আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে।

এ কথা মনে রাখা চাই যে বৃহৎ পরিসরে, বড়-পর্দায় দেখা ব্যতীত গভীরে-অতি গভীরে প্রোথিত কোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ কখনোই উন্মোচিত হয় না। আবারও মনে করাই যে, পাটিগণিতের সরল সূত্র দিয়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মেলালেই তা রাজনৈতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে না; বরঞ্চ এটি অতি শক্তিশালী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ঐতিহাসিক গতিশীল এক বিশ্লেষণ কৌশল—যা এমনকি বহিরঙ্গের মধ্যে থেকেও বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে (অর্থাৎ from "appearance" to "essence", অথবা from "form" to "content")। আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় নেমেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশে ভূমি আইন ও তা বাস্তবায়ন সমস্যা, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য দ্বন্দ্বসূত্রীয় ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী এক হাতিয়ার। এক্ষেত্রে বলে রাখা ঠিক হবে যে সামাজিক ক্রিয়াসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং বিকাশের নীতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক অর্থনীতি"র এই হাতিয়ারটি 'থিসিস', 'এ্যান্টিথিসিস' ও 'সিনথেসিস' পর্বকে তিনটি দ্বন্দ্বসূত্রের নিরিখে দেখে: (১) পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ও তার বিপরীতের নিয়ম, (২) বিপরীতের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের নিয়ম, এবং (৩) নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্র (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৯: ৩২-৪৮)।

শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাজতন্ত্রের আগমন আর পুঁজিবাদের বৈশ্বিক সংকটকাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে "রাজনীতি" প্রত্যয়টি বাদ দিয়ে শাস্ত্রের অনুসন্ধান ক্ষেত্র সংকুচিত করে তা শুধু "অর্থনীতিশাস্ত্র" নামাঙ্কিত করা হয় (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৮: পৃ. ৬৩-১১৯)। আর এসব কারণেই আধুনিক অর্থশাস্ত্রিক হ্যা-জুং চ্যাং বলছেন, "Economics is a Political argument" এবং "Political Economy: a more 'honest' name" (দেখুন, Chang 2014, pp. 401, 377)।

১০। রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ—এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু না হলেও রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা কী বুঝি—সেটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ দেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বুঝতে কেন আমরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই—সেটিই পরিষ্কার করতে চাই।

প্রথমত, রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে শোষিতের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তটুকু শোষক-শাসক যে প্রক্রিয়ায় দখল করে, কব্জা করে, নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনা করে এবং সর্বোপরি আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেই পথ-পদ্ধতিটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা ব্যবহার করে শোষক কায়েম রাখে তার ক্ষমতা এবং শাসনব্যবস্থা।

আমাদের প্রেক্ষিতে (শুধু আমাদের বলি কেন, বিশ্বের নানান প্রান্তে—নানান চেহারায়, নানান মাত্রায় একই বিষয় বিদ্যমান), ভূমিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রাপ্তি (কোনো অর্থেই শুধু ফসল নয়) তার উদ্বৃত্ত কীভাবে শাসক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মসাৎ করে, তা তাত্ত্বিকভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির উপজীব্য একটি বিষয়। বলা ভালো, রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি 'ক্ল্যাসিক' উদাহরণ এটি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 'আইন' আসছে কোথা থেকে? উত্তরটা সরল। যদিও তার পূর্বাপর মোটেও সরল নয়। আমাদের অনুধ্যানে 'আইন' এখানে হাতিয়ার মাত্র, যা পূর্বেই উল্লেখিত শাসক শ্রেণির পক্ষে আত্মসাৎ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে—একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ, 'আইন' এবং তার 'বাস্তবায়ন' (বাস্তবায়ন নিজেও কিন্তু একটি আইনি বিষয়) এমন এক 'জাদুকরি' (মন্দ-জাদু বলাই ভালো) হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে যা শাসিত বা শোষিত শ্রেণির ভূমিনির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু রীতিমতো ঘটা করে শাসক বা শোষকের আত্মসাৎ উপযোগী করে তার পাতে তুলে দেয়। এখানে উৎপাদন পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক কৌশল যা-ই থাকুক না কেনো—দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি, সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ, অথবা এসবের মিশ্র কোনো হাইব্রিড—আইন এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির 'সুফল' (পড়তে হবে, আত্মসাৎকৃত অন্যায্য উদ্বৃত্ত) কোনো একটি 'শ্রেণি'-ই পায়, সবাই পায় না—আইন এবং তার বাস্তবায়ন কাজ করে অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে, শাসক বা শোষকের স্বার্থ রক্ষাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

যতক্ষণ না, শাসক এবং শাসিত একই সত্ত্বা হচ্ছেন অর্থাৎ, "শাসক = শাসিত" না হচ্ছে, অথবা শোষিত মানুষের স্ব-শাসন কায়েম না হচ্ছে, অথবা নিদেনপক্ষে 'প্রায়' সমান (শাসক ≅ শাসিত) না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন এবং তার বাস্তবায়ন শুধু শাসক বা শোষক শ্রেণির স্বার্থ সাধনে বিরাজমান থাকবে—আইনের দেবী থেমিসের

সাধ্য নেই যে নিজের চোখ বেঁধে সবাইকে একই দাঁড়িপাল্লায় মাপবেন; শাসিত বা শোষিত শ্রেণি ওজনে বরাবরই কম পাবেন, কিংবা পাবেনই না আদৌ, অথবা পেলেও শাসক বা শোষকের ছড়িয়ে দেয়া খুদকুঁড়োটুকু পেয়েই খুশি থাকতে হবে—যাকে আবার অনেকেই 'ট্রিকেলডাউন ইফেক্ট'-এর সুফল ভেবে আত্মতৃপ্ত থাকতে চান। এখানে শাসিত বা শোষিত শ্রেণির 'অধিকার'-এর বিষয়টি বাতুলতা, কারণ দুটো অসম সত্তার মধ্যে সম-অধিকার নিয়ে আলোচনা যুক্তিহীন।

এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো: যেখানে 'শাসক = শাসিত' হওয়াটাই আদর্শ অবস্থা, সেখানে আমরা কেন শাসক এবং শাসিতের 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার কথাও বললাম? এর উত্তর একটু পর দেব। তবে একটা শক্তিশালী উত্তর হতে পারে যেমনটি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৮/৪২৭-৩৪৭) বলেছিলেন, "There should exist among citizens neither extreme poverty nor again excessive wealth, for both are productive of great evil."।

এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায়, আর সব ক্ষেত্রের মতোই, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন ঐতিহাসিকভাবেই এমন করেই হয়ে আসছে যেন 'শাসিত' কখনোই 'শাসক'-এর সমান তো দূরের কথা কাছাকাছিও হয়ে উঠতে না পারে। বরঞ্চ "আইন" এবং "আইনের বাস্তবায়ন" এমনভাবেই হয় যেন ওই উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে শাসকের কোনোই বেগ না পেতে হয়; কোনো দিক থেকে কোনোরকম বাধা আসবার সব সম্ভাবনাকেই বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি ব্যবহারে রুদ্ধ করা হয়। বড়জোর 'সিভিল সোসাইটি'র নাম দিয়ে এক-আধটু রঙিন আশার পতাকা সামনে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয় শাসকের দিক থেকেই—তাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই ইন্ধনই থাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব 'বড় বড় নীতিনির্ধারক'দের দিক থেকে। অর্থাৎ, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি—চিরে দেখছি এর ভেতর-বাহির, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবেই এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অর্থনীতির এক 'প্র্যাক্টিকাল ক্লাস'।

১১। রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শাসকগোষ্ঠীর দরকার 'আইন'। তবে ভূমি আইনসহ সবধরনের আইন এবং সেসবের প্রয়োগকাঠামো ও বাস্তবায়ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেমন হবে, তা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট সময়ে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নিয়ামক বৈশিষ্ট্যের ওপর। তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন—আমাদের দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটি কেমন? আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে যে নামে আখ্যায়িত করা চলে তা হলো—"রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কতিপয়তন্ত্রের আধিপত্য" (Dominance of criminalised oligarchs regulated by rent-seekers)।

যেহেতু এ গ্রন্থে ‘রেন্ট-সিকার’ প্রপঞ্চ বা ধারণাটি অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু ধারণাটির মর্মার্থ বলা দরকার। ‘রেন্ট-সিকার’-এর (rent-seeker) মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাউখাওয়া শ্রেণি, ফাটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি।

রেন্টসিকিং বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এ রকম: বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে–এটি ‘রেন্টসিকিং’ নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই রেন্টসিকিং। আর এসবের সাথে যুক্ত যারা, তারাই রেন্ট-সিকার। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায়, সেখানে রেন্টসিকিং-এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। রেন্টসিকিং সমাজের মোট বিত্ত কমায়, এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। রেন্টসিকিং পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচু তলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ, আর নিচু তলার মানুষের দুর্দশার উৎস—বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। রেন্টসিকিং-এর এই পদ্ধতি প্রয়োগে রেন্ট-সিকার হয়ে ওঠেন আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির মালিক (owner of financialised capital)—যে পুঁজির মাধ্যমে তারা সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র সবকিছুরই একচ্ছত্র কর্তৃত্বকারী-নিয়ন্ত্রক বনে যান।

রেন্টসিকিং পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবেন, কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবেন না—কীভাবে কী হয়ে গেল! আর রেন্টসিকিং-এর এই প্রক্রিয়ায় রেন্ট-সিকারদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে, যা দুর্ভেদ্য—যে ত্রিভুজটি বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন-নিয়ম-বিধি প্রয়োগ করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। রেন্টসিকিং-এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় ‘zero sum game’ও নয়—এটা প্রকৃত অর্থে ‘negative sum game’। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক ‘অদৃশ্য হাত’ (invisible hand of market) অন্য সবার জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্ব মহামন্দা আর ২০০৭-০৮-এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের ‘অদৃশ্য হাত তত্ত্ব’ আর কেউ বিশ্বাস

করেন কি-না সন্দেহ—'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য। আর এখনকার নব্য-উদারবাদ হলো এই 'অদৃশ্য হাত'-এর দৃশ্যমান তত্ত্ব।

এখন বাজারব্যবস্থাটাই এমন—যা রেন্টসিকিং সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে—রেন্টসিকিং সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; রেন্টসিকিং অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা বাড়াবে। আর ওই অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে—রেন্টসিকিং-উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে। আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে। আর পুরো এই প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৭: ২৩-৩৪)। রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে অনেক হাতিয়ার ব্যবহার করে, যার অন্যতম হলো: নিয়মনীতি প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে এমনভাবে কব্জায় নিয়ে আসে, যাতে করে বাজারের খেলায় তারাই খেলোয়াড় এবং একইসাথে তারাই রেফারি অথবা আম্পায়ারের নিয়োগদাতা।

রেন্ট-সিকাররা এমনই শক্তিমান যে তারা ক্ষমতাকে (power) রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বনে যান। আর এসবের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম যে—আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালায় যাই-ই লেখা থাকুক না কেন—সেসব শেষপর্যন্ত রেন্টসিকারদের স্বার্থ হাসিলে বাধ্য। অর্থাৎ আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির বাহক রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কতিপয়তন্ত্রের আধিপত্য বজায় রেখে আইন-কানুনের কিছু গণমুখী-দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য কল্যাণউদ্দিষ্ট সংস্কার (reform) অথবা তথাকথিত সুশাসন (good governance) শেষপর্যন্ত কাজ করবে না—কাঠামোগত কারণেই। আর অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এই কাঠামোগত কারণেই এখানে চিরস্থায়ী হবে "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" ("culture of injustice"; বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৫ খ: ২৬-৫৪)।

১২। আমাদের দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা রেন্টসিকার ও দুর্বৃত্তায়িত। সুতরাং এ কথা আমাদের জানাই ছিল—বাংলাদেশের ভূমি আইন দরিদ্র বান্ধব নয়; নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীর ভূমি অধিকার রক্ষায় কার্যকর। জমি-জলা-জঙ্গলে যাদের অধিকার নিশ্চিত হবার কথা ছিলো সর্বাগ্রে, সেই জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষ এই পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্যজন—সর্বার্থেই অপাঙ্‌ক্তেয়, কৌলিন্যহীন। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো—কোথাও তাদের ঠাঁই নেই। বরঞ্চ তাদের উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাতের 'কারেন্ট জাল' বেছানো সর্বত্র—জাল ছিঁড়ে বেরোনোর কোনোই উপায় নেই।

ভূমি আইনের সমস্যা অগুনতি। আইনে রয়েছে অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, সাংঘর্ষিকতা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতির ওই তত্ত্বমতেই যেন, পুরো আত্মসাৎ-প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেবার এক অন্যতম ক্রীড়নক–হলো ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন। তাই, যেকোন বিচারেই, ভূমি আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'-এর লেন্স—সর্বোতভাবেই কার্যকর এক লেন্স। আর, অন্যান্য গবেষণা—যার অনেককটিই এই গ্রন্থের লেখকদেরই করা—এটা নিশ্চিত করেই দিয়েছে যে: আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে অনুপস্থিত।

আর যদি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের প্রসঙ্গগুলো টানি—তাহলে, এটি নগ্নভাবেই দৃশ্যমান যে এই অতি জরুরি বিষয়গুলো আইনগুলোতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত নয়। আর এটাও বলা ভালো যে আইনের এইসব দুর্বলতা কিন্তু কোনো 'মানবিক ভুল' (human error) নয়—এটি ইচ্ছাকৃত, দুরভিসন্ধিমূলক এবং এমনভাবেই করা যেন, সকল নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শাসিত সমাজের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু বিনা বাধায় আত্মসাৎ করা যায় ।

খাসজমি—যা এমনকি দেশের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য—তা তারা পান না, পেলেও ধরে রাখতে পারেন না। এসব সংশ্লিষ্ট আইনি দলিল—খাসজমিতে, তা সে কৃষি কিংবা অকৃষি থেকে, 'অধিকারহীন'-এর অধিকার নিশ্চিত করে না মোটেও। আইন বাস্তবায়ন—অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা, বন্দোবস্ত এবং ধরে রাখবার (retention) উপায়—এমনভাবেই বিনির্মিত হয় যে সেখানে দরিদ্র-ভূমিহীন মানুষের কার্যকর কোনো অংশগ্রহণ থাকে না; বলা ভালো, থাকতে দেয়া হয় না। যারা বন্দোবস্ত পানও কপালগুণে, তাদের সেই বহু আরাধ্য জমিটুকুর দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়েও অনুপস্থিত একটি কার্যকর নির্দেশনা। এ ছাড়াও, শ্রেণিকাঠামোর গড়নটিই এমন যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিটুকু ধরে রাখবারও কোনো উপায় খুঁজে পান না শ্রেণিকাঠামোর মইয়ের 'নিচের ধাপের' মানুষ। আইন এবং তার ব্যবস্থাপনা কাঠামোটিই এমন যে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহকগণ (যারা শাসক/শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই করেন মূলত) পুরো প্রক্রিয়াটিকেই করে তোলে স্বেচ্ছাচারমূলক—যেখানে স্পষ্ট হয়ে থাকে অধিকার, ক্ষমতা, এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা। অথচ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বলে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য" [অনুচ্ছেদ ২১ (২)]। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে যারা বরাদ্দ পান, তাদের জন্যও ওই বরাদ্দপ্রাপ্ত খাসজমি অধিকারে রাখবার ন্যূনতম

কোনো ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। খাসজমি—কৃষি এবং অকৃষি দুই ক্ষেত্রেই—ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই শাসক শ্রেণির দ্বারা (by) এবং শাসক শ্রেণির জন্যই (for)।

"জাল যার জলা তার"—এই ন্যায্য নীতির কোনোই বাস্তবায়ন দেখা যায় না সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ১৭ কোটি মানুষের এ দেশে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা জলাকেন্দ্রিক, অথচ এর দুই-তৃতীয়াংশ বাস করতে বাধ্য হন বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে—যার শুরুটা হয় মন্দ আইন এবং সেই মন্দ আইনের মন্দতর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। জলমহালসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলকে আপাতদৃষ্টিতে মৎস্যজীবীদের জন্য অনুকূল মনে হতে পারে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন—যা আইনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এমনই, যে তা অতি 'সতর্ক'ভাবে এই মৎস্যজীবীদের 'বহিঃস্থ' করে রাখে। প্রবেশ করে 'মৎস্যজীবী' পরিচয়ে 'ক্ষমতাশালী মৎস্যজীবী'রা—তারাই শাসক, তারাই লুটেরা। নারী? সে তো পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্য—ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাহীন (নারীর ক্ষমতাহীনতার বহুমাত্রিকতা এবং গভীরতা সম্পর্কে দেখুন, বারকাত ২০২০: পৃ. ৩৮৮-৪১২)।

"অধিগ্রহণ' হলো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। অন্যদিকে, 'হুকুমদখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ। আমাদের এই দেশে—যেখানে জনঘনত্ব অত্যধিক এবং কৃষি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত সামাজিক-মইয়ের নিচের দিকের মানুষের জন্য—স্বভাবতই, 'অধিগ্রহণ' এবং 'হুকুমদখল ভূমি ডিসকোর্সে অতীব দরকারি। এ জন্য আইন আছে । কিন্তু, এই আইনে উল্লেখই হয়নি 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'-এর মতো দরকারি সব আইনি শব্দের সংজ্ঞা। অন্তর্ভুক্ত হয়নি 'পুনর্বন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থ-সামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদির মতো বিষয়। ক্ষতিপূরণ মানেই আর্থিক (financial), অ-আর্থিক (non-financial)-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়ে এই আইন নিশ্চুপ। অধিগ্রহণের ফলে যে ব্যক্তি স্থানচ্যুতিতে বাধ্য হন, সেই স্থানচ্যুতির আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর ব্যত্যয় ঘটানোই যেন রীতি। ধনীরা ক্ষতিপূরণ পান দ্রুত, দরিদ্রদের ঘুরতে হয় দিনের পর দিন—তারপরও যদি কিছু পান, তার পরিমাণও হয় নগণ্য। হুকুমদখলের ক্ষেত্রে আইনে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হয়। কিন্তু, বাস্তবে সেসব মানদণ্ড ক্ষমতাসীনের পক্ষেই যায় শুধু। বিশেষ করে ওই জমির মালিক যদি হন দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী-আদিবাসী-প্রতিবন্ধী—তবে তো তার কণ্ঠ অশ্রুতই থেকে যায়।

আমাদের এই দেশে "জমি ব্যবহার" (land use) হয় যার-যার ইচ্ছেমতো—না, বলা ভালো যে কাজটি হয় শাসকের ইচ্ছেমতো। ফলে কমে কৃষি জমি, কমে জলা, বাড়ে ভূমিহীন কৃষক-জলাজীবী মানুষ। বাড়ে দারিদ্র্য, বাড়ে প্রান্তিকতা। পরিবেশ অমূল্য।

অথচ আমাদের ভূমির ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে, এমনভাবেই হচ্ছে যে পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে—যার ফল ভোগ করতে হবে বংশপরম্পরায়। আইনি দলিল একটা আছে বটে, কিন্তু তা কাগজেই। রাষ্ট্রের যেখানে দায়িত্ব ছিল তার জনগণের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং অধিকার নিশ্চিত করা—সেখানে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হবার 'রকেট গতির প্রতিযোগিতা'য় প্রতিনিয়ত ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে বর্তমানসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

অর্থাৎ, ভূমি আইন ব্যবহারের যে ধারা ও পদ্ধতি, তা, আমরা যে দরিদ্র ও অ-ক্ষমতা উৎপাদনকারী এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের কথা বলছি, সেটাকেই পোক্ত করে—রাজনীতি সেখানে শোষকের পক্ষের একটি অস্ত্রমাত্র, আর কিছু নয়। ক্ষমতায়, যে—যে নীতি নিয়েই আসুন না কেন, তা বরাবরই একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতেই তৎপর; বাকিদের স্বার্থ ঠিক ততটুকু রক্ষা করা হয়, যতটুকু না করলে শাসিত শ্রেণি ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তটুকু উৎপাদনের ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলবে।

১৩। জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান নিয়ে সরাসরি-সোজাসাপটা একটা প্রশ্ন করাই যেতে পারে। প্রশ্নটি এ রকম: ওইসব আইন-কানুনের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না—যখন "আইন" যাদের জীবনমান-উন্নয়নের জন্য প্রণীত বলে বলা হয় তারা তার কিছুই জানেন না, জানবেন না, তাদের তা জানানোও হবে না। আসলে এভাবেই সৃষ্টি হয় দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ মানুষের মধ্যে "নীরবতার সংস্কৃতি" (culture of silence), যা ধনী-রেন্টসিকারদের অস্তিত্বকে সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বলে দৃশ্যমান করে। শোষণভিত্তিক সমাজে "আইন-কানুন-রীতি-নীতি"কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ এমনভাবে হাজির করা হয় যে খুবই সচেতন ও সংগঠিত না-হওয়া পর্যন্ত দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ "নীরবতার সংস্কৃতি" ভাঙার কথা ভাবতেই পারেন না। মনোবিজ্ঞানী আইভান পাভলভের ভাষায়, এসব হলো আইন-কানুন-রীতি-নীতি সৃষ্টি করে জনগোষ্ঠীর "আচরণ পরিবর্তন" বা "মগজ ধোলাই" বা "জোর-জবরদস্তি করে মানতে বাধ্য করা" (coercive pursuasion)।

এ প্রশ্ন তো যে কোনো বিচারে অত্যন্ত যৌক্তিক যে, সে আইনের কী প্রয়োজন যা যাদের জন্য প্রণীত তা তাদের জানানো হবে না অথবা আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—না জানানোটাই এক আইন-রীতি। তবে যেকোনো আইনের যা যা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষকে ভালোভাবে জানানো হয়ে থাকে এবং হবে তা হলো 'শাস্তির আইন'। তাহলে নৈতিক দৃষ্টিতে ওইসব আইনই তো নীতিগর্হিত বিধায় বেআইনি। ওইসব আইন পুরো বিষয়ে শাসক শ্রেণি ও ক্ষমতাকাঠামোর প্রকৃত স্বার্থ গোপন রাখে; আর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের ব্যাপারে শুধু উদাসীনই নয় বিরোধাত্মকও। সুতরাং সে আইনের কী প্রয়োজন যা কৃষিজীবী ভূমিহীন মানুষকে জমি, জলজীবী জলাহীন মানুষকে জল-জলা, আর বনজীবী বন-জঙ্গলের মানুষকে

বন-জঙ্গলে মালিকানা দেবার কথা বলে কিন্তু আইনটিই তাদের জানতে দেয় না এবং কী করলে কোথায় গেলে ওইসব দরিদ্র মানুষ তাদের ন্যায্য হিস্যা পাবেন সে বিষয়ে তাদের কার্যত অজ্ঞ রাখে। যুক্তির নিরিখে এসব আইন এবং আইনি প্রতিষ্ঠানের তো কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইন তো বাস্তবে অস্তিত্বমান, আর বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানও তো বাস্তবে বিরাজমান। আর এসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে রাষ্ট্র-সরকারকে তো অনেক অর্থ-সম্পদ-সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসব ব্যয়ভার বহন করেন জনগণ—ট্যাক্সের টাকা-পয়সায়; আর এসবের ফলে শেষপর্যন্ত জনগণ 'ট্যাক্স দাসত্বের' (tax slavery) মারপ্যাঁচে পড়েন। তাহলে দাঁড়ালোটা কী?

শাসক শ্রেণি-ক্ষমতাবাহকেরা বলেন যে জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রবিধি, নীতিমালা—এসবই প্রণয়ন করা হয় রাষ্ট্র-সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনের জন্য। মানুষের মঙ্গলের লক্ষ্যে। প্রচার-প্রপাগান্ডাসহ বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঘটা করে বলা হয় যে এসব আইন-কানুন তো দরিদ্র-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের মঙ্গল-বিবেচনা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়। এসবই আপাতদৃষ্টে সত্য বলে মনে হয়—কিন্তু প্রকৃত অর্থে মিথ্যা। কারণ, আইন যদি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের মঙ্গল চিন্তা থেকেই প্রণীত হয়ে থাকে, তাহলে তা তাদের পুরোপুরি জানানো হয় না কেন? এসব থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে একটা সোজাসাপটা সুপারিশ করাই যেতে পারে: দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষকে খাস জমি-জলা দেবার দরকার নেই। কিন্তু, দেবার জন্য যে আইন আছে তা তাদের বিস্তারিত জানানো হোক এবং এসবের সাথে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সংযোগ বলা হোক।

আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো—সবই তো শ্রমজীবী দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের টাকা-পয়সা দিয়েই করা হয়, কিন্তু এসব তাদের সামনে স্বচ্ছ-স্পষ্ট করা হয় না, সেইসাথে বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সালাম-সেলামি না দিয়ে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকারও থাকে না। সত্যনিষ্ঠ-ন্যায়ভিত্তিক যেকোনো মানদণ্ডে এসব আইনের তো কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব আইন আছে এবং সম্ভবত দীর্ঘকাল থাকবে।

এসব আইন ততকাল থাকবে, যতকাল যাদের কথা ভাঙিয়ে এসব আইন-কানুন প্রণীত হয়েছে তারা এসবের ফাঁকফোকর বুঝবেন না, বুঝতে দেয়া হবে না, অর্থাৎ জন রাউলসের "ন্যায্যতার তত্ত্বের" ভাষায়—যতক্ষণ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষকে "অজ্ঞতার বোরখা" (veils of ignorance) পরিয়ে রাখা হবে। আসলে দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ মানুষকে আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালা—এসব না বুঝতে দেয়াটাই আইনবিষয়ক প্রচার-প্রপাগান্ডার মুখ্য বিষয়। কিন্তু যখনই দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ ব্রাত্যজন ওইসব ফাঁকফোকর বুঝে "অজ্ঞতার ঘোমটা" থেকে বেরিয়ে ওইসবের বিরুদ্ধে সংগঠিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা

উল্টে দিয়ে নিজেদের জন্য ন্যায্য-ন্যায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, তখন আর এখনকার এসব আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালার অস্তিত্ব থাকবে না। তখন দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষবিরুদ্ধ এবং ধনী-রেন্টসিকার-লুটেরা-পরজীবী শ্রেণির স্বার্থোদ্ধারউদ্দিষ্ট জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট এসব আইনই শুধু নয়, আইন বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহও ভেঙে পড়বে। এসবই হলো সমাজপরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতির ভেতরের কথা।

১৪। অতীতেও আমাদের শোনানো হয়েছে। এখন আরো বেশি বেশি শোনানো হচ্ছে। কথাটি এ রকম: বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান প্রয়োগে আইন-কানুন এখন গণমানুষের কল্যাণউদ্দিষ্ট করা হচ্ছে। 'ডিজিটাল' বিষয়টি অধুনা জনপ্রিয়—যদিও ১৯৬০-এর দশকে "প্রযুক্তিগত নির্ধারকতাবাদ" (technological determinism) নামক কাল্পনিক জগাখিচুড়ি তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে (দেখুন, বারকাত ২০১৯: ২৯-৩১)। ভাবখানা এ রকম যে জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট সব আইনকানুন-বিধি প্রবিধি-নীতিমালা—সবকিছু 'ডিজিটাল' করলেই দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের সব স্বার্থ উদ্ধার হয়ে যাবে। এসব অনেকটা "মাথাপিছু আয়"-এর ধোঁকাবাজ গল্পের মতো যে—যেহেতু মাথাপিছু আয় জনগণের মাথার পেছনের দিকে থাকে সেহেতু তা দেখা যায় না!

মূল কথা হলো সামাজিক স্বার্থবিযুক্ত ও সমাজবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি (তা ডিজিটাল অথবা অ্যানালগ—যে রকমই হোক না কেনো) বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। আর যদি থেকেই থাকে তাহলে তা শেষপর্যন্ত সংখ্যাস্বল্প শাসকগোষ্ঠী-ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার থেকে শুরু করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ শ্রেণিস্বার্থনিরপেক্ষ নয়। কথা হলো যেখানে ৮০ শতাংশ মানুষ প্রকৃতির সম্পদ জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট উৎপাদন উপায়ের মালিকই নন, সেখানে এসবের স্বার্থসম্পর্কিত আইন-কানুন-বিধি-বিধানগত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাপজোখ থেকে শুরু করে ভূমি ব্যবহার নীতি কার স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য তা নিরূপণে গবেষক হবার প্রয়োজন পড়ে না।

বিদ্যমান অন্যায্য আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের আইন হবে—আইন হবে জমি-জমার মালিকানা একক দলিলভুক্ত করার। কিন্তু এমন কোনো আইন ভুলক্রমেও হবে না যা দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে প্রকৃত খাস জমি-জলার পরিমাণ ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক নিরূপণ করে তা প্রকাশ করা হবে; এমন কোনো আইন হবে না যা দিয়ে প্রশাসন বাধ্য থাকবে দেখাতে যে কোন গ্রামে বা শহরে কোন ব্যক্তি-পরিবার কতটুকু খাসজমি-জলা পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন এবং কোন সময়ে, কোথায় তেমন কোনো ধরনের হেনস্তা ছাড়াই তিনি/তারা ওইসব পেয়ে যাবেন। বিরাজমান কাঠামোতে যা হওয়া সম্ভব এবং হবে তা হলো বিজ্ঞানসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার হবে প্রধানত বিদ্যমান কাঠামোকে জিইয়ে রাখতে এবং সে কারণেই জমি-

জলা-বনদস্যুদের স্বার্থোদ্ধার ত্বরান্বয়ন ও নির্বিঘ্নকরণ করতে। এসবে লাভ যারই হোক না কেন, কোনো লাভ হবে না দরিদ্র-ভূমিহীন-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের। তবে অধিকার যেহেতু দয়াদাক্ষিণ্যের নয়, আদায়ের বিষয়; সেহেতু অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলন হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

১৫। এই গ্রন্থে আমরা কৃষি-জমি-জলাসংক্রান্ত বেশকিছু "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন" নিয়ে আমাদের গবেষণাফল উত্থাপন করেছি। বলে রাখা দরকার যে "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন" বিষয়সমূহ প্রধানত গুণগত (primarily qualitative) বিষয় পরিমাণগত (quantitative) নয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর এ কথা আমরা সম্যক অবগত যে, "কোনো ভালো সিদ্ধান্তের ভিত্তি—সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে নির্ধারণ সম্ভব নয়, তা জ্ঞান দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে"। এ সত্ত্বেও আমাদের গবেষণাফল তুলনামূলক সহজবোধ্য, প্রয়োজনীয় ও উপযোগসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সামাজিক গবেষণায় রাজনৈতিক অর্থনীতির পদ্ধতিতত্ত্ব প্রয়োগসহ একটা 'নতুন দিগন্ত' (New horizon in social research) উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি। ওই নতুন দিগন্তটি হলো আইনসংশ্লিষ্ট গুণগত বিষয়াদিকে পরিমাণ দিয়ে দেখানোর প্রয়াস। বিষয়টি সহজও নয় সরলীকৃতও নয়। তবে বলে রাখা দরকার যে আইন বিষয়ের সংখ্যাবাচক পরিমাণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যথামাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ যাই-ই হোক না কেন (শোষণউদ্দিষ্ট কি-না তা এখানে মুখ্য বিষয় নয়) 'আইন' (ধারা-উপধারায় বিবৃত বিষয়বস্তু ও ভাষা) ও তার 'বাস্তবায়ন'সংশ্লিষ্ট গুণগত বিষয়াদিকে সংখ্যাবাচক পরিমাণগত পরিমাপ করে বোঝা সম্ভব যে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের ভাবনা ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতার নিরিখে এসবের দূরত্ব—আদর্শ অবস্থা (ideal state/situation) অথবা 'কাম্য অবস্থা' (expected state/situation) (যা নিঃসন্দেহে নর্মাটিভ অর্থাৎ উচিত/অনুচিতসংশ্লিষ্ট) থেকে কতটুকু (কত দূর) এবং ওই দূরত্বকে 'কাম্য-কাঙ্ক্ষিত-আদর্শ' দূরত্বে আনার পথ-পদ্ধতি কী হতে পারে। বিষয়টি বাস্তব-প্রায়োগিক বিবেচনায় গুরুত্ববহ।

'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন' (অথবা 'বাস্তবায়ন অবস্থা')—এ দুয়ের পরিমাণগত স্কোর-মান (quantitative score value) দিয়ে একদিকে যেমন অনেক কিছুই অনুধাবন সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে বাস্তব-প্রায়োগিক করণীয়ও নির্ধারণ এবং তা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্ভব। সহজভাবে বিষয়টি এ রকম: দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের 'অধিকার' (right)-এর নিরিখে সবচে বেশি 'কাম্য' (সবচেয়ে ভালো) অবস্থা হতে পারে তখন, যখন 'আইন' হবে "আদর্শ অবস্থার কাছাকাছি" আর একই সাথে "আইনের বাস্তবায়ন অবস্থা" হবে তারই কাছাকাছি (অর্থাৎ এ দুয়ের দূরত্ব হবে খুব কম); আর "আদৌ কাম্য হবে না" (অর্থাৎ সবচেয়ে মন্দ/খারাপ) সে অবস্থা, যা হবে উপরের ঠিক উল্টো অথবা বিপরীত অর্থাৎ 'আইন'

হবে "আদর্শ অবস্থার অনেক-অনেক পেছনে" এবং একই সাথে "আইনের বাস্তবায়ন" অবস্থাও হবে অনুরূপ "অনেক-অনেক পেছনে"; আর "মোটামুটি কাম্য অবস্থা" হবে তখন, যখন 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' অবস্থা—দুটোই হবে মধ্যম গোছের, মাঝামাঝি (ছক ১ দেখুন)। 'আইন' ও 'আইন বাস্তবায়ন' ভাবনার এ ধরনের ছক বলে যে, যদি কেউ (ব্যক্তি-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান) 'আইন' এবং তার 'বাস্তবায়ন' অবস্থা তুলনামূলক অধিকতর 'অধিকারমুখী' করতে ইচ্ছুক হন—সেক্ষেত্রে তাকে 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' উভয়কেই নিচের দিক থেকে উপরের দিকে নিতে হবে অর্থাৎ 'পেছন' থেকে "আদর্শ কাম্য" অবস্থার কাছাকাছি নিতে উদ্যোগী হতে হবে। 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন'-এর স্কোর-মানভিত্তিক এ ভাবনাটি বাস্তব-প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগুরু মানুষের জন্য ফলপ্রদ হতে পারে। যেমন—কৃষিজীবী-জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী শ্রমজীবী মানুষ, তাদের সংগঠন, গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাপ্রণেতা, অধিকার আন্দোলনকারী, বেসরকারি সংস্থা, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী, বিভিন্ন নাগরিক সমাজসহ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদি।

ছক ১: স্কোরিং-মান দিয়ে 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকাঠামো

বিদ্যমান 'আইন': 'আদর্শ'/কাম্য/কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে দূরত্ব	পেছনে	মাঝামাঝি	কাছাকাছি
'আইনের বাস্তবায়ন': বিদ্যমান 'আইন' থেকে দূরত্ব	পেছনে	মাঝামাঝি	কাছাকাছি

প্রচলিত আইনশাস্ত্রে 'আইন' ও 'আইন-বাস্তবায়ন' অবস্থার পরিমাণগত পরিমাপ খুব একটা করা হয় বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিমাপবিজ্ঞানের বিকাশ এসবের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব বাড়াবে। যতই ইচ্ছানির্ভর (subjective) হোক না কেন আইনের মর্মবস্তুর পরিমাপ করা হবে বহুমাত্রিক গুরুত্ববহ। আমরা আগেই বলেছি 'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন'—এসব তার আদর্শবিন্দু অথবা কাম্যবিন্দু থেকে কত পেছনে অবস্থান করছে তা জানার সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। আমাদের গবেষণায় এসব নিরূপণের চেষ্টাও করেছি। 'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন'সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পরিমাপ উভয়েরই শ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এ প্রশ্ন যথেষ্ট প্রায়োগিক মূল্যসম্পন্ন যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 'আইন বাস্তবায়নের' এক একক উন্নতি-উৎকর্ষ 'আইন' পরিবর্তনে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে অথবা 'আইন'-এর এক একক উন্নতি-উৎকর্ষ 'আইন বাস্তবায়নে'

কতটুকু প্রভাব ফেলতে সক্ষম? লেখচিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে যে 'আইন' ও (সেই) "আইনের বাস্তবায়ন" স্বাভাবিক রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থায় কোন ধরনের প্যাটার্ন (pattern under general situation) অনুসরণ করে থাকে, আর রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্তিত হতে থাকলে ওই প্যাটার্নের কেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্যাটার্নটা হয় এ রকম যখন 'আইন' জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রণীত নয় বিধায় জনস্বার্থের মানদণ্ডে পশ্চাৎপদ (পেছনে থাকে) আর 'বাস্তবায়ন' স্বাভাবিকভাবেই তার থেকে পেছনে-অনেক পেছনে থাকে (লেখচিত্র ১-এর ভূমি অক্ষের শুরুর দিক); আর অবস্থা বিপরীতমুখী হলে 'আইন' ও তার 'বাস্তবায়ন'—উভয়ই অনেক সামনে এগিয়ে যায় (লেখচিত্র ১-এর ভূমি অক্ষের শেষের দিক অর্থাৎ নিচের রেখচিত্রের মতো)। আবার এমনও হতে পারে—যা স্বাভাবিক নয়—যখন আইনের বাস্তবায়ন স্বাভাবিক প্রবণতাকে অতিক্রম করে। যেমন যদি কোনো এলাকা-অঞ্চল-দেশে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকেরা সংগঠিত আন্দোলন-সংগ্রাম করে প্রচলিত আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে খাস জমি-জলা-জঙ্গলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলে; এসবের অনুকূল 'আইন' পরেও প্রণীত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রবণতাটা হবে লেখচিত্র ১-এর উপরের দিকের রেখচিত্রের মতো।

লেখচিত্র ১: "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন"-এর পরিমাপ - সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহ

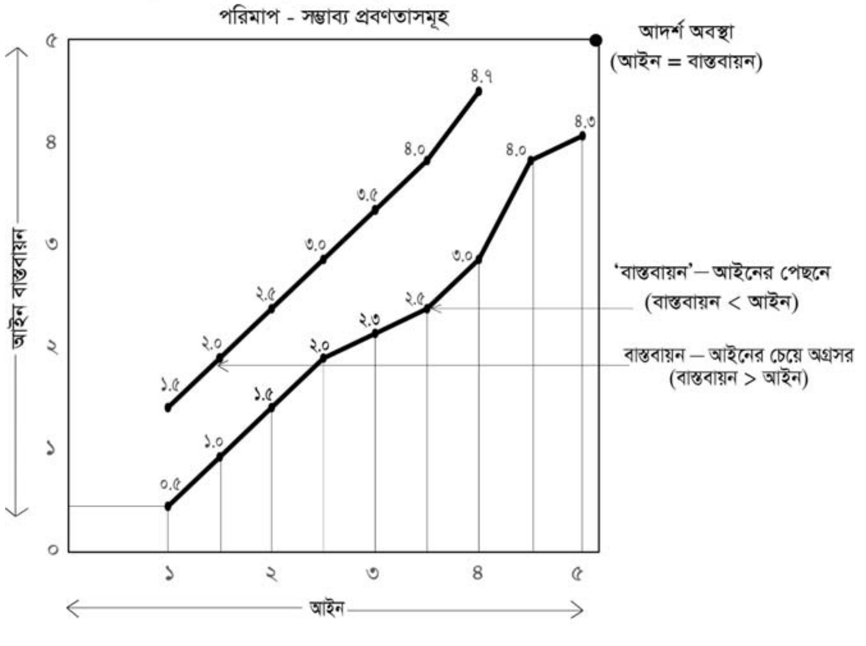

১৬। "আইন" থাকলে "মামলা" হবে—এটা রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত বাজার অর্থনীতিতে স্বাভাবিক। আর জমি-জমার ক্ষেত্রে এটা ধ্রুবসত্য। ভূমি নিয়ে মামলা-

মোকাদ্দমা-বিবাদ ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য-অধীনস্থ বিষয়। কিন্তু "ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি"সংশ্লিষ্ট একাডেমিক সাহিত্যে এসব এখনো পর্যন্ত স্বল্পগবেষিত বিষয়।

রেন্টসিকিংভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখারও অন্যতম মাধ্যম ভূমি মামলা। ভূমি মামলা আসলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ (anti-nature) বিষয়। কারণ 'সভ্য' মানুষ, যা সৃষ্টি করতে পারে না, তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা দাবি করে কী যুক্তিতে, মামলা তো অনেক দূরের কথা। ভূমি মামলার পুরো বিষয়টি পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণা দেখায় যে, ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাত্রা নিম্নরূপ: (১) এ দেশে মামলার দুই পক্ষ—বাদী ও বিবাদী, তাদের পরিবারের সদস্য-সাক্ষীসহ ভূমি মামলার সাথে সম্পর্কিত মোট মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, এ দেশে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষ ভূমি মামলায় জড়িত; কেউ কেউ আসলে একাধিক মামলায় জড়িত)। (২) বছরে ভূমিকেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লক্ষ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭ শতাংশ। (৩) এ মুহূর্তে যেসব ভূমি মামলার রায় অপেক্ষমাণ, সেসব মামলায় বাদী-বিবাদী মিলে মোট ভোগান্তিবর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লক্ষ বছর। (৪) দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লক্ষ একর, যা ক্রমপুঞ্জীভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। (৫) ভূমি নিয়ে প্রতিবছর যেসব মামলা হচ্ছে, ওইসব জমির বর্তমান বাজারমূল্য ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা। (৬) সমগ্র দেশে ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবারসমূহ (বাদী-বিবাদীসহ) বছরে ১২ হাজার ৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। (৭) ভূমি মামলাসংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ), ৫০ শতাংশ ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ নেন পুলিশ-থানা, ১৫ শতাংশ ভূমি অফিস, ১৪ শতাংশ কোর্টের কর্মকর্তা)। (৮) এ মুহূর্তে সারাদেশে যারা ভূমি মামলায় জড়িত, তারা মামলা পরিচালনে ইতিমধ্যে ২৫ হাজার ৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীর প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হবে। কারণ, আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসাব করা হয়নি অথবা হিসাব করা সম্ভব হয়নি—তা হলো: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরনের বাহ্যিকতা ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি

তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে তার অর্থমূল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখমের ফলে বহু ধরনের যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থমূল্য (cost of corruption) (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ও রায় ২০০৪: ২৯১-২৯২)।

একদিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি মামলা, আর অন্যদিকে তা অর্থনীতি ও রাজনীতির অধিকতর দুর্বৃত্তায়নে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচারব্যবস্থা অকার্যকর করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চিরস্থায়ীকরণে ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃঙ্খলা ও বিচারের সিস্টেমে শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা—যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন।

ভূমি মামলায় সবচেয়ে বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা—যারা দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, নারীপ্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ যাদের মধ্যে আছেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যাস্বল্প মানুষ, আদিবাসী মানুষ, উপকূলীয় 'ভঙ্গুর' মানুষ, চরের মানুষ।

প্রচলিত ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না, উভয়েই হারেন (losing battle for both)। কারণ, শেষপর্যন্ত মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও)—যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি। ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে মামলাধীন পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সব উন্নয়নসহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে ক্ষয় করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পেছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্যপরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক-জাতীয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভূমি মামলা পারিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যসম্পর্কের বিনষ্টীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

ইদানীংকালের 'আধুনিক' ভূমি মামলায়, যেখানে মামলার পেছনে থাকে জমি-জলা-বনদস্যু বাহিনী (হতে পারে তা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অথবা জমির দালাল গোষ্ঠী

অথবা জমি-জলা-বনদস্যু কালোটাকা বিনিয়োগকারী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী)—তারাই মামলায় জেতে—প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন। ভূমি মামলা কর্পোরেটাইজড। মামলার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত ব্যক্তিদের 'চেইন'টি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রক—রেন্টসিকিং সিস্টেম (দেখুন, বারকাত ২০২০: ৩০২)।

মামলার বাদী-বিবাদী নন, অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের অনেকেই নিঃস্ব ভূমিহীন মানুষ) অনেকে যারা যেকোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ—তারা মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে তাদের ভঙ্গুর জীবনীশক্তিটিও হারিয়ে ফেলেন। মামলার এসব সাক্ষী, যারা অন্যের হয়ে সাক্ষ্য দিতে কোর্টে হাজিরা দেন—প্রথম প্রথম তাদের কিছু ব্যয়ভার বহন করেন বাদী অথবা বিবাদী। কিন্তু, ভূমি মামলা তো চলে ৩ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত। মামলা চলার একসময়ে বাদী অথবা বিবাদী তাদের পক্ষের সাক্ষী-দরিদ্র মানুষটিকে কোনোমতে জীবন পরিচালনের জন্য আগের মতো টাকাপয়সা দেয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকে মামলার সাক্ষী দরিদ্র-দিনমজুর-ভূমিহীন মানুষটি মামলার শুনানির দিনে বাধ্য হয়ে নিজখরচে কোর্ট-কাছারিতে হাজিরা দিতে যাওয়া শুরু করেন। অবস্থাটা শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় এ রকম—দরিদ্র মানুষটির আয় কমে যায়, ঋণ বাড়তে থাকে, পরিবারের খাদ্য পরিভোগ কমে যায়, পরিবারের দুর্দশা বাড়ে, সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যয় বহনের নিম্নতম ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়, দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে যা ছিল তা-ও তিনি বিক্রি করতে বাধ্য হন। দরিদ্র ওই মানুষটি ভূমি মামলার বাদী অথবা বিবাদী নন, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই মামলাটাই তাকে দরিদ্র থেকে করে নিঃস্ব আর নিঃস্ব থেকে ভিক্ষুক। অর্থাৎ ভূমি মামলা দরিদ্র মানুষের জন্য "প্ররোচিত আত্মহত্যা"র শামিল।

১৭। এ গ্রন্থে আমাদের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয় হলো 'জমি-জলা'সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ের—খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল এবং ভূমি ব্যবহারের—আইন ও তা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি। আমরা সে কাজটিই করেছি। রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের নিরিখে ভাবনা-চিন্তার পদ্ধতিতাত্ত্বিক ভিত্তি হওয়া উচিত 'বড় পর্দায়'; যে পর্দার অন্তরালের অধীনস্থ বিষয় হবে ছোট পর্দার এসব আইন-কানুন। কেন "বড় পর্দা"? এর পেছনের যুক্তি হিসেবে আগে বলেছি পরেও বলব। তবে সহজবোধ্য যুক্তি হিসেবে দার্শনিক প্লেটোর একটি বক্তব্য—প্রণিধানযোগ্য: "চিকিৎসকদের কাছে অনেক রোগের নিরাময় অজানা। কারণ তারা শরীরের সব অঙ্গ সম্পর্কে জানেন না। অঙ্গের একাংশের নিরাময় সম্ভব নয় যদি পূর্ণ অঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে"।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অন্ততপক্ষে এ কারণেও যে ছোট পর্দার বিষয়াদিকেই প্রায়শ আমাদের সামনে বড় পর্দার বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে যুক্তিজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। কাজটি করে শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার প্রচার-প্রোপাগান্ডামাধ্যম। আর এই কাজটি

করানো হয় ‘মিডিয়াসৃষ্ট’ এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে।[৩] এ হলো কোনো বিষয়ের বাহ্যিক আবরণকে (appearance) ওই বিষয়ের মর্মবস্তু (essence) হিসেবে চালনার সচেতন অপপ্রয়াস। এসবকেই বলা যেতে পারে জণগণের “অজ্ঞতার ঘোমটাকে” চিরস্থায়ীভাবে ঘোমটাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে “জনসম্মতি উৎপাদন” (consent manufacturing) অথবা “জনসম্মতি ইঞ্জিনিয়ারিং” (consent engineering)।

আমরা যে বড় পর্দার কথা বলছি সেটা হলো “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধান।” আর ওই সংবিধানের মূল বিধানটি এড়িয়ে অথবা তা অমান্য করে কোনো আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হবে অসম্পূর্ণ, আংশিক, একপেশে এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত। তাই-ই আইন-কানুন প্রণয়ন ও তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের কয়েকটি মৌল বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে—হিসাবে রাখতে হবে। দেশের সব আইন-কানুনই সর্বোচ্চ আইন—“সংবিধানের” অধীনস্থ। সংবিধানে বিধৃত ওইসব আইন নিম্নরূপঃ

(ক) “জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদশ—সংবিধানের মূলনীতি” (সংবিধানের প্রস্তাবনা);

[৩] এ প্রসঙ্গে অনেক উদাহরণের একটা এ রকমঃ ২০১২-এর ২৯ জুলাই তারিখে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথে স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকল ‘মিডিয়াসৃষ্ট’ একশ্রেণির ‘বুদ্ধিজীবীদের’, যারা নিজেদের ‘সামাজিকভাবে মর্যাদাবান’ মনে করেন; এবং যাদের ভেতরটা সম্পর্কে অথবা মতাদর্শ সম্পর্কে দেশের মানুষ খুব একটা অবগত নন। এরপরেই দৃশ্যমান মূল খেলা শুরু—অন্তত মিডিয়াতে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নয় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই যে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব তা ‘সামাজিক মর্যাদার দাবিদার’ অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, রাষ্ট্রচিন্তক, রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই সমর্থন করেননি। তাদের মূল কথা হলোঃ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব। নিজের অর্থে যে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম তা নিয়ে তারা শুধু সন্দেহ-সংশয়-বিদ্রূপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা রীতিমতো এর বিরোধিতা করেছিলেন—হিংস্র বিরোধিতা। অর্থনীতি, অর্থায়ন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, সক্ষমতাসংশ্লিষ্ট জটিলসব বিষয় উত্থাপন করে তারা জনগণকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন। আর এসব বিরোধিতা মারাত্মক মারমুখো স্থূল রূপ নিলো ঠিক সেই দিনক্ষণ থেকে, যখন বিশ্বব্যাংক (দুর্নীতির ষড়যন্ত্র-এর কথা বলে) পদ্মা সেতুর জন্য তাদের প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি বাতিল ঘোষণা করল। ‘সামাজিক মর্যাদার দাবিদার’ আমাদের বুদ্ধিজীবীরা—অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিশ্লেষক, বিরোধীদলীয় রাজনিতিবিদের কথা নাই-ই বা উল্লেখ করলাম—নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের নিম্নতম সম্ভাব্যতা বাতিল এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব নয় এবং সঠিকও নয়—এসব বলার জন্য তারা ঠিক সেই সময়টা বেছে নিল, যখন বিশ্বব্যাংক চেয়েছিল—‘সরকার পরিবর্তন’ (regime change)। আমার মতে, সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাদের দেশীয় জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীদের শুধু মতামতের (opinion) বিষয় ছিল না—আসলে বিষয়টি ছিল গভীর মতাদর্শিক (ideological)। আর এই মতাদর্শটির নাম নিও লিবারেলইজম, যার প্রধান লক্ষ্য হলো—পুঁজিবাদের রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশনের (ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন) স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ সমধর্মী সংস্থাদের দালালি করা, যার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমের অধীনস্থ সত্তা হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে ধরে-বেঁধে রাখা সম্ভব হয় (দেখুন, বারকাত ২০২১: ৯৩-৯৪)।

(খ) "রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে" (সংবিধানের প্রস্তাবনা);

(গ) "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।...। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" [অনুচ্ছেদ ৭। (১) ও ৭। (২)];

(ঘ) "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে" (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১১);

(ঙ) "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবেঃ (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা, এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা" (অনুচ্ছেদ ১৩);

(চ) "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে–কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা" (অনুচ্ছেদ ১৪);

(ছ) "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়–(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৫);

(জ) "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" (অনুচ্ছেদ ১৬);

(ঝ) "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" (অনুচ্ছেদ ১৮ ক);

(ঞ) "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)];

(চ) "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন" [অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)];

(ছ) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৯। (১)]।

প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন—আমাদের সংবিধান—স্পষ্ট বলছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হবেন জনগণ এবং জনগণের জীবনমান ক্রমান্বয়ে উন্নতির লক্ষ্যে গড়তে হবে শোষণমুক্ত সমাজভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাম্য ও সম-অধিকার, বিলুপ্ত করতে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্য, প্রতিষ্ঠা করতে হবে উৎপাদনের উপায়ের ওপর রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী মালিকানাসহ কৃষিবিপ্লব এবং প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন। এসব হলো 'গণতন্ত্রের' মর্মকথা। কারণ, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো 'সম্মতি' (consent)—"জনগণের সম্মতি" (people's consent)। আর সংবিধান হলো 'জনগণের সম্মতির' সর্বোচ্চ আইনি দলিল। সুতরাং বাস্তব জীবনের আইন-কানুন—খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলসহ ভূমি ব্যবহার যেটাই হোক না কেন, তার যতটুকু সংবিধানবিধৃত উল্লিখিত দিকনির্দেশনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক ততটুক বাতিল বলে পরিগণিত হবে [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭। (২)]। এটা আমাদের সংবিধানেরই বিধান

১৮। আমরা কয়েকটি 'স্থির' (অন্তত, আজকের এবং নিকট-ভবিষ্যতে আমাদের দেশ কিংবা তুলনীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি—

ক। ভূমি, আইন, এবং আইনের বাস্তবায়ন পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়—যা আমাদের জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের এক অন্যতম চালিকাশক্তি।

খ। রাষ্ট্র-অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতি কিংবা অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে ভূমি-আইন একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা শাসকের পক্ষে শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু আত্মসাতের পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয় মাত্র।

গ। আইন মন্দ, নানান দোষে দুষ্ট—নানান 'ভদ্র মোড়কে' শোষক বা শাসকের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই লাগে। তদুপরি, আইনের বাস্তবায়ন মন্দতর—আইনের যেটুকু আপাত-ভালো, সেটুকুও শাসিতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে না; বলা ভালো—করতে দেয়া হয় না।

ঘ। ভূমি, ভূমি-আইন এবং ভূমি আইনের বাস্তবায়ন কীভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সাথে জড়িত এবং তার জীবনের গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে-প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার বিশ্লেষণ একমাত্রিক নয়—বহুমাত্রিক। এই বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যাটির গভীরে (root cause) যেতে হলে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার (tool)।

১৯। একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং সে প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে যে—আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে এসেই থাকি যে ভূমি-আইন শুধু শাসকের পক্ষেই যাবে এবং তা শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের নামে আত্মসাতেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে কী হবে? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট উত্তর। উত্তরগুলো কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক। জ্ঞানচর্চা একটি নির্মোহ প্রক্রিয়া। এখানে পক্ষ-বিপক্ষনির্বিশেষে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নবাণ, নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ, নতুন চর্চা ঘটাটাই স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ চর্চা। এটাই সত্য উদ্‌ঘাটনের নির্মোহ পথ। এই জ্ঞানচর্চার ফল, তাৎক্ষণিক কে পেল, সেটি বিবেচনা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয়।

খ। পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণকৌশল নানান ধরনের হয়। গবেষণার ফলাফল, বিশেষ করে সামাজিক-গবেষণা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে, কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপরও নির্ভরশীল। গবেষণা ফলাফল, তা সে যতই শক্ত অনুমিত ধারণার (Assumption অর্থে) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াক না কেন—তার গুণগতমান এবং নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিকতার ওপরও নির্ভর করে। সেই বিবেচনায়, ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"-ভিত্তিক হাতিয়ার ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন

এতদ্‌সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে, আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। যা, সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে; সহায়তা করবে প্রয়োজনীয় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে "অজ্ঞতার বোরখা" থেকে বেরুতে।

গ। কাগজে-কলমে গবেষণার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করি। তারপরও, গবেষণার-ফলাফলের ব্যবহারিক দিকটিও আমরা বিবেচনায় নিই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, বিশেষ করে, তা যদি আমাদের বিদ্যমান সমাজকাঠামোর নিচতলার মানুষের, অধিকারহীনতা-দারিদ্র্য-বঞ্চনা লাঘবে একটু হলেও শক্তি যোগায় তাহলে সেই গবেষণা এবং গবেষণা ফলাফলের প্রচারণাকে আমরা নৈতিক অবস্থান থেকেই সমর্থন করি। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজগঠনে এটা গবেষকের দায়বদ্ধতাও বটে। এখানে নোয়াম চমস্কির ধারণাটা বলে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে একজন সমাজসচেতন গবেষক মাত্রেই হবেন একই সাথে জীবনসংলগ্ন বুদ্ধিজীবী (organic intellectual) এবং ন্যায্য-আন্দোলনসম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী (activist intellectual); এহেন বুদ্ধিজীবীর মূল দায়িত্ব হবে—সত্য বলা এবং মিথ্যে উন্মোচন করে জনসম্মুখে উত্থাপন করা। আর অ্যান্থনি গ্রামসির মতে, এ ধরনের গবেষক-বুদ্ধিজীবীর অন্যতম বিশ্বাস হবে—"বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সন্দেহ আর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আশাবাদী" (pessimism of the intellect and optimism of the will)।

২০। আগেই বলেছি, আদর্শ অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে 'শাসক' আর 'শাসিত' হয়ে উঠবেন একটি একক সত্তা। অর্থাৎ, আদর্শ অবস্থাটি হচ্ছে এমন, যেখানে 'শাসিত = শাসক'। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা—তা সে যে-নামে যে-পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন—কোনোভাবেই এমন একটা অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে দেবে না—যেখানে 'শাসিত = শাসক' এমন সমীকরণ সত্য হয়ে উঠবে। এমতাবস্থাকে যদি আপাতত সত্যি বলে মেনে নিই, বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিই—তাহলে আমরা একটি 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার দিকেই যেতে চাইব; যদিও আমরা খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত আছি যে 'প্রায় সমান' অবস্থা কোনো প্রকৃত সমাধান দেবে না। তারপরও, যখন নিকট বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলাই যায় যে, 'সমাজপরিবর্তনের বিপ্লব' তৈরির মতো কোনো ভ্রূণাবস্থাও কোথাও বিরাজ করে না—সে রকম একটা সময়ে এবং অবস্থানে আমরা সচেতনভাবেই 'শাসক' এবং 'শাসিত' এই দুই সত্তাকে 'প্রায় সমান' কীভাবে করা যায় সেই পথনির্দেশের সন্ধান করেছি।

অর্থাৎ, আমাদের এই গবেষণা ততটুকুই করতে পারে—যেখানে ওই তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকাঠামো এমন একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে, যেখানে 'শাসিত ≅ শাসক'।

২১। আমরা এটি জানি যে 'প্রায় সমান' অবস্থায় নেবার মতো আমাদের গবেষণা-উদ্ভূত সুপারিশমালা তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি' অথবা 'সুশীল সমাজ'-এর কার্যক্রমের সাথেই তুলনা করবেন অনেকে। মুক্তচিন্তা ও চিন্তার স্বাধীনতার কারণে তা তারা করতেই পারেন।

তবে আমরা ওদের তুলনায় ভিন্ন, পুরোপুরি ভিন্ন। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে আমরা যুক্তিসঙ্গত সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলি যে দেশের ২ কোটি বিঘা খাসজমি-জলা ১ কোটি ভূমিহীন-নিঃস্ব-বঞ্চিত-প্রান্তিক মানুষের খানা-পরিবারের মধ্যে বন্টন জরুরি (যা 'সুশীল'রা বলবেন না)। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে দার্শনিক রুশোর মতো বলতে পারি—"বৈষম্য-অসমতা-অবিচার সৃষ্টির উৎস হলো সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা" (যা 'সুশীল'রা কখনোই বলবেন না)। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে আমরা বলি যে "শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী ও গরিবের সমাজের প্রতি সমান ও সমদায়িত্ব যুক্তিহীন বিষয়" (যা 'সুশীল'রা বুঝলেও বলেন না, মানেন না)। আমরা বিশ্বাস করি যে গরিব মানুষের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মতো কিছুই নেই; আর তাই বলি—বিদ্যমান শোষণভিত্তিক কাঠামোতে ওদের জন্য "সুযোগের সমতা" যুক্তিহীন—ভিত্তিহীন বিষয়; আরো বলি যে ওই "সুযোগের সমতা"র বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ন্যায়সঙ্গত ('সুশীল'রা এসব জানলেও জানতে পারেন, কিন্তু শোষণভিত্তিক সমাজে যুক্তি-ভিত্তি-নীতি-নৈতিকতাহীন "সুযোগের সমতা"র কোরাস অব্যাহত রাখেন)। আমরা বলি যে, যেকোনো সুস্থ-শোভন সমাজের দায়-দায়িত্ব-বিধি হওয়া উচিত "সুবিধা" বা "লাভ" (benefit) এবং "বোঝা" বা "ভার" (burden) উভয়ই সমাজের সবাই মিলে মোটামুটি সমভাবে ভাগাভাগি করে নেয়া; কিন্তু 'সুশীল'রা যা নসিহত করেন, তার নিহিতার্থ হলো—'সুবিধা' বা 'লাভ'-এর মালিক হবেন সমাজে শ্রেণিমই-এর উপরতলার কিছু মানুষ—"সভ্যতার প্রভু" পুঁজিপতি-অর্থবিত্ত-সম্পদের মালিক শ্রেণি (তবে কিছুটা চুইয়ে নিচের দিকে গেলে অসুবিধা নেই); আর সব 'বোঝা' বা 'ভার' বহন করবে শ্রেণিমই-এর নিচতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ—শোষিত মানুষ (রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এসব ব্যবস্থার নাম দাস, সামন্ত, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা)। আমরা অন্যায্য দাস-সামন্ত-পুঁজিতান্ত্রিক সিস্টেমের সমালোচকই শুধু নই, আমরা ওসব উল্টানোর পক্ষে। আর 'সুশীল'রা ওইসব সিস্টেম জিইয়ে রাখার নিরাপোস সমর্থক-রক্ষক—এককথায় বুদ্ধিবৃত্তিক ভৃত্য-দাস। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার প্রতি অনুগত-বিশ্বস্ত, আর 'সুশীল'রা ক্ষমতার যেকোনো রূপ—সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, অনির্বাচিত এবং তথাকথিত নির্বাচিতনির্বিশেষে সবধরনের শাসনব্যবস্থার প্রতি সদাবিশ্বস্ত ও আনুকূল্যপ্রত্যাশী। আমরা ততটুকু ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে উচ্চকণ্ঠে বলি যে রাজা-বাদশা-

সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা "প্রকৃতিগতভাবেই বৈধ" (যা 'সুশীল'রা কখনো বলবেন না, তবে রাজা-বাদশার পতন হলে বলেন)। আমরা ততটুকু ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রামে শ্রেণিসংগ্রামের ভূমিকার অনস্বীকার্যতার কথা বিশ্বাস করি, উচ্চারণ করি এবং যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণে সচেষ্ট—আর বিপরীতে সব 'সুশীল' তো "মতাদর্শের মৃত্যু" (end of ideology) তত্ত্ব সত্য বলে ঘোষণা দিয়ে এখন বাজার অন্ধত্বের একপক্ষীয়-কর্পোরেট শ্রেণিসংগ্রামে (one-sided class struggle) বা প্রতিপক্ষহীন শ্রেণিলড়াইয়ে আপোসহীন মহাযোদ্ধা। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে বলতে পারা যায় যে আইন-রাজনীতি-অর্থনীতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন কোনো ভিন্ন প্রপঞ্চ বা ধারণা নয়। আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যেখান থেকে বলা যায় যে 'ভূমি আইনের সমস্যা' কোনো 'আইনি সমস্যা' নয়—এটি সব বিচারেই রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। আমরা এইটুকুই শুধু ভিন্ন, যখন বলা যায় যে 'খুপড়িভুক্ত' ও 'বিচ্ছিন্ন' দৃষ্টি এবং গবেষণা দিয়ে ভূমি আইনের সমস্যার আইনি বিশ্লেষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-অধিকারমুখী কোনো বাস্তব ফলাফল তাতে অর্জিত হবে না (সুশীল সমাজ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৫, পৃ. ২১৯-২২৪)।

২২। এটুকু আমাদের জানা আছে যে, 'নয়া-উদারবাদ'[৪]-এর 'মহা-ফাঁদ' পেতে রাখা বর্তমান যে বিশ্ব, সেখানে যিনি দুর্বল, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে যার অবস্থান—"আইন" ছাড়া আর তার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আমরা জানি যে আইনের প্রয়োগ-অর্ধপ্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সবচেয়ে নিষ্ঠুরভাবে ঘটানো হয় এই 'বহিঃস্থ' মানুষের ক্ষেত্রেই। রেন্টসিকার,

[৪] বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে হলে "নয়া-উদারবাদ" বা "নব্য-উদারবাদ" (Neo-liberism)—এর ওই মহা-ফাঁদ সম্পর্কে নির্মোহ ধারণা থাকা জরুরি। নয়া-উদারবাদের মর্মবস্তু সংক্ষেপে এ রকম: (১) নব্য-উদারবাদী মতবাদ (Neo-liberal doctrine) হলো অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের (যাঁদের অন্যতম এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো) অবাধ বাজার বা মুক্তবাজার মতবাদের (Laissez fare doctrine) আধুনিক সংস্করণমাত্র। তবে তা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী, অনেক বেশি আধিপত্যবাদী। (২) আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (financialzed capital) আধিপত্যের (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে)—১৯৫০ থেকে অদ্যাবধি—এ মতবাদ কোনো ধরনের দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া স্পষ্ট বলে যে, যদি তোমরা আধিপত্য বজায় রাখতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন হলো—"মুক্তবাজার-অবাধ বাজার-বাধাহীন বাজারব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো, যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না; সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও; রাষ্ট্রকে নৈশপ্রহরীর চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না।" (৩) নব্য-উদারবাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদের আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত মতাদর্শ, যা কোনো মানদণ্ডেই জনকল্যাণকর নয়—কোনো দেশেই, এবং যা দেশে দেশে "রেন্ট-সিকার" লুটেরা গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনির্মিত দর্শন। দেশজ রেন্টসিকিং-লুটতান্ত্রিক কতিপয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ জিইয়ে রাখার প্রয়াসেই বিনির্মিত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ। (৪) নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতাদর্শ বলে—"আজকের যুগের উন্নত-ধনী দেশসমূহ মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতি অবলম্বনে ধনী হয়েছে"—এ কথা নির্জলা মিথ্যা। আসলে এক কালের গরিব দেশসমূহ সংরক্ষণবাদী নীতিকৌশল প্রয়োগে ধনী হবার পরে "উপরে ওঠার মই লাথি মেরে সরিয়ে ফেলেছে" এবং গরিব দেশগুলোকে উপরে ওঠার মই ছাড়াই মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতিকৌশল অবলম্বনে বাধ্য করছে। (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৮: ১২১-১৫৩; বারকাত ২০২০: ৩৭৩-৩৮২; বারকাত ২০২১: ৯৩-১০৩)।

দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষপর্যন্ত ভূমির দখল রাখে, ন্যায্য হিস্যা হারায় বাকিরা। তারপরও আইনি দলিলে যা বলা আছে, যা করবার কথা বলা আছে কাগুজে দলিলে—তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, তা অন্তত মন্দের ভালো হতে পারে। ভূমি বিষয়ে সব আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি কাঠামোর মধ্যে এনে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নিশ্চিত করে, জনসম্পৃক্ত একটি বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মাঠপর্যায়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে অন্তত, যাত্রা শুরু করতে পারে 'শাসিত'-কে 'শাসক'-এর 'প্রায় সমান' করে তোলবার বন্ধুর রাস্তায়। অন্যথা দরিদ্র মানুষ, জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী, আদিবাসীসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ভূমি অধিকার, তথা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করবার দিকে এগোনোই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে না 'বাদপড়া' জনগোষ্ঠীকে শোভন উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবার দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়া।

এই বিবেচনাতেই, এই গবেষণায় আমরা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্সে এ দেশের কয়েকটি ভূমি-আইন—যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত, অধিকার-ভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক—বিশ্লেষণ করেছি, খুঁজে বের করেছি সেগুলোর বাস্তবায়নসমস্যা, বের করতে চেয়েছি উত্তরণের পথ-পন্থা। আমরা ভালো করেই জানি, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, শাসন ব্যবস্থায় আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলেও 'শাসক' কখনোই 'শাসিত'-এর সমান হয়ে উঠবেন না; বড়জোর তারা হয়ে উঠতে পারেন 'প্রায় সমান' (তবে কতটুকু গেলে বা কত দূর পৌঁছালে 'প্রায় সমান' বলা যাবে তা জানি না)।

২৩। এই গ্রন্থের ভাষা 'বাংলা'—এটা আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত। আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই আমাদের মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্যই এই ভাষা নির্বাচন। গবেষণাগ্রন্থের ভাষা ইংরেজি হলে বিদেশি মহলের বাহবা কুড়ানো সহজ হয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ওই 'বেচে' 'বেশ করে-কম্মে খাওয়া'ও যায়। কিন্তু এই বইয়ের বিষয় এতটাই কৃষক-জলাজীবীর-দরিদ্র-প্রান্তিকের, এতটাই এ দেশের ভূমি-উদ্ভূত, এতটাই একান্তই 'বাংলাদেশ'-এর যে, এর ভাষা 'বাংলা' হওয়ারই দাবি রাখে। এ আমাদের কোনোই ইংরেজি বিরাগ নয়—বরঞ্চ এটি আমাদের যুক্তিনির্ভর সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।[৫]

[৫] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট্ট করে বলেছেন, "মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা মাতৃদুগ্ধসম"। প্রকৃত অর্থে একজন মানুষ যে 'ভাষায়' ভাবনা-চিন্তা করেন, যে ভাষায় স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় দৈনন্দিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন ওই ভাষার সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রগতি, চিন্তাজগতের বিকাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ভাষাটি 'বাংলা'। সুতরাং শিক্ষার সব স্তরে বাংলা ভাষাকে জ্ঞানচর্চার মূল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষাকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্য কোনো ভাষা শিখব না। অবশ্যই শিখব এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে সব শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে দুটি বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে (দেখুন, বারকাত, আবুল ২০২০: ৩৪৪)।

বাংলায় লিখিত হলে, তা এ দেশের বেশি মানুষের বোধগম্য হবে, সহজবোধ্য হবে—এও আমাদের ধারণা। তবে, এ দেশ এক ভাষার দেশ নয়। আমাদের নানান আদিবাসী গোষ্ঠীর নানান ভাষা রয়েছে। নিজ নিজ ভাষায় তারা এই গ্রন্থ পড়তে পারলে, আমরাও খুশি হতাম। কিন্তু এ আমাদেরই অক্ষমতা যে তেমনটি পারিনি আমরা। তবে পরবর্তীতে—এই গ্রন্থের ফলাফল শুধু নয়, গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক গুরুত্বের বিবেচনাতেই—ইংরেজিসহ অন্য ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া জরুরি বলে মনে করি। সঠিক ('যোগ্যতা' অর্থে নয়; নৈতিকতা, রাজনৈতিক এবং যোগ্যতার নিরিখে সঠিক) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে আমরা আনন্দিত হব।

২৪। বাংলাদেশে ভূমি আইন বিষয়ে গবেষণা নিতান্ত কম। ভূমি আইনের অ্যাকাডেমিক, ব্যবহারিক গ্রন্থবাজারে সহজলভ্য—যেগুলো মূলত সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি ইত্যাদির ই হয়। গবেষণার বিষয় হিসেবে ভূমি আইন জটিল, এর বাস্তবায়ন সমস্যা জটিলতর—সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার ঘাটতি থাকবার এটি অন্যতম মুখ্য কারণ। কিন্তু এটা বলা বাহুল্য যে ভূমি আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে নিবিড় গবেষণানির্ভর প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয়তা সবসময়ই অনুভূত হচ্ছিল। এ ধরনের গবেষণা এ-সংক্রান্ত নীতি চিন্তা-আন্দোলন-সংগ্রামকে যোগায় প্রেরণা, দেয় জ্ঞানভিত্তিক-নৈতিক শক্তি।

এই বাস্তবতার গুরুত্ব বিবেচনা করে চেতনায়নকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি'-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একটি গবেষণা পরিচালনা করে। মাঠজরিপভিত্তিক এই গবেষণার শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশের ভূমি আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, জলমহাল, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, এবং ভূমি ব্যবহারবিষয়ক আইন ও নীতিমালা (২০২০)"। এই গ্রন্থের গ্রন্থকারবৃন্দ ছিলেন ওই গবেষণার পুরোভাগে।

ওই গবেষণায় প্রাপ্ত জরিপভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—যা জ্ঞানভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনি অধিকসংখ্যক মানুষের হাতে পৌঁছাবে, এবং এ-সংক্রান্ত সংগ্রামের নৈতিক ভিত্তি গঠনে সহায়তা করবে। এই প্রেক্ষিতেই 'নিজেরা করি'র সহযোগিতায় প্রকাশনা সংস্থা 'মুক্তবুদ্ধি' এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। তার ফলশ্রুতিতেই এই গ্রন্থ।

২৫। এই গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা যেন অনুধাবন কিংবা পুনঃঅনুধ্যান করতে পারি যে আদর্শ অবস্থান থেকে আইনের অবস্থান অনেক দূরে, আবার সেই অবস্থান থেকেও

বাস্তবায়ন অবস্থার দূরত্ব অনেক—রেন্টসিকার পরিবেষ্টিত, দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ভূমির ওপর কৃষিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা (শুধু অভিগম্যতা বা access নয়) নিশ্চিত করা। অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া, সাধারণ মানুষের বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জীবনে কোনো ন্যূনতম ইতিবাচক পরিবর্তনেরও টেকসই সমাধান সম্ভব নয়। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। দরিদ্র-ভূমিহীন-বিত্তহীন-প্রান্তিক মানুষের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া কৃষি-ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন—বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌলিক সংস্কার।

২৬। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে, বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরো মাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি। আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব। বিষয়টি শ্রেণিস্বার্থীয়।

এই গ্রন্থের পাঠকমহলকে অশেষ শ্রদ্ধা ও আগাম কৃতজ্ঞতা।

আবুল বারকাত
প্রধান গবেষক ও গ্রন্থকার

ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

অধ্যায় ১

সূচনা

সারকথা: এ দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবন আবর্তিত হয় জমিকে ঘিরে—জনমানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার মূলেই আছে এই জমি। কিন্তু জমিতে যাদের ন্যায্য হিস্যা তারাই সবচেয়ে বেশি ভূমিহীন— কৃষিজীবী, জলাজীবী, বনজীবীরা প্রায় সবাই ভূমিহীন; এমনকি জমিতে তাদের অভিগম্যতাটুকুও কমছে দিন দিন। আইনের অভাব নেই, কিন্তু দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী, অর্থাৎ যারা ক্ষমতাহীন—আইন তাদের বেলায় কাজ করে না; করলেও লাভের চেয়ে ক্ষতিই ঘটায় বেশি। ভূমি আইনের ঘাটতি নিয়ে কিছু গবেষণা রয়েছে, কিন্তু এই সব আইন আর নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে গবেষণার ঘাটতি ছিল। এই প্রেক্ষিতেই, পরিচালিত হয়েছে একটি নিবিড় গবেষণা, এবং সেই গবেষণা-ফলাফলের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। এখানে বিশ্লেষণ করা করা হয়েছে বাংলাদেশের খাসজমি ও জলা, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল এবং ভূমি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন-অবস্থা, নিরূপণ করা হয়েছে সমস্যাগুলো। উত্থাপন করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা যেন দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ন্যায়সঙ্গত ভূমি অধিকার নিশ্চিত হয়।

তিন বছরব্যাপী গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে অধিকারভিত্তিক ভাবনা-কাঠামোয়—কৃষি-জলা-বনজীবী মানুষ, নারী, দরিদ্র, আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় উৎস হতে—সীমিত গবেষণা-বরাদ্দের মধ্যেই পরিচালনা করা হয়েছে দেশব্যাপী মাঠগবেষণা। কেন্দ্র, তথা রাজধানীতে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি সীমাবদ্ধ না রেখে, দেশের নানান প্রান্তের স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে দেয়া হয়েছে গুরুত্ব।

ভূমির পাঁচটি বিষয়কে আমরা এই গবেষণার আওতায় রেখেছি: ১) কৃষি খাসজমি; ২) অকৃষি খাসজমি; ৩) জলমহাল; ৪) অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল; এবং ৫) ভূমি ব্যবহার। এই পাঁচটি বিষয়কে বেছে নেবার পেছনে প্রধানতম কারণটি হলো এই বিষয়গুলোর সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর অধিকার এবং উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিটিতে, আলাদা আলাদা করে, উপরিল্লিখিত বিষয়সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিহ্নিত করা হয়েছে সমস্যা, দেয়া হয়েছে সমাধানের পথনির্দেশ। নিবিড় গবেষণা-উৎসারিত এই গ্রন্থ জ্ঞানজগতেই শুধু যুক্ত করবে না নতুন পালক, সহায়তা করবে এ-সংক্রান্ত সচেতনায়নপ্রক্রিয়ায়। একই সাথে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ভূমিঅধিকার নিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুসংহত সংগ্রামের জ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে।

প্রেক্ষিত[৬]

ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদনক্ষমতার অধিকারী এবং একইসাথে তা কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপযোগমূল্য অনেক, নেই অবচয়। ভূমির অধিকার আন্তপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য। বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়, জীবন ও জীবিকা ভূমি[৭] নির্ভর। ভূমির ওপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচকও ভূমি। ভূমির পরিমাণ সীমিত; জনসংখ্যা বাড়লেও, বাড়ছে না ভূমির পরিমাণ। বাড়ছে ভূমির মালিকানা নিয়ে প্রতিযোগিতা। ভূমিকেন্দ্রিক সহিংসতা, ফাটকা ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা।

ভূমিবিষয়ক সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই; এ সমস্যাগুলোর সমাধান, এ দেশের 'প্রকৃত উন্নয়ন'-এর পূর্বশর্ত। ভূমির ওপর জনগণের পূর্ণ-অধিকার (মালিকানা-অভিগম্যতা-ব্যবহার ও তার ন্যায্য শর্তাবলী) ছাড়া সাংবিধানিক এবং নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের জন্য একখণ্ড ভূমি অমূল্য সম্পদ। কৃষকের জীবন মানেই জমি এবং এ দেশে কৃষিই এখনো ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ খানার আয়ের উৎস। জলাজীবী, বনজীবী মানুষের কাছেও ভূমি-ই একমাত্র অবলম্বন। অথচ, আমাদের নানান আইন আর নীতি ভূমির ওপর স্বাভাবিক এবং ন্যায্য দাবিটি নিশ্চিত করতে পারেনি। আইনের ধারা, অনুচ্ছেদে রয়েছে সমস্যা; তার চেয়েও বড় সমস্যা আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে—যেখানে রয়েছে অগুনতি অসংগতি।

সমাজের শ্রেণিকাঠামোর গড়নটিই এমন যে, প্রান্তিক মানুষ সর্বত্রই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, নিপীড়িত; ভূমি-অধিকারের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ভূমিতে নারীর অধিকার সীমিত, উপেক্ষিত। আদিবাসীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ ভূমি-অধিকারবঞ্চিত।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট

---

৬ এই উপ-অধ্যায় রচনায় তিনটি গ্রন্থের ব্যাপক সহায়তা নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (১) বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা; (২) বারকাত, আবুল (২০১৬), *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা; এবং (৩) বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ–প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

৭ 'ভূমি' (land) বলতে আমরা বুঝি, জমি—কৃষি ও অকৃষি, জলা (water-bodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ 'ভূমি' শুধু কৃষিজমি নয়; 'ভূমি' মানে কৃষিজমি, অকৃষি জমি, জলা-জঙ্গল-বন।

যত আইন আছে তার ওপর নিবিড় এক গবেষণায়[৮] দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উভয়ই এখনো ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। সংশ্লিষ্ট আইনগুলো কোনো বিবেচনাতেই দরিদ্রবান্ধব নয়। প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো আদৌ যথাযথ নয়। অনেক আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনই নেই, কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে প্রতিফলিত নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করেনি।

সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হলো, বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনিকাঠামো প্রয়োজন তা অনুপস্থিত। কখনো কখনো এ ধরনের প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রণীত হলেও প্রতিকূল রাজনৈতিক কাঠামোর যাঁতাকলে সেসব বাস্তবায়িত হয়নি। প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো দরিদ্রবান্ধব নয় এবং তা জনকল্যাণমুখী নয়। প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা তৈরি করে তীব্র ভূমি বিরোধ ও জন্ম দেয় অসংখ্য ভূমি মামলার। ভূমি আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি প্রায়োগিক কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয় কখনোই। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে আইনি বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদপড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা বা মডেলে ভূমি অন্যতম প্রধান উপাদান। অথচ, আক্ষেপের বিষয় যে, আক্ষরিক অর্থের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর কেটে গেলেও, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীবান্ধব আইন প্রণয়ন হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ; ভূমিবিষয়ক আইনও এর ব্যতিক্রম নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কোনো আইনের মানবিক একটা আবরণ আছে বটে, কিন্তু তাতেও লুকিয়ে থাকে এমন সব সূক্ষ্ম বিষয় এবং কৌশল, যা শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় শুধু ক্ষমতাকাঠামোর উপর দিককার শ্রেণির পক্ষেই। প্রশাসনিক, সামাজিক, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক কাঠামোটিই এমন যে—এমনকি ‘তুলনামূলক’ ভালো আইনও দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর পক্ষে দাঁড়াতে পারে না।

---

৮ দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৯-২০১৩) পরিচালিত এই গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা-বনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও সংশ্লিষ্ট মেমো-সার্কুলার-বিধিমালার ‘অধিকারভিত্তিক’ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংবিধানের মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন প্রণয়নভিত্তিক ১৩ খণ্ডের দলিল। এই গবেষণার ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনন্যতা থেকে বলা যেতে পারে, সম্ভবত এটাই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের প্রথম গবেষণা দলিল। বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০): *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

গবেষণায় জানা গেছে, বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ একর জমি মামলাধীন এবং ভূমিসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ (Barkat & Roy, 2004)। জমি-জলার মালিকানাসংক্রান্ত বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা শুধু যে বেশি তা-ই নয়—এ প্রক্রিয়া বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে উভয়েরই নিঃস্বকরণে সহায়ক। এ প্রক্রিয়া সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে এবং সেই সাথে এ দেশে সামাজিক পুঁজি বিকাশে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুরো ব্যবস্থাটি অযোগ্য, অদক্ষ, অকার্যকর, অস্বচ্ছ, দ্বৈত-মালিকানা সৃষ্টিতে সহায়ক, জাল রেকর্ড প্রণয়নে সহায়ক, মামলা-মোকদ্দমার ভিত্তি সৃষ্টির সহায়ক, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনাবিরুদ্ধ, ভূমি-জলা দস্যুবৃত্তির সহায়ক, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক যত ধরনের দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব তার সক্রিয় সহযোগী। আর এসব কারণেই মাঝখান দিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে ভূমি-জলা সন্ত্রাসীরা। ভূমি-জলাসংক্রান্ত দুর্নীতি ডালপালা গজিয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে; সৃষ্টি হচ্ছে ভূমি-জলা প্রতারক দালাল গোষ্ঠী—এসবই ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অধিক হারে পুনরুৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। দশকের পর দশক ধরে ভূমিসংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে, ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারির ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল, খাসজমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা দেশের অধিকাংশ মানুষকে, বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চিত করে রেখেছে ভূমির অধিকার থেকে।

এসব আইন রেন্টসিকারদেরই নিয়ন্ত্রিত তাবেদার রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি, যেখানে আইনে যা-ই থাকুক না কেন আইন প্রয়োগের শেষ অভিঘাতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হবে 'প্রত্যেক যুগের নিয়ামক ধ্যান-ধারণাগুলো সবসময়ই ওই যুগের শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণামাত্র' (কার্ল মার্কস)। যেখানে আইনের শেষ উদ্দেশ্য হবে 'দরিদ্রকে পিষে মারা, আর ধনীরা আইনের ঊর্ধ্বে শাসন করবে' (আইরিশ কবি ও চিকিৎসক অলিভার গোল্ডস্মিথ, ১৭২৮-১৭৭৪); যেখানে কোর্ট-বিচারালয় বলবে 'হে তরুণ, এটা বিচারের কোর্ট, ন্যায় বিচারের নয়' (মার্কিন কবি ও ঔপন্যাসিক ওয়েন্ডেল হোলমস্, ১৮০৯-১৮৯৪)। আর শেষপর্যন্ত যেখানে দরিদ্র মানুষের জন্য আইনের পুরো ব্যবস্থাটাই হবে এমন 'যেখানে অর্থব্যয় ছাড়া কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়' (ব্রিটিশ রম্যকবি স্যামুয়েল বাটলার, ১৬০২-১৬৮০); যেখানে দরিদ্র মানুষ জিতলেও হারবেন, হারলেও হারবেন— 'আমি জীবনে দুইবার ধ্বংস হয়েছি, প্রথমবার যখন এক মামলায় জিতেছি, আর দ্বিতীয়বার যখন এক মামলায় হেরেছি' (ফরাসি দার্শনিক ভলটেয়ার, ১৬৯৪-১৭৭০) (বারকাত, ২০২০)।

উদ্দেশ্য

ভূমিসংক্রান্ত আইনের অগুনতি ব্যত্যয় এবং আইনের অধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতি পদে তীব্র সমস্যার প্রেক্ষিতে এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি'-র সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এ আমরা একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক নিবিড় গবেষণা পরিচালিত করি। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের খাসজমি ও জলা, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল এবং ভূমি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন-অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ন্যায়সঙ্গত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ উত্থাপন। এই গবেষণার ফলাফলকে কেন্দ্র করেই এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ এ গ্রন্থটি যেমন এ-সংক্রান্ত সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে; তেমনি ভূমি-অধিকার নিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুসংহত সংগ্রামের জ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্বিয় বিষয়াদি

পরিধি

প্রতিটি গবেষণার সুনির্দিষ্ট একটি পরিধি থাকে, সঙ্গত কারণেই তার আওতাকে রাখতে হয় সীমার মাঝে। আমরাও গবেষণা-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, গুরুত্ব বিবেচনায় গবেষণার জন্য ভূমির পাঁচটি বিষয়কে এই গবেষণার আওতায় রেখেছি: ১) কৃষি খাসজমি; ২) অকৃষি খাসজমি; ৩) জলমহাল; ৪) অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল; এবং ৫) ভূমি ব্যবহার। এই পাঁচটি বিষয়কে বেছে নেবার পেছনে প্রধানতম কারণটি হলো এই বিষয়গুলোর সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর অধিকার এবং উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। এ দেশে কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ও জলা কৃষিজীবী দরিদ্র এবং ভূমিহীন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের নেতিবাচক প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্ষমতাহীন মানুষ। ভূমির ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা এই শ্রেণির প্রকৃত উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদে তো বটেই, দীর্ঘ মেয়াদে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই গবেষণার আওতায় তিন বছর ধরে (২০১৮-২০২০) বিষয়সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত পাঁচটি আইনি দলিলের বাস্তবায়ন অবস্থার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১) কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭;
২) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫;
৩) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯;
৪) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭; এবং
৫) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১।

একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিষয়সংশ্লিষ্ট এই আইনি দলিলগুলোর নাম-ই গবেষণা শুরুর আগেই এই বিষয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলার (আমাদের দৃঢ় সন্দেহ, এই অবহেলা ইচ্ছেকৃত এবং মন্দ উদ্দেশ্যে) কারণ পরিষ্কার করে দেয়। ভূমিসংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ ৫টি বিষয়—যার সাথে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে জড়িত—এর মধ্যে ৪টি বিষয়েই কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন নেই, নীতিগুলোও বেশ পুরোনো। শুধু অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিষয়ে রয়েছে একটি আইন, যার কোনো বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। এ দেশে অগুনিত আইন, অথচ এই বিষয়ে আইন এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই দেখিয়ে দেয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে (যে দৃষ্টিতে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বই যেন ধরা পরে না), যা শুধু হতাশা ও ক্ষোভেরই জন্ম দেয়।

গবেষণায় অনুসৃত তাত্ত্বিক কাঠামো

ভূমি এবং আইন এই দুইয়েই রয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। যদি 'ভূমি আইন বাস্তবায়ন'-কে একটি একক প্রপঞ্চও ধরে নিই, তাহলেও এটির রাজনীতিকে, এর অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করা যাবে না। এখানেই আসে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটি পরিষ্কার করে বলা ভালো যে 'ভূমি আইনের রাজনীতি'র সাথে ' ভূমি আইনের অর্থনীতি'-কে যুক্ত করলে তা কোনো অর্থেই 'ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' হয়ে ওঠে না। আবার, অর্থনীতি বলতেই যেন আমরা 'চাহিদা', 'যোগান' এবং 'মুদ্রা'—এর অতি সরলীকরণে পড়ে না যাই। বড়জোর, সরলীকরণের চেষ্টা করলে আমরা একে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়াদির সাথে মেলাতে পারি—যার ব্যাপ্তিও, বিস্তৃত-বহুমাত্রিক। এ কথা মনে রাখা চাই যে, বৃহৎ পরিসরে, বড়-পর্দায় দেখা ব্যতীত গভীরে-অতি গভীরে প্রোথিত কোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ কখনোই উন্মোচিত হয় না। আবারও রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মেলালেই তা রাজনৈতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে না; বরঞ্চ এটি অতি শক্তিশালী এক বিশ্লেষণ কৌশল, যা বহিরঙ্গের মধ্যে থেকেও বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় নেমেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী এক হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে শোষিতের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তটুকু শাসক যে প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনা করে এবং সর্বোপরি আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেই পথ-পদ্ধতিটিই আমাদের দেখিয়ে দেয় যা ব্যবহার করে শাসক কায়েম রাখে শাসনব্যবস্থা। 'আইন' এখানে হাতিয়ার, যা শাসক শ্রেণির পক্ষে একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে আত্মসাৎপ্রক্রিয়াকে সচল রাখে। অর্থাৎ, আইন এবং তার বাস্তবায়ন এমন এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যা শাসিত শ্রেণির ভূমিনির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু শাসকের আত্মসাৎ উপযোগী করে তোলে। ভূমি, ভূমি-আইন এবং ভূমি আইনের বাস্তবায়ন কীভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সাথে জড়িত এবং তার জীবনের গতি-প্রকৃতিকে গভীরভাবে-প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার

বিশ্লেষণ একমাত্রিক নয়—বহুমাত্রিক। এই বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যাটির গভীরে (root cause) যেতে হলে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার (tool)। এ সমস্ত বিবেচনায় আমরা এই গবেষণায় ভূমি আইনর বাস্তবায়ন সমস্যা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছি রাজনীতিক-অর্থনীতির লেন্স।

পর্যালোচিত বিষয়াদি

আমরা অনুসন্ধান করেছি ভূমি আইন/নীতির বাস্তবায়ন সমস্যা। নিবিড়ভাবে অনসুন্ধান করেছি—বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো কী কী, কিভাবে তৈরি হয়েছে এই বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো (প্রক্রিয়া, দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান), সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী (বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী) এতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং আইনের ব্যত্যয়গুলো ঘটছে কোন মাত্রায়।

আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার কার্যকারণ-স্বরূপ-বহুমাত্রিকতা অনুধাবনে এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রয়োজনে আমরা অনুসন্ধান করেছি আইনের অন্তর্নিহিত সমস্যা এবং খুঁজে দেখেছি প্রয়োগোপযোগী ব্যবস্থাপনা ঘাটতি। আইন/নীতিমালাগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে আইনি দলিলগুলো মানবাধিকার নিশ্চিত করে কি না, সময়োপযোগী কি না, সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, অন্য আইন/নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কি না, নারী-দরিদ্র-প্রান্তিক-আদিবাসীর অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম কি না। আইন/নীতির প্রয়োগোপযোগী ভূমি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি অনুসন্ধানে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি কাঠামো/পরিকাঠামো, নীতিনির্দেশনা, অবকাঠামো-মানবসম্পদ-অর্থের যোগান, সমন্বয়, উপযোগী পরিবেশ ও আচরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

যে দু'টি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো: (১) অধিকারভিত্তিক ভাবনা; এবং (২) কৃষি-জলা-বনজীবী মানুষ, নারী, দরিদ্র, আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'চোখ দিয়ে দেখা' (অন্তত, দেখবার চেষ্টা করেছি)।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যাদি ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা এই সংক্রান্ত সবকটি আইনি দলিল তো বটেই, সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা ও নানান মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ-সংবাদ বিশ্লেষণ, নিবিড় অধ্যয়ন-পুনঃঅধ্যয়ন করেছি। এই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষণা-পরিধিভুক্ত ৫টি নীতি ও আইন ছাড়াও, এ সংক্রান্ত আরো অনেক আইন, বিধিমালা, নীতি, বিধান, অধ্যাদেশ, পরিপত্র, এবং আদেশ আমরা পর্যালোচনা করেছি।

সীমিত গবেষণা-বরাদ্দের মধ্যেই পরিচালনা করেছি দেশব্যাপী এক মাঠগবেষণা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করেছি প্রচুর তথ্য। কেন্দ্র, তথা রাজধানীতে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি সীমাবদ্ধ না রেখে, দেশের নানান প্রান্তের স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের নানান প্রান্তের ৮টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, খুলনা, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, এবং রাঙ্গামাটি) মাঠ-পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে:

- ৬টি আলোচনা সভা (মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী);
- ৯টি দলগত আলোচনা: ৬টি বাঙালিদের সাথে, ৩টি আদিবাসীদের সাথে (মোট ৭৮ জন অংশগ্রহণকারী: কৃষি-জলা-বনজীবী মানুষ, নারী, দরিদ্র, আদিবাসী, ভূমিহীন, চরের মানুষ, হাওরবাসী, নদীভাঙা মানুষ, অধিগ্রহণকৃত জমিতে যারা বাস করতেন);
- ভূমি অধিকার কর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবীদের সাথে ১৮টি সাক্ষাৎকার;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে ৮টি সাক্ষাৎকার;
- সরকারের মাঠপর্যায়ের ভূমিসংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ৮টি সাক্ষাৎকার; এবং
- ১১টি কেস স্টাডি।

প্রায় ১৫ জন আইনপ্রণেতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, এবং বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুখোমুখি আলোচনা, সভা ও সাক্ষাৎকারসমূহ পরিচালিত করা হয়। মাত্র ৪টি সাক্ষাৎকার টেলিফোনে নেওয়া। তবে, এই গ্রন্থ রচনার সময় তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিতে একই উত্তরদাতা/ অংশগ্রহণকারীর সাথে একাধিকবারও টেলিফোনে আলোচনা করতে হয়।

তথ্যদাতা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম-পরিচয় প্রকাশ না করা গবেষণার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মৌলিক একটি নীতি। আমরাও এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকল্পে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং আলোচনা শুরুর পূর্বেই এই অঙ্গীকার করেছি যে গবেষণার কোনো পর্যায়েই তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।

আইসিসিও কো-অপারেশন, দৈনিক বণিক বার্তা ও 'নিজেরা করি'র আয়োজনে ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এক উন্মুক্ত ওয়েবিনারে এই গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনসহ সারাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ এবং দেশের বাইরে থেকেও অনেকে এই ওয়েবিনারে যুক্ত হন। সবার মূল্যবান মতামত-পরামর্শ এই গবেষণাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

স্কোরিং

সাদাচোখে "আইন" গুণগত (Qualitative) বিষয়। পরিমানগত (Quantitative) বিষয় হিসেবে আইনকে দেখা হয় না, তেমন কোনো চর্চা নিতান্ত দুর্লভ। এমনটি হবার প্রধান কারণ ছয়টি:

১. বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে জটিল। এক্ষেত্রে পবেষণাপদ্ধতি কী হবে সেটি নির্ধারণ করা যেমন দুরূহ, তেমনি কোন নির্দেশকের ভিত্তিতে কোন পদ্ধতিতে "এখন পর্যন্ত গুণগত" একটি বিষয়কে পরিমাণগত করে তোলা হবে–তা ঠিক করা দুরূহতর।

২. যেহেতু এহেন চর্চা নেই বললেই চলে, তাই গবেষকেরা পর্যাপ্ত পূর্বজ্ঞান/রেফারেন্সের অভাব বোধ করেন– এ কাজে এগুতে চান না। প্রথাগত শিক্ষাঙ্গনকেন্দ্রিক গবেষণা এখনও পদ্ধতিগতভাবেই অনেকাংশেই "রেফারেন্স" কেন্দ্রিক, তাই গবেষকেরা মৌলিক চিন্তা নির্ভর এই পথে হাঁটতে চান না।

৩. যারা আইন বিষয়ে কাজ করেন, তারা সংখ্যা/পরিমানগত চর্চাতে সাধারণতঃ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। অন্যদিকে, যে গবেষক পরিমাপগত চর্চায় দক্ষ তারা আইন নিয়ে কাজ করতে চান না।

৪. এটা অনস্বীকার্য যে নয়া-উদারবাদতাড়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, গবেষণা কতটুকু মৌলিক হলো তার চেয়ে বেশি করে ভাবা হয়–তা কোন জার্নালে প্রকাশ পাবে, কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত হবে, পদোন্নতি/পদ-পদবী পেতে কতটুকু সহায়ক হবে। আইনের গুণগত দিক পরিমানগতভাবে প্রকাশ করার মত অপ্রচলিত বিষয় নিয়ে চর্চায় "প্রথাগত স্বার্থ" কতটুকু হাসিল হবে–সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে। ফলতঃ এ বিষয়ে তেমন কোনো কাজই হয়ে ওঠে না।

৫. আইনের পরিমানগত প্রকাশ সাধারণের বোধগম্যতা, সহজবোধ্যতা বাড়াতে পারে। এর ফলে আইনের বাস্তবায়ন বিষয়ক চর্চায়/সংগ্রামে (Praxis অর্থে) জনমানুষকে সম্পৃক্ত করা সুবিধাজনক হয়। জনমানুষ-সম্পৃক্ত জ্ঞানচর্চা কিংবা জ্ঞান-ভিত্তিক সংগ্রাম অনেক সময়ই সারস্বত (Academic অর্থে) সমাজে ব্রাত্য বলে বিবেচিত; তাই, এ চর্চা খুব একটা এগোয়নি।

৬. পণ্ডিতমহলের একটি বড় অংশই চান জ্ঞান থাকুক কুক্ষিগত, কিংবা কামরাভুক্ত (compartmentalized)। তেমনি আইনশাস্ত্রের পণ্ডিতেরাও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চান তাদের বাইরে অন্য কেউ এ নিয়ে বেশি না জানুক, বেশি না বুঝে ফেলুক। তাদের সচেতন প্রয়াস, অন্য উদ্যোগের প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

> "উপেক্ষা", "স্বেচ্ছায় ভুল" সমালোচনা—অন্য ধারার গবেষক/ সামাজিকবিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে কাজ করবার পথকে বন্ধুর করে তোলে।

এ সবের মাঝেই এই গ্রন্থে আইনের গুণগত দিকগুলোর পরিমান নিরূপণের–জটিল, অপ্রথাগত, "সমালোচনা"য় বিদগ্ধ হবার অধিক সম্ভাবনাযুক্ত–চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সরল: যেন বেশি সংখ্যক মানুষ সহজে বুঝতে পারেন, জ্ঞান-ভিত্তিক ভূমি-অধিকার ভিত্তিক সংগ্রামে সহায়ক হয়, এবং জ্ঞান চর্চার ধারায় ভূমিকা রাখে। পরিমাপগত প্রকাশের, তথা অংক/সংখ্যা দিয়ে বলবার, সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হলো যে আইনের মাঝে তুলনায় তা কার্যকরী এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়। যারা নীতিনির্ধারণ করেন, তারা যদি প্রকৃত অর্থেই জনমানুষের "প্রকৃত" উন্নয়ন চান এবং " শোভন সমাজ" বিনির্মাণ করতে চান, তাদের জন্য "সংখ্যায় প্রকাশিত আইনের গুণগতমান" হতে পারে অত্যন্ত কার্যকরী এক হাতিয়ার (instrument)– যার সাহায্যে তারা অগ্রাধিকার ঠিক করে (prioritization) আইন এবং তার বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণে অবগত (informed) এবং সক্রিয় (proactive অর্থে) ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। তাই, এ গ্রন্থে আইনের গুণগত বিষয়কে পরিমানগত করে উপস্থাপনে যে স্কোরিং পদ্ধতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা হয়েছে তা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়– এর জ্ঞান ও প্রায়োগিক গুরুত্বও অনেক।

এই গ্রন্থে নমুনা আইন পাঁচটির আইনি অবস্থার পাশাপাশি বাস্তবায়ন অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে, যেন এক নজরে আইন এবং তার বাস্তবায়ন সমস্যার বর্তমান অবস্থার একটি সুস্পষ্ট স্বরূপ পরিস্ফুটিত হয়।

স্কোরিং করবার পূর্বে নির্দেশক (indicator) নির্দিষ্টকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। নির্দেশক নির্বাচন (indicator selection) সঠিক (বিষয়ের নানান দিক এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক নিখুঁততত্ত্ব বিবেচনায়) না হলে স্কোরিং ভুল হবে–উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণ করবে না। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অর্থনীতির লেন্সে আমরা নির্দেশক নির্বাচন করেছি। এই নির্বাচনে আইন, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি এবং যাবতীয় তত্ত্ব আমরা বিবেচনা করেছি। সমান গুরুত্বে নির্দেশকের খসড়া দীর্ঘ তালিকা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি দেশের নানান প্রান্তের বিশেষজ্ঞজন (কমপক্ষে ১১ জন) এবং ভূমি-সংক্রান্ত ভুক্তভোগীদের সাথে (কমপক্ষে ৫টি একক এবং দলীয় আলোচনা)। অনানুষ্ঠানিক-দীর্ঘ ওইসব আলোচনার মাধ্যমে খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করা হয়–অন্তত: চারবার পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে।

আইনি অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে চারটি নির্দেশক ব্যবহার করে। নির্দেশকগুলো হলো–

১. সাংঘর্ষিকতা;

২. অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা;

৩. প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য; এবং

৪. সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব।

"সাংঘর্ষিকতা" নির্দেশকের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে স্কোরিং করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

১. আইন/নীতি বা তার কোনো অংশ যদি দেশের সংবিধানের কোনো মূলনীতির কিংবা অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে বিবেচ্য আইন/নীতির পুরোটাকেই কিংবা কোনো নির্দিষ্ট অংশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে;

২. আইন/নীতি বা তার কোনো অংশ যদি বিবেচ্য আইন/নীতির কোনো অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়;

৩. আইন/নীতি বা তার কোনো অংশ যদি অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট আইন/নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়; এবং

৪. আইন/নীতি বা তার কোনো অংশ যদি কোনো প্রশাসনিক নির্দেশ কিংবা আইন বাস্তবায়নের প্রথাগত পথ-পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

"অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা" নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়াদি ছিলো:

১. আইন/নীতি কিংবা তার কোনো অংশের উদ্দেশ্য/অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে যদি কোনো সন্দেহ (doubtfulness) এবং/অথবা অনিশ্চয়তা (uncertainty) থাকে;

২. আইন/নীতির কোনো শব্দ/শব্দগুলোর যদি সংশ্লিষ্ট নয় (unclear), সুনির্দিষ্ট নয় এমন (indefinite) অর্থ বোঝায়; এবং

৩. আইন/নীতির কোনো শব্দ/শব্দগুচ্ছ বা অংশের ব্যাখ্যা যদি একাধিকভাবে করবার সুযোগ থাকে।

"প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য" নিরূপণে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে–

১. প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে কোনো বিশেষ ব্যবস্থার কথা যদি আইন/নীতিতে উল্লেখ না থাকে;

২. প্রান্তিক মানুষের আইনি অধিকারগুলো নিশ্চিতে যে প্রশাসনিক-বাস্তবায়ন কাঠামোর প্রয়োজন তার যদি উপযুক্ত কোনো আইনি ভিত্তি না থাকে; এবং

৩. প্রান্তিক মানুষের আইনি অধিকার নিশ্চিতে সংবিধানের মূলনীতি/কোনো অনুচ্ছেদ কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন/নীতির সাথে বিবেচ্য আইন/নীতি বা তার কোনো অংশ সাযুজ্যপূর্ণ না হয়।

"সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব" নির্দেশকের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে স্কোরিং করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

১. আইন/নীতিতে ব্যবহৃত শব্দ/শব্দগুচ্ছের যদি সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা না থাকে এবং অথবা কোনো অনুচ্ছেদ যদি যথেষ্ট মাত্রায় সুনির্দিষ্ট না করা হয়; এবং

২. আইন/নীতিতে ব্যবহৃত শব্দ/শব্দগুচ্ছের সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যার অভাবে এবং/অথবা কোনো অনুচ্ছেদ যথেষ্ট মাত্রায় সুনির্দিষ্ট না থাকার কারণে যদি ভুমিহীন-প্রান্তিক মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

এতো গেলো আইনি সমস্যার নিরূপণে যেসব নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে– সেগুলোর কথা। একইরকমভাবে আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করবার জন্য আটটি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দেশকগুলো হলো–

১. জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি;

২. দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা;

৩. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন;

৪. রেন্টসিকারগোষ্ঠীর আগ্রাসন;

৫. সেবামুখী/দায়িত্ব এড়ানো যার এমন পরিবেশ/দপ্তর;

৬. স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব;

৭. জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি; এবং

৮. সমন্বয়হীনতা।

"জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধতা ঘাটতি" নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়াদি হলো–

১. নীতিনির্ধারক/আইন প্রণেতাদের সৎ উদ্যোগের অভাবে যদি আইন/নীতির প্রণয়ন/সংশোধন এবং/অথবা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হয় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়; এবং

২. সরকারের নির্বাহী/প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের অভাবে যদি আইন/নীতির বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হয় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়।

"দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা" নিরূপণে যা যা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তা হলো–

১. দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর আইনি অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কাঠামোর অভাব/ঘাটতি; এবং

২. দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর আইনি অধিকার বাস্তবায়নে নিয়োজিত কাঠামো যখন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করে না, কিংবা বাস্তবায়নকে বাধা দেয়।

"রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন" এর স্কোরিং করতে গিয়ে বিবেচ্য বিষয়গুলো ছিলো–

১. যখন রাজনৈতিক দল/সংগঠন এর ইশতেহার/প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার জনমানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে প্রতিভাত করে না;

২. যখন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কার্যক্রমে জনমানুষের ভূমি-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত থাকে এবং/অথবা এ সংক্রান্ত জনকল্যাণমুখী কোনো উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে সচেষ্ট হয়;

৩. রাজনৈতিক দলগুলোয় যখন ভূমিহীন/প্রান্তিক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না এবং/অথবা অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত/বাধাগ্রস্ত করা হয়; এবং

৪. রাজনৈতিক শক্তি/রাজনীতিবিদরাই যখন ভূমি-গ্রাস, ভূমি থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেন এবং/অথবা এমন কর্মকাণ্ডে "সচেতনভাবেই" নিষ্ক্রিয়/অর্ধ-সক্রিয়/ছদ্ম-সক্রিয় থাকেন।

"রেন্ট সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন" এর স্কোরিং করতে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো–

১. ভূমি-কেন্দ্রিক সম্পদ সৃষ্টির বদলে যদি হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎ সমাজের সাধারণ/চিরাচরিত চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়;

২. রেন্ট সিকার গোষ্ঠী যদি রাষ্ট্র ও সরকারের ভিত্তিকাঠামো এবং উপরিকাঠামো নির্মাণের অন্যতম নিয়ামক হয়ে ওঠে; এবং

৩. রেন্ট সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন/চালবাজি/ফটকাবাজি যখন শোভন সমাজ গড়বার পথে জনসমাজ-কেন্দ্রিক ভূমি-অধিকার বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

"সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর" এর অবস্থা নিরূপণ স্কোরিং এর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি ছিলো–

১. ভূমি-অধিকার বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর কাঠামোই যদি এমন হয় যেখানে ভূমিহীন/প্রান্তিক মানুষের চাহিদা-অনুযায়ী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকে;

২. ভূমি-অধিকার বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলো যদি ক্ষমতাকাঠামোর "ওপরতলার"র ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং রেন্ট-সিকারদের সেবা প্রদানেই ব্যস্ত থাকে—নানান দুর্নীতি এবং অনৈতিকতাকে সঙ্গী করে; এবং

৩. কাঠামোগুলোই যদি এমন হয় যে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তি/দীর্ঘসূত্রিতা/পরোক্ষ ব্যয় হয়ে ওঠে নৈমিত্তিক ঘটনা।

"স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব"-এর স্কোরিং-এ যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো–

১. প্রাতিষ্ঠানিক/নির্বাহী ব্যবস্থাটিই এমন যে সেখানে জনমানুষের, বিশেষ করে ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের, কাছে সঠিক তথ্য-উপযুক্ত উপায়ে পৌঁছানো/উন্মুক্ত রাখবার ব্যবস্থা অনুপস্থিত কিংবা অকার্যকর কিংবা কম কার্যকর কিংবা ইচ্ছেকৃতভাবেই অকার্যকর করে রাখা; এবং

২. ভূমি-অধিকার বিষয়ক সেবাগুলোর ক্ষেত্রে যেকোনো অসঙ্গতি/অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে সদুত্তর/ব্যবস্থা প্রয়োজন তা নিতে যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো অপারগ হন কিংবা শুধুমাত্র "বিশেষ" শ্রেণির মানুষকেই গুরুত্ব দেন কিংবা বেশিরভাগ সময়ই ব্যর্থ হন কিংবা ইচ্ছেকৃতভাবেই এড়িয়ে যান।

"জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি"-এর অবস্থা নিরূপণে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো–

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর জনবল এবং/অথবা লজিস্টিকস এবং/অথবা বাজেট ঘাটতির কারণে যদি ভূমি অধিকার নিশ্চিতে (বিশেষতঃ ভূমিহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর) পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হয়;

২. সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর জনবল এবং/অথবা লজিস্টিকস এবং/অথবা বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত থাকলেও বিভাগওয়ারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভুল/অসঙ্গতি কিংবা ইচ্ছাকৃত অসংগতির কারণে যদি সমস্যা ঘটে; এবং

৩. যতটুকুই জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট বরাদ্দ আছে, যদি দেখা যায় যে তার পুরোটাই বা সিংহভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষমতাবান শ্রেণি বা রেন্টসিকারদের স্বার্থ (ন্যায্য এবং অন্যায্য) রক্ষায়।

"সমন্বয়হীনতা"-এর স্কোরিং নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়াবলি হলো–

১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যদি সমন্বয়হীনতা থাকে;

২. আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীনতা থাকলে; এবং

৩. সমন্বয়হীনতা যদি ভুমিহীন-প্রান্তিক মানুষের ভূমি-অধিকারহীনতার কারন হয়ে দাঁড়ায়।

এইসব বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে বিবেচ্য পাঁচটি আইনের দুধরনের স্কোরিং করা হয়েছে:

১. আইনি অবস্থার স্কোরিং

২. আইন বাস্তবায়ন অবস্থার স্কোরিং

এই দুই ক্ষেত্রেই প্রতিটি নির্দেশককে (আইনি অবস্থার ক্ষেত্রে চারটি নির্দেশক এবং আইন বাস্তবায়ন অবস্থার ক্ষেত্রে আটটি নির্দেশক) '০' (শূন্য) থেকে '৫'-এর স্কেলে আলাদা আলাদা করে স্কোরিং করা হয়েছে, যেখানে–

'০' অর্থ মন্দতম দশা
'১' অর্থ বেশ মন্দ দশা
'২' অর্থ মন্দ দশা
'৩' অর্থ মোটামুটি ভালো দশা
'৪' অর্থ বেশ ভালো দশা
'৫' অর্থ সবচেয়ে ভালো/আদর্শ দশা

প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে স্কোরিং করে পরপর বিবেচ্য আইনের ক্ষেত্রে "গড়" স্কোর বের করতে নির্দেশকগুলোর স্কোরের মধ্যে সাধারণ গড় (arithmetic mean) করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজন-ভুক্তভোগীদের সঙ্গে দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় আমরা তাঁদেরকে সব নির্দেশকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা (বিবেচ্য বিষয়াবলীসহ) এবং স্কোরিং পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণী প্রদান সাপেক্ষে '০' থেকে '৫' এর মধ্যে প্রতিটি নির্দেশকের বিপরীতে স্কোরিং করতে অনুরোধ করেছিলাম। পুরো গবেষণা প্রক্রিয়ায় যে ২৭৩ জনের সাথে আমরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছি, তাদের মধ্য থেকে ১০৯ জনকে (যারা আগ্রহী ছিলেন, পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন এবং এবং নানান মাত্রায় বিষয়-পারঙ্গম) আমরা আলাদা করে স্কোরিং করতে অনুরোধ করি; কোনো ক্ষেত্রেই একজনের স্কোরিং অন্যজনের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। এই স্কোরিং-প্রক্রিয়ায় সবাই যে সব নির্দেশকের সাপেক্ষেই বিবেচ্য পাঁচটি আইনের প্রতিটির ক্ষেত্রেই স্কোরিং করেছেন এমন নয়–যিনি যে বিষয়ে ভালো জানেন এবং স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট আইন এবং/অথবা নির্দিষ্ট নির্দেশকের বিপরীতেই স্কোরিং করেছেন। এই স্কোরিং করবার সময় কখনও হোয়াইট বোর্ড, কখনও ব্ল্যাক বোর্ড, কখনও কাগজ-কলম, কখনও নোটখাতা-পেনসিল, কখনও

ফ্লিপ চার্ট, কখনও ডিজিটাল বোর্ড, এমনকী কখনও কাগজের ঠোঙার পেছনেও হিসেব-পত্তর করা হয়েছিল—যারা স্কোরিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা আমাদের ঋদ্ধ করেছে, জ্ঞানচর্চায় যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা-আঙ্গিক।

প্রক্রিয়ার শেষে আমরা যখন প্রতিটি নির্দেশকের জন্য প্রতি জনের দেয়া স্কোর জেনেছি ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে), তখন মোট স্কোরকে (যারা যারা যে নির্দেশকের বিপরীতে স্কোরিং করেছেন, সেই স্কোরসমূহের যোগ) ভাগ করা হয়েছে ওই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যতজন স্কোরিং করেছেন সেই সংখ্যা দিয়ে। এক এক আইনের এক এক নির্দেশকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ভিন্ন। উল্লেখ্য, কোনো আইনের কোনো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই এই সংখ্যা ৩০ (ত্রিশ) এর কম নয়—অর্থাৎ, প্রতিটি আইনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এখানে ৩০ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, পরিসংখ্যান বিজ্ঞান অনুযায়ী ৩০ এমন একটি সংখ্যা যা একটি প্রত্যয়যোগ্য ফলাফল (credible estimates) দিতে সক্ষম। এরপর, সবশেষে—সবগুলো নির্দেশকের গড় স্কোরকে নির্দেশকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে কোনো নির্দিষ্ট আইনের অবস্থার (দুটি অবস্থা: আইনি সমস্যা এবং আইন বাস্তবায়ন সমস্যা) স্কোর বের করা হয়েছে। প্রতিটি আইনের ক্ষেত্রে আইনি অবস্থার স্কোরিং, আইন বাস্তবায়নের স্কোরিং এবং এই দুই স্কোর এর মধ্যে তুলনা লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

একটি উদাহরণ পুরো স্কোরিং প্রক্রিয়াটিকে সহজবোধ্য করতে সহায়তা করবে। ধরা যাক, "ঋ-আইন, ২০২১" ভূমি সংক্রান্ত একটি আইন। আমরা এর দুধরনের স্কোরিং করতে চাই—

১. আইনি অবস্থার স্কোরিং
২. আইন বাস্তবায়ন অবস্থার স্কোরিং।

উভয় ক্ষেত্রেই '০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে, যেখান '০' অর্থ 'মন্দতম দশা' এবং '৫' অর্থ 'সবচেয়ে ভালো/আদর্শ অবস্থা'।

প্রথমে আসা যাক "আইনি সমস্যার স্কোরিং"-এর ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি যে এ ক্ষেত্রে আমরা চারটি নির্দেশক ব্যবহার করেছি: (১) সাংঘর্ষিকতা; (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা; (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য; এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব।

ধরা যাক আইনি অবস্থার স্কোরিং এর ক্ষেত্রে মোট চার জন 'ক', 'খ', 'গ', এবং 'ঘ' অংশগ্রহণ করলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় নির্দেশকের ক্ষেত্রে চারজনই স্কোর বসালেন। তৃতীয় নির্দেশকের ক্ষেত্রে 'ক', 'গ', ও 'ঘ' স্কোর করলেন। চতুর্থ নির্দেশকের বিষয়ে শুধুমাত্র 'খ' ভালোমত জানতেন বলে একমাত্র তিনিই স্কোরিং করলেন। তাহলে "ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি সমস্যার স্কোরিং এর পেছনের সারণিটি নিম্নরূপ (সারণি ১)—

সারণি ১: "ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি সমস্যার নমুনা স্কোরিং

নির্দেশক	অংশগ্রহণকারীদের দেয়া স্কোর				নির্দেশকের গড় স্কোর
	ক	খ	গ	ঘ	
১। সাংঘর্ষিকতা	৩	৩	২	৩	(৩+৩+২+৩) ÷ ৪ = ২.৭
২। অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা	২	১	২	১	(২+১+২+১) ÷৪ = ১.৫
৩। প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য	২	স্কোর করেননি	১	০	(২+১+০) ÷৩ = ১.০
৪। সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব	স্কোর করেননি	২	স্কোর করেননি	স্কোর করেননি	২ ÷১ = ২.০

অতএব,

"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি অবস্থার গড় স্কোর

= নির্দেশকের গড় স্কোরসমূহের যোগফল ÷ নির্দেশকের সংখ্যা

= (২.৭ + ১.৫ + ১.০ + ২.০) ÷৪

= ১.৮

"ঋ-আইন, ২০২১-এর আইনি অবস্থার স্কোরিং" লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলে, নিচের চেহারা দাঁড়ায় (লেখচিত্র ২), যেখানে মাঝের সীমাবদ্ধ অংশটি দেখায় অর্জন, সাদা অংশটুকু ঘাটতি।

লেখচিত্র ২: স্কোরিং– "ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি অবস্থা
('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

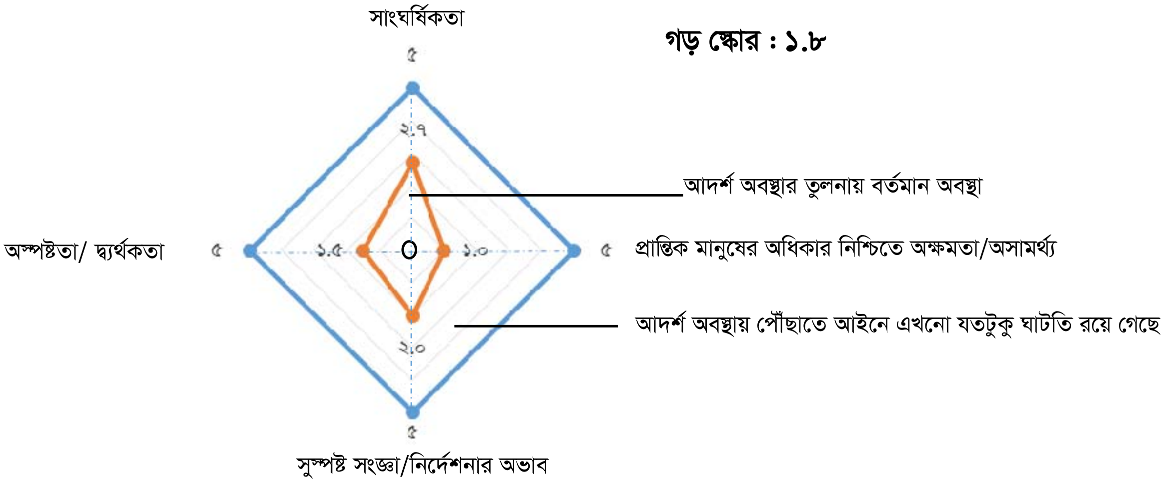

এবার আসি "আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং"-এর দিকে। স্মর্তব্য, এ ক্ষেত্রে আমরা আটটি নির্দেশক ব্যবহার করেছি: (১) জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধাতার ঘাটতি; (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা; (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন; (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন: (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর; (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব; (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি; এবং (৮) সমন্বয়হীনতা।

আবারও ধরি যে আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন চারজন– 'ক', 'খ', 'গ', এবং 'ঘ'। কেউ কেউ কোনো কোনো নির্দেশকের ক্ষেত্রে স্কোরিং করেছেন, কেউ কেউ করেননি। এ সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর সারণিটি (সারণি ২) নিম্নরূপ–

সারণি ২: "ঋ-আইন, ২০২১" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যার নমুনা স্কোরিং

নির্দেশক	অংশগ্রহণকারীদের দেয়া স্কোর				নির্দেশকের গড় স্কোর
	ক	খ	গ	ঘ	
১। জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধাতার ঘাটতি	২	১	১	০	(২+১+১+০) ÷ ৪ = ১.০
২। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা	২	২	স্কোর করেননি	স্কোর করেননি	(২+২) ÷ ২ = ২.০
৩। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন	১	০	০	০	(১+০+০+০) ÷ ৪ = ১.০
৪। রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন	১	০	১	স্কোর করেননি	(১+০+১) ÷ ৩ = ০.৭
৫। সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর	২	২	২	১	(২+২+২+১) ÷ ৪ = ১.৭
৬। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব	৩	৩	২	২	(৩+৩+২+২) ÷ ৪ = ২.৫
৭। জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি	১	০	০	স্কোর করেননি	(১+০+০) ÷ ৩ = ০.৩
৮। সমন্বয়হীনতা	৩	৩	২	স্কোর করেননি	(৩+৩+২) ÷ ৩ = ২.৬

অতএব,

"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যার গড় স্কোর
= নির্দেশকের গড় স্কোরসমূহের যোগফল ÷ নির্দেশকের সংখ্যা
= (১.০ + ২.০ + ০.২ + ০.৭ + ১.৭ + ২.৫ + ০.৩ + ২.৬) ÷ ৮
= ১.৪

লেখচিত্র ৩: স্কোরিং– "ঋ-আইন, ২০২১" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর : ১.৪

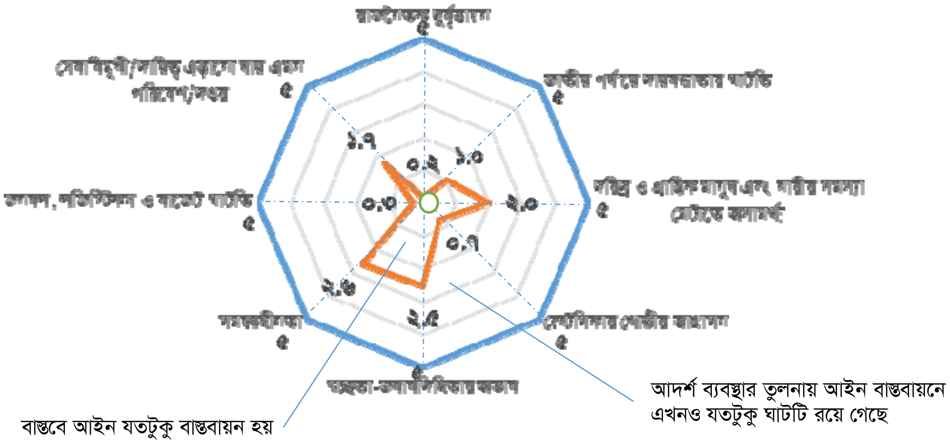

উল্লেখ্য, পাঠের সুবিধার জন্য এখানে দশমিকের পর এক ঘর বিবেচনা করা হয়েছে।

লেখচিত্রের মাধ্যমে আইনি সমস্যা এবং আইন বাস্তবায়নে অবস্থার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করা হয়েছে এবং আদর্শ ব্যবস্থাকে '১০০' (একশত) ধরলে শতকরা (%) অর্জন কতটুকু তাও দেখানো হয়েছে (লেখচিত্র ৪)।

লেখচিত্র ৪: "ঋ-আইন, ২০২১": আইন এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা
('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

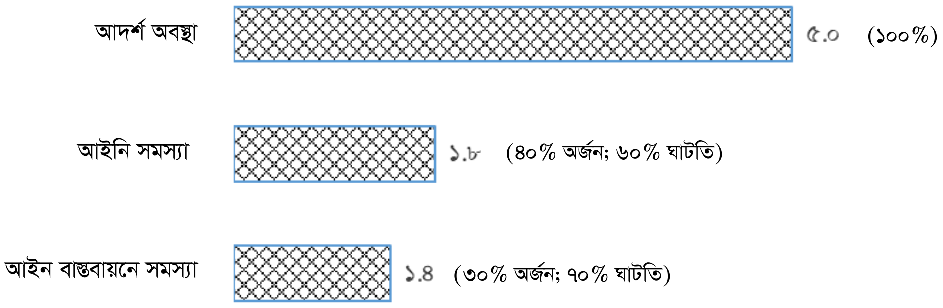

সীমাবদ্ধতা

অন্যান্য গবেষণার মতোই বর্তমান গবেষণাতেও রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো সুনির্দিষ্ট করাটা গবেষক-দলের দায়িত্ব। এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য দুটি সীমাবদ্ধতা হলো:

১) আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক অসামর্থ্য একটি বড় সমস্যা। আমাদের বিশ্লেষণে এই অসামর্থ্যের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার বর্তমান অবস্থা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে আলাদা গবেষণানির্ভর নিরীক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে[৯], যা বর্তমান গবেষণার আওতাভুক্ত নয়।

২) সীমিত গবেষণাবরাদ্দ দিয়েই পরিচালনা করতে হয়েছে মাঠগবেষণা। ফলে, দেশের আরো অঞ্চল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় আনা যায়নি।

অধ্যায় বিন্যাস

এই গ্রন্থের শুরুটা বলা চলে ‘মুখবন্ধ’ দিয়ে। ‘মুখবন্ধের’ স্ব-ব্যাখ্যায়িত শিরোনাম “বড় পর্দায় ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা”-ই বলে দেয় যে আমাদের সংশ্লিষ্ট মাঠজরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তকে আমরা দেশজ বড় পর্দায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বিস্তৃত করেছি রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের বৃহৎপরিসরে।

আনুষ্ঠনিক অর্থে এই ‘সূচনা’ অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়ে, মোটমাট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বই।

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিটিতে, আলাদা আলাদা করে ‘কৃষি খাসজমি’, ‘অকৃষি খাসজমি’, ‘জলমহাল’, ‘অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল’ এবং ‘ভূমি ব্যবহার’– এই পাঁচটি বিষয়সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন অবস্থা বিশ্লেষণ করেছি। চিহ্নিত করেছি সমস্যা, করেছি সমাধানের পথনির্দেশ। পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই ঐ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের “সারকথা” (Summary অথবা essence) উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[৯] হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর পক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর নেতৃত্বে ২০১৬ সালে ‘Capacity Assessment of Land Administration and Management in Bangladesh: Critical Reflections on Institutional Processes, Capabilities and Gaps’ শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। ওই গবেষণায় ভূমি প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা অনুসন্ধান করা হয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের জন্য এসব বিষয়ে নিবিড় গবেষণা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

পাঁচটি অধ্যায়ের প্রতিটি শুরু হয়েছে ভূমিকা এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত দিয়ে। তারপর বর্ণনা করা হয়েছে বিষয়সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালাগুলোর, তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ। তার পরপরই আমরা চলে গেছি আইন বা নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার বিশ্লেষণে, সমস্যাগুলোর কার্যকারণ অনুসন্ধান এবং চিহ্নিতকরণে। বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরতে খুঁজে বের করেছি বাস্তব উদাহরণ, উপস্থাপন করেছি কেস স্টোরির আদলে। আদর্শ অবস্থা থেকে আইন/নীতিমালা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের দূরত্ব নিরূপণ করেছি স্কোরিং এর মধ্য দিয়ে। সবশেষে, বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণে তুলে ধরেছি সুপারিশমালা।

বইয়ের সবশেষ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার আওতাধীন আইন এবং নীতিমালাগুলোর মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছি। কোথায় কোথায় তীব্র ঘাটতি, কোথায় দরকার আশু কিংবা গভীর মনোযোগ– সেটি একনজরে জানা যাবে এই তুলনামূলক চিত্র থেকে। সর্বশেষ এই অধ্যায়ে পুরো বিষয়টিকে একটি বড় পর্দায় দেখবার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট করতে চেয়েছি 'শোভন সমাজ'-এ উত্তরণপথের মানচিত্র।

অধ্যায় ২

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

সারকথা: সাধারণভাবে খাসজমি সরকারি মালিকানাধীন জমি, তবে সরকারি সব জমিই খাসজমি নয়। বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৫.৩৪ শতাংশ খাসজমি, যার পরিমাণ ১২ লক্ষ একর। খাসজমি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার কথা–বিশেষত, কৃষি খাসজমি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার। কিন্তু, কৃষি খাসজমির কেবল ১১.৫ শতাংশ কার্যকরভাবে তাদের হাতে আছে; বাকি ৮৮.৫ শতাংশই ক্ষমতাশালী ভূমিগ্রাসীদের অবৈধ দখলে। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭-এ মাধ্যমের কৃষি খাসজমির বণ্টন, বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। 'অধিকার' মানদণ্ডে নীতিমালার কিছু নীতি ভালো, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নে রয়েছে নানান সমস্যা। আবার কিছু নীতি 'অধিকার' মানদণ্ডেই মন্দ। খাসজমির এই নীতিমালায় রয়েছে অধিকার, ক্ষমতা এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা। এটি স্পষ্ট যে, খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহকদের যে ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তাতে এই বণ্টনকে বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বলার কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে, সম্ভাব্য উপকারভোগী অর্থাৎ ভূমিহীন পরিবারগুলোর খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ রাখার ন্যূনতম অধিকার নেই বললেই চলে। এসবের কোনোটিই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট সাংঘর্ষিক।

ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়াটি নানান দোষে দুষ্ট, যার পাওয়ার কথা নয় সে-ই পায় এই জমি। খাসজমি বরাদ্দের পুরো কর্মসূচিটিই অতিমাত্রায় অসচ্ছ—তা চলে নীরবে, জনমানুষের চোখের আড়ালে। সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর গঠন থেকে বাস্তব কর্মকাণ্ড—সবই চলে স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে। পদে পদে চলে দুর্নীতির মহোৎসব, ব্যবস্থাপনা-সিঁড়ির সব ধাপেই একই চিত্র। ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নে দরিদ্র-ভূমিহীন মানুষের অংশগ্রহণের কার্যকরী কোনো উপায়ই নেই; কৃষি খাসজমি যাদের ন্যায্য হিস্যা, সেই ভূমিহীন কৃষিজীবী পরিবারই সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত, ব্রাত্য। নারী, আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকারহীনতাই নিয়ম। যারা বন্দোবস্ত পানও, তাদের জমিটুকুর দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়ে নেই কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা। দখল ধরে রাখবার মতো উপায় থাকে না শ্রেণিকাঠামোর নিচের তলার মানুষের।

নীতিমালায় কিছু সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং দিকনির্দেশনার অভাব, কৃষি খাসজমিতে 'অধিকারহীন'-এর অধিকার মোটেও নিশ্চিত করে না। কৃষি খাসজমির যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নীতিমালায়, যেখানে পৌর এলাকার কৃষিজমি খাস স্বীকৃতিই পায়নি। নেই কোনো হালনাগাদ তথ্যভাণ্ডার, যেটুকু আছে তাতেও সাধারণ্যের অভিগম্যতা অতি সীমিত। তথ্য গোপনকরণ ও তথ্যহীনতার এই সুযোগে দুর্নীতির পথ হয় সুগমতর।

নীতিমালা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে নীতিমালার তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতিমালার সমস্যার গড় স্কোর: ৩.২, এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ১.৪)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতিমালার সমস্যার স্কোর ৩.২ (৬৪% অর্জন) এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ১.৪ (মাত্র ২৮% অর্জন)।

এই নীতিমালা সন্দেহাতীতভাবে খাসজমিতে প্রান্তিক মানুষের, ভূমিহীন কৃষকের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসমর্থ, এই বিষয়ে জরুরি একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইন। বর্তমান নীতিমালায় বলা 'বিধবা বা স্বামী পরিত্যাগ করা নারীর পরিবারকে খাসজমি পেতে হলে সেই নারীর সক্ষম পুত্র থাকতে হবে'—এমন বিষয়ের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে প্রস্তাবিত পূর্ণাঙ্গ আইনে। ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রান্তিক কৃষক, আদিবাসীসহ অন্যান্য ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করতে হবে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা খাসজমি পান না—সেটি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। পৌর এলাকায় কৃষি খাসজমির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেগুলো চিহ্নিত করার জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। বেদখল জমি উদ্ধার এবং ভূমিহীনদের দখল বুঝিয়ে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য একটি কঠোর ও কার্যকর 'খাসজমি উদ্ধার ও বণ্টন আইন' প্রণয়ন করা জরুরি। প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা যাতে বারবার ভূমির মালিক না হতে পারেন সে জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। খাসজমির ধরন, অবস্থান, বিতরণ অবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তিগত অবস্থা ইত্যাদি সবধরনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি খাসভূমি তথ্য-ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন। খাসজমিসংশ্লিষ্ট এই হালনাগাদ তথ্যাদি সবার জন্য করতে হবে উন্মুক্ত; তথ্যপ্রাপ্তি করতে হবে সহজতর। আবেদনের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য একই রকম সহজ করা দরকার, অযথা কালক্ষেপণ যেন না হয় সে জন্য চাই নজরদারি। কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়টি যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে যেন প্রকৃত দাবিদারের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে চাই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। খাসজমি চিহ্নিতকরণের সমস্যাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলোতে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূলপর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি। ইউনিয়নপর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন ও তার কার্যপরিধি নির্ধারণ করা দরকার। সব পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য তদারকির প্রয়োজন; প্রয়োজন নারী, কৃষক এবং ভূমি অধিকার কর্মীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব।

২.১ ভূমিকা

খাস (বিশেষণ পদ) ফার্সি শব্দ। এর অর্থ একান্ত আপন বা নিজস্ব বা নিজের। আবার খাস অর্থ– সরকারি মালিকানা। সাধারণভাবে খাসজমি হলো– সরকারি মালিকানাধীন জমি। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত আইন, ১৯৫০ সালের ২ (১৫) ধারা অনুযায়ী খাসজমি হলো– 'খাসজমি' বা 'খাস দখলী জমি', যেকোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, এর উপরিস্থিত যে কোনো ভবন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার সাথে স্থায়িত্ব নেই এমন অন্য কোনো জমিও অন্তর্ভুক্ত। এই খাসজমি শুধু কৃষিজমির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকৃষি জমি (শহুরে, পৌর, বনভূমি ইত্যাদি) এবং জলা (নদী, হাওর, বাওর, বিল ইত্যাদি)। সরকারি সব জমিই খাসজমি নয়। খাসজমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন; সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মালিকানাধীন জমি খাসজমি

নাও হতে পারে। খাসজমির প্রধান উৎসগুলো হলো: পয়োস্তি জমি[১০], নতুন সৃষ্ট চর জমি[১১], সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি[১২], বাতিল মালিকানার জমি, নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত সরকারের জমি, রেজিস্টার ৮-এ উল্লেখিত কয়েক ধরনের জমি[১৩], বিভিন্ন সরকারি এবং আধাসরকারি সংঘের অব্যবহৃত পুকুর (বারকাত, জামান এবং রায়হান, ২০০৯)।

লেখচিত্র ৫: বাংলাদেশে খাসজমির প্রকারভেদ

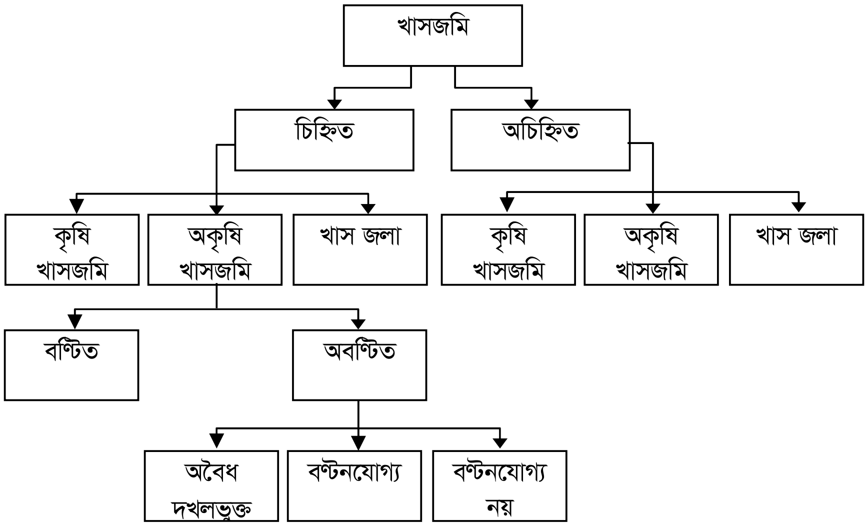

সূত্র: Barkat, Zaman & Raihan (2001)

১০ 'পয়োস্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো—সংযুক্ত বা একত্রভূত হওয়া—যাকে আইনি ভাষায় 'পয়োস্তি' বলে। কোনো জমি সাগর বা নদীর গতিপথের পরিবর্তনের কারণে কিংবা নদীর পানি সরে যাওয়ার ফলে জেগে উঠলে অথবা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি পুনরায় ভেসে উঠলে তাকে পয়োস্তি বলা হয়। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

১১ 'নতুন সৃষ্ট চর জমি' হলো—নদী বাহিত পলি এবং কাদা আঁকাবাকা চলার পথে নদী গর্ভে জমাট বেঁধে নদীর মোহনায় বা সঙ্গমস্থলে নতুন চরের সৃষ্টি করে অথবা অবস্থিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করে। ১৯২০ সালের এ্যালুভিয়াল ল্যান্ডস এ্যাক্ট-এ চরের জমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এটাতে বলা হয়েছে যে: চরের জমি বলতে এমন জমিকে বুঝাবে, যা ১৮২৫ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন এ্যান্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, ১৮৪৭ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন এ্যান্ড ডিলুভিয়ন এ্যাক্ট অথবা ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট-এ বর্ণিত উপায়ে সাগর অথবা নদীতে জেগে উঠেছে এবং ইহা "Reformation In Situ" (স্বস্থানে পয়োস্তি) মতবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

১২ 'সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি' হলো—ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি সিলিং-এর ৬০ (ষাট) বিঘার বেশি জমি কৃষিজমি অর্জন করে, তাহলে সেটা ভূমি সিলিং নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে অর্পিত হবে।

১৩ ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচি ১৯৮৭ অনুযায়ী অনেক ধরনের খাসজমির মধ্যে রেজিস্টার বা নিবন্ধগ্রন্থ ৮-এর তিনটি অংশের খাসজমিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা– ১) নিবন্ধগ্রন্থ ৮-এর ২য় অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (বন্দোবস্তের উপযোগী); ২) নিবন্ধগ্রন্থ ৮-এর ১ম অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (অবাধ অধিকারসহ) যেগুলোর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়েছে; এবং ৩) নিবন্ধগ্রন্থ ৮-এর ৫ম অংশের অন্তর্ভুক্ত কৃষি (সংস্কারকৃত) জমি।

বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৫.৩৪ শতাংশ খাসজমি, যার পরিমাণ ১২ লক্ষ একর। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, এবং জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যায়ন যতো হচ্ছে– ততোই কমছে আবাদি জমির পরিমাণ; হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। তাই, কৃষি খাসজমির ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাসজমি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার কথা—খাসজমি, বিশেষত কৃষি খাসজমি দরিদ্র ও প্রান্তিক, জনগোষ্ঠীর অধিকার। কিন্তু, কৃষি খাসজমির কেবল ১১.৫ শতাংশ কার্যকরভাবে তাদের হাতে আছে; বাকি ৮৮.৫ শতাংশই ক্ষমতাশালী ভূমিগ্রাসীদের অবৈধ দখলে (Barkat, Suhrawardy & Rahman, 2019)। এই প্রেক্ষিতে, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে খাসজমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দুই যুগ আগে প্রবর্তিত একটি নীতিমালার (কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭) মাধ্যমে কৃষি খাসজমির বণ্টন, বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। কালের পরিক্রমায় নীতিমালাটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক— উভয়বিধ সীমাবদ্ধতা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। 'অধিকার' মানদণ্ডে নীতিমালার বেশ কিছু নীতি ভালো। এই ভালো নীতিগুলোর বাস্তবায়ন স্বাভাবিকভাবেই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নে রয়েছে নানান সমস্যা। আবার কিছু নীতি রয়েছে, যেগুলো 'অধিকার' মানদণ্ডেই মন্দ।[১৪] কিন্তু,'মন্দ' নীতিগুলোর বাস্তবায়নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

২.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

> সমগ্র বাংলাদেশের কৃষিজমির ক্ষেত্রে শুধু এক শ্রেণির জনগণের অস্তিত্ব থাকবে, যারা পরিচিত হবে 'মালিক' বা 'রায়ত' হিসেবে, যার অর্থ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্র এবং সর্ব নিম্নে ভূমি কর্ষণকারী হিসেবে পরিচিত মালিক অথবা রায়ত-এর মধ্যবর্তী কেউ থাকবে না।
>
> অনুচ্ছেদ ৮১, ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি

বিগত দুই শতকে কৃষক আন্দোলনের কারণে কর্তৃপক্ষ খাসজমিসংক্রান্ত একাধিক নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরোনো আইন সংশোধন করেছে। কিন্তু, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়নি কোনো ভূমি সংস্কার নীতিমালা। তার ওপর, বিদ্যমান আইন ও সংশোধনীগুলো যথাযথভাবে কার্যকরও হয়নি। নিচের সারণিটিতে ব্রিটিশ সময়কাল থেকে বাংলাদেশ সময়কাল পর্যন্ত খাসজমিসংক্রান্ত আইনগুলোর বিবর্তন ও সংশোধনী দেখানো হয়েছে (সারণি ৩ ও লেখচিত্র ৬)।

---

[১৪] এই নীতিমালার আইনি সমস্যাগুলোর 'অধিকারভিত্তিক' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা পাওয়া যাবে ১৩ খণ্ডের গবেষণাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (চতুর্থ খণ্ড: কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত এবং অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা* ও বন্দোবস্ত)। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

সারণি ৩: খাসজমিসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও এর সংশোধনীসমূহ

সাল	আইন/সংশোধনী
বৃটিশ সময়কাল	
১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন
১৮২৫	বেঙ্গল রেগুলেশন XI
১৮৪৭	বঙ্গীয় পয়োস্তি ও সিকস্তি আইন
১৮৬৮	বঙ্গীয় পয়োস্তি আইন
১৮৮৫	বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট
১৯০৩	বেঙ্গল টেনান্সি (বৈধকরণ এবং সংশোধন) অ্যাক্ট
১৯১৯	গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল
১৯৩২	বেঙ্গল ক্রাউন এস্টেটস ম্যানুয়াল
পাকিস্তান সময়কাল	
১৯৫০	স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট
বাংলাদেশ সময়কাল	
১৯৭২	বাংলাদেশ স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার (পিও ১৩৫)
১৯৭২	বাংলাদেশ ল্যান্ডহোল্ডিং লিমিটেড অর্ডার (পিও ৯৮)
১৯৭৫	রাষ্ট্রপতির আদেশ LXI
১৯৮৪	ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ
১৯৮৭	ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচি
১৯৯৫	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা
১৯৯৭	কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

সূত্র: Barkat, Suhrawardy & Rahman (2019)

লেখচিত্র ৬: বিগত ২০০ বছরে খাসজমিসম্পর্কিত আইন ও সংশোধনীর বিবর্তন

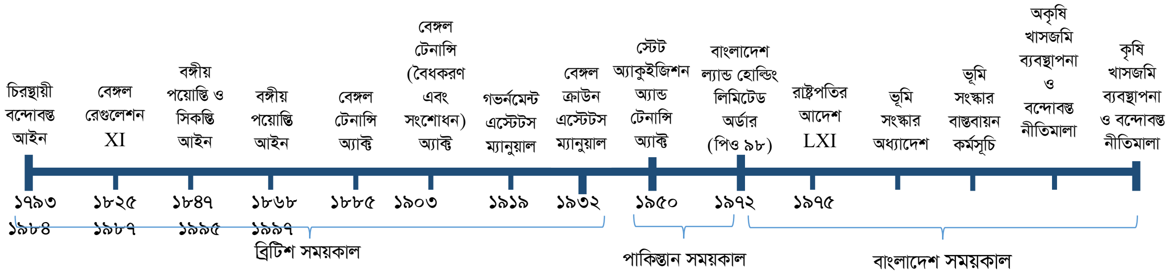

সূত্র: Barkat, Suhrawardy & Rahman (2019)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩'-এর জন্য রাজনৈতিক ইতিহাসে তো বটেই, জনসাধারণের ধারণাতেও কুখ্যাত হিসেবে বিবেচিত। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা যখন ব্রিটেনে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাচ্ছিল, ঠিক সেসময় আইনটির মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতে একটি সামন্তবাদী জমিদারি ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে, ১৫০ বছরের নৃশংস ঔপনিবেশিক-সামন্তবাদী শোষণের পরে ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০ (ইবিএসএটিএ)-এর প্রবর্তনের মাধ্যমে কুখ্যাত জমিদারি ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে এবং কৃষকেরা তাদের জমির পূর্ণ অধিকার পান (Barkat, Zaman & Raihan, 2001; Herrera, 2016)। এটি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ কর্তৃক পাস হয় এবং ১৯ মে, ১৯৫১ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০- এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১) এটি খাজনা আদায়ের সমস্ত স্বার্থ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে;

২) এটি প্রজাদের জমি দর-পত্তনি দেয়া নিষিদ্ধ করে;

৩) পরিবারের সদস্যপ্রতি জমির সর্বাধিক সীমা নির্ধারিত ছিল ৩৩.৩ একর;

৪) সরকার সমস্ত গ্রাম-বাজার (হাট-বাজার) এবং মৎস্য চাষ এলাকা অধিগ্রহণ করে; এবং

৫) ৩ একরের কম পরিমাণ জমির মালিকদের মধ্যে অধিগ্রহণকৃত উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের উল্লেখ ছিল।

পরবর্তী সময়ে ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) সামন্ত প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য, যারা ছিল মূলত স্বৈরাচারী সামরিক শাসকদের ক্ষমতার ভিত্তি, জমির মালিকানার সীমা ৩৩.৩ একর থেকে ১২৫ একরে উন্নীত করেন। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভূমির ওপর কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনেছে বলে মনে হলেও সেই সুযোগটি কার্যকর হতে পারেনি। ১৯৭২ সালে জমির ব্যক্তিগত মালিকানায় সর্বোচ্চ সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হলো ৩৩.৩ একর। ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৩ এর মধ্যেই জমির মালিকদের জমিসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সব তথ্যাদি জমা দেয়ার জন্য বলা হলো; উক্ত তারিখের পর উদ্বৃত্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার কথা ছিল। পরে তথ্য জমাদানের শেষ সময় বাড়িয়ে দেয়া হলো ৩১ মার্চ, ১৯৭৩ পর্যন্ত। ধনী ভূস্বামীরা এই বর্ধিত সময়কে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে কাজে লাগাল। তারা জাল দলিল ও জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণে জালিয়াতি করে নিজের ও আত্মীয়স্বজনদের নামে প্রচুর পরিমাণে জমি রেকর্ড করে নিল। স্টেট অ্যাক্যুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার ১৯৭২ ঘোষণা করল যে, বর্ধিত জমি বণ্টনের সময় অগ্রাধিকার দেয়া হবে সেই সব কৃষকদের, যারা নদীভাঙ্গন কবলিত এবং ৮.২৫ একরের কম জমির মালিক। কিন্তু, ১৯৭৪ সালে এই আইনটি সংশোধনের

মাধ্যমে পুনরায় ঘোষণা করা হলো যে, নদীভাঙ্গন কবলিত ধনী কৃষকেরাও ৩৩.৩ একর পর্যন্ত নতুন জেগে ওঠা চরের জমি পাবার জন্য যোগ্য হবেন। শেষ অবধি ১৯৮৪ সালে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় ২০ একর (বারকাত, জামান এবং রায়হান, ২০০৯:২৯; Herrera, 2016)।

১৯৮৭ সালে ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাকশন প্রোগ্রাম (এলআরএপি) অনুসারে খাসজমির সম্ভাব্য প্রাপকদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিনির্ভর পরিবার;

২. জীবিকার জন্য কৃষি শ্রম অথবা ভাগচাষ-এর ওপর নির্ভরশীল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার; এবং

৩. প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আছে এমন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা।

১৯৯৭ সালে সরকার খাসজমি পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্যে 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা' ঘোষণা করে; যেখানে 'ভূমিহীন পরিবার' পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয় এবং খাসজমির গ্রহীতার নতুন শ্রেণি শনাক্ত করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী কৃষির ওপর নির্ভরশীল ভূমিহীন পরিবার যাদের বসতভিটা আছে অথবা নেই, তারা ভূমিহীন কৃষক হিসেবে বিবেচ্য হবেন। এটি খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে ৯৯ বছর মেয়াদে লিজ দেয়া (স্থায়ী বন্দোবস্ত) বা এক বছরের জন্য অস্থায়ী ইজারা (একসনা বন্দোবস্ত) দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই নীতিমালাটি খাসজমিসম্পর্কিত প্রধান আইনি দলিল হিসেবে বিবেচিত (Barkat, Suhrawardy & Rahman, 2019)।

২.৩ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

কৃষি খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে যথাযথ উপায়ে বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব (বারকাত, ২০১৬)। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপরই খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ শুরু করা হয়। মূলত, ১৯৭২ সাল থেকেই সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছিল। পরবর্তীকালে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্যে ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় ভূমিহীনদের মাঝে কৃষি খাসজমির বণ্টন পদ্ধতির বর্ণনাসম্বলিত এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশপত্র জারি করে, যার নাম দেয়া হয় ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাকশন প্রোগ্রাম, ১৯৮৭ (এলআরএপি)। ওই প্রোগ্রাম বা কর্মসূচির সূচনায় বলা হয়েছে, 'ভূমি সংস্কার' বর্তমান জাতীয় সরকারের একটি মৌলিক দায়বদ্ধতা। কর্মসূচিতে কৃষি খাসজমি শুধু ভূমিহীনদের মধ্যেই বিতরণের বিধান রাখা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যেই কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম বহু আগেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এর একটি সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

তবে কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা (সরকারি ভাষ্যমতে) এবং বিতরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম ওই কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এই পরিস্থিতিতে কৃষি খাসজমির বিতরণ কার্যক্রম অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭' প্রণয়নও করা হয়। কিন্তু, এ নীতিমালাও প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করেনি। নিচে 'ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাকশন প্রোগ্রাম, ১৯৮৭ (এলআরএপি-১৯৮৭)' এবং 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর মধ্যেকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:

১) খাসজমি বিতরণে ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকায় এলআরএপি, ১৯৮৭-তে দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ১ম অগ্রাধিকার ছিল সিকস্তি [১৫]-কবলিত রায়ত [১৬] পরিবার; কিন্তু, ১৯৯৭ সালের নীতিমালায় দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২) এলআরপি, ১৯৮৭-তে কোনো পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২.০ (দুই) একর পর্যন্ত কৃষি খাসজমি দেয়ার কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু, ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর পর্যন্ত দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩) এলআরএপি, ১৯৮৭-তে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা ছিল: (ক) যেখানে স্বামী-স্ত্রীর নামে যৌথ বন্দোবস্ত দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তালাক সম্পন্ন হলে বন্দোবস্ত বাতিল হবে এবং জমিটি খাস হবে, এবং (খ) যদি স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে 'নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী শাস্তি আইন' অনুযায়ী অপরাধ করেন, তবে বন্দোবস্তকৃত জমির ওপর অধিকার বাতিল হবে এবং সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমি স্ত্রীকে দেয়া হবে। কিন্তু, ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে এই ধরনের কোনো বিধান নেই।

---

[১৫] 'সিকস্তি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ভাঙা। যদি কোনো জমি ক্রমশ এবং ব্যাপক হারে ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে সিকস্তি বলে। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারায় এ-সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

[১৬] 'রায়ত' শব্দটির উৎপত্তি আরবি রঈয়ৎ (রা'আ) থেকে। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে এর অর্থ 'চারণভূমির পশুপাল' এবং সমষ্টিগত অর্থে 'প্রজা'। মোঘল ও ব্রিটিশ আমলে প্রথাগত ও আইনসম্মতভাবে বাংলার কৃষককুলকে বোঝানোর জন্য 'রায়ত' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মোঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ছিল একজন চাষি, একজন রাজস্ব ইজারাদার। কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত যেসব লোক জমির মালিকদের মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে রাষ্ট্রের খাজনা পরিশোধ করত, তারাই ছিল রায়ত। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এটি রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ ও শাসকশ্রেণির অধীনস্থদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতো। সম্ভবত টোডরমলের বন্দোবস্তে (১৫৮২) শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং তখন থেকে ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনগত ও ব্যবহারিকভাবে বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। এ আইনে রায়তদের নতুন নাম হয় 'মালিক'। কিন্তু এ নামটি কখনোই জনস্বীকৃতি পায়নি। বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকদের বোঝানোর জন্য বর্তমানে জোতদার (অতি ধনাঢ্য চাষি), গৃহস্থ (মোটামুটি ধনাঢ্য চাষি), কৃষক (সাধারণ চাষি), চাষি (প্রান্তিক চাষি), বর্গাদার (ভাগচাষি), মজুর (কৃষি শ্রমিক) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪) ১৯৮৭ সালের কর্মসূচিতে সহজ প্রক্রিয়ায় বণ্টনের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত খাসজমিকে উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল। যথা—সেচ সুবিধাযুক্ত তিন ফসলি জমি: ১ম শ্রেণির জমি; সেচ সুবিধাযুক্ত দুইফসলি জমি: ২য় শ্রেণির জমি; এবং সেচ সুবিধাহীন এক ফসলি জমি: ৩য় শ্রেণির জমি; কিন্তু, ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে খাসজমির জন্য এ ধরনের কোনো শ্রেণিবিভাজন নেই।

৫) ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে ভূমিহীন বা ভূমিহীন পরিবারের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি কিছুই নেই, কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর; এবং যার ১০ শতাংশের কম ভূমি আছে তাকেও ভূমিহীন পরিবার বলা হয়। অন্যদিকে, এলআরপি, ১৯৮৭-তে খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য ভূমিহীন পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল, কৃষিনির্ভর পরিবার যার বাস্তুভিটা বা কৃষিজমি কিছুই নেই; কৃষিনির্ভর পরিবার যার কৃষিজমি নেই কিন্তু বাস্তুভিটা আছে; এবং যে পরিবারের বাস্তুভিটা এবং কৃষিজমি আছে; কিন্তু মোট জমির পরিমাণ ০.৫০ একর-এর কম অথচ কৃষিনির্ভর। সেক্ষেত্রে কৃষিনির্ভর পরিবার বলতে বুঝায় যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য অন্য পরিবারের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন অথবা বর্গাদার হিসেবে অন্যের জমি চাষ করেন।

৬) এলআরএপি, ১৯৮৭ অনুসারে, লিজ দেয়া জমির হস্তান্তর ছিল না। তবে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হবে। লিজ-এর মেয়াদ হবে ৯৯ বছর। ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে লিজ বা লিজের মেয়াদ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

৭) ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার বা চেয়ারম্যান-এর সত্যায়িত ২ কপি ছবি জমা দিতে হয়। এছাড়াও জমা দিতে হয় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাও দিতে হয়। অন্যদিকে, এলআরএপি, ১৯৮৭-তে ভূমিহীন কৃষকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বানের ক্ষেত্রে শুধু পরিবারের কর্তার এবং স্বামী/স্ত্রীর তিন কপি যৌথ ছবি প্রত্যেক আবেদনের সাথে জমা দিতে হতো। এছাড়া, আবেদনপত্রের সাথে অন্য কিছুর প্রয়োজন ছিল না।

৮) ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে যার সভাপতি, উপদেষ্টা (বা মন্ত্রী), ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সদস্যসচিব হলেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে, এলআরএপি, ১৯৮৭-তে এ ধরনের কোনো কমিটি ছিল না।

৯) ১৯৮৭ সালের এলআরএপি-তে কোর্ট ফি পরিশোধের কথা বলা ছিল। অর্থাৎ নোটিশ জারির ৭ দিনের মধ্যে আবশ্যকীয় কোর্ট ফি পরিশোধ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমিসম্পর্কিত আপত্তি নিবন্ধিত করবার বিধান ছিল। জেলা প্রশাসক বরাবর আপিলের

ক্ষেত্রেও কোর্ট ফি পরিশোধের কথা বলা ছিল। অন্যদিকে, ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে আপত্তি নিবন্ধিত করার ক্ষেত্রে কোনো কোর্ট ফি পরিশোধের কথা বলা হয়নি।

১০) ১৯৯৭ সালের নীতিমালাতে বলা হয়েছে, বন্দোবস্ত পাবার পর কোনো বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ অমান্য করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে থানা/উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি খাস হিসেবে পুনঃগ্রহণ করে খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবে। কিন্তু, এলআরপি-১৯৮৭-তে এ ধরনের কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১১) এলআরএপি-১৯৮৭ এবং ১৯৯৭ সালের নীতিমালা কোনোটিতেই কৃষি খাসজমির যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। যেমন– পৌরসভা এলাকার মধ্যে কৃষি খাসজমিকে অকৃষি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু, এটি প্রকৃত অর্থেই কৃষি খাসজমি।

২.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- পরিবারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে: যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষি জমি কিছুই নেই, কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর (অনুচ্ছেদ ১০)।
- ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কথা বলা হয়েছে। আর, ওই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থাকবে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি (অনুচ্ছেদ ৩)।
- বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি-না, কেউ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে কি-না সে সম্পর্কে তদারকি ও শর্তভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসকের কাছে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা/থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি সুপারিশ করবে (অনুচ্ছেদ ৫)।
- প্রাথমিক বাছাইপ্রক্রিয়া শেষে ভূমিহীনদের চিহ্নিত করার পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনপত্রের সঠিকতা যাচাই করবে এবং প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার নির্বাচন করবে (অনুচ্ছেদ ৬)।
- ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীর কাছ থেকে আবেদনপত্রের সাথে ইউপি সদস্য অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ (দুই) কপি ছবি ও নাগরিক সনদপত্র জমা দিতে হবে (অনুচ্ছেদ ৬)।

- বরাদ্দকৃত খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কেউ এমনটি করলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হবে (অনুচ্ছেদ ৭)।
- বিধবা বা স্বামী পরিত্যাগ করা নারীর পরিবারকে খাসজমি পেতে হলে সেই নারীর সক্ষম পুত্র থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১)।
- খাসজমির বরাদ্দ অনুমোদনের পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে ১ টাকা সেলামির বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করবেন এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের খতিয়ান খুলে দেবেন (অনুচ্ছেদ ১৯)।
- কোনো মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ দিতে হবে। ওই মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার পর আরও জমি থাকলে পার্শ্ববর্তী মৌজার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে এবং এ ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ২১)।
- ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের বিষয়ে উপজেলার বড় বড় হাটবাজারে লোক সমাগমের দিনে ও প্রতিটি গ্রামে মাইকযোগে কিংবা ঢোল শহরতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবেন (অনুচ্ছেদ ২২)।
- ভূমিহীনদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৫)।
- বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত খাসজমি, চিংড়ি ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এবং নদী পয়োস্থি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ না হওয়া পর্যন্ত এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। দিয়ারা জরিপ না হওয়া পর্যন্ত এই সব জমি ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েলের বিধান অনুযায়ী ডি.সি.আর.-[১৭] এর ভিত্তিতে একসনা ইজারা দেয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমিহীন কৃষকদের দিতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৬ ও ২৭)।
- কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোনো ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্রে কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করলে কিংবা কোনো তথ্য গোপন করলে তাদের

---

[১৭] 'ডিসিআর' বা 'ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট' হলো—মূল মালিকের নামে খাজনা নির্ধারণের আগে, এই নোটিশ জারি হয়। জমিসংক্রান্ত কাগজপত্রের মূল কপি থাকে ভূমি অফিসে, মালিককে কার্বন কপি দেওয়া হয়। আইন অনুযায়ী বলা যায়– ভূমি কর ব্যতীত সরকারি পাওনা আদায় করার পর যে নির্ধারিত ফরমে (ফরম নং-২২২) রশিদ দেওয়া হয় তাকে ডিসিআর বলে।

আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (অনুচ্ছেদ ২৯)।

- বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোনো বন্দোবস্তগ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোনো আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসেবে পুনঃগ্রহণ করে খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবে (অনুচ্ছেদ ৩০)।

২.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা

প্রাথমিকভাবে 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-কে খুব একটা জটিল বলে মনে হবে না (Barkat et al., 2014)। তবে, এই ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। খাসজমি সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ক্ষেত্রে নীতিমালাটি ব্যর্থ হয়েছে। নীতিমালার নানামুখী বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহকদের যে ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তাতে এই বণ্টনকে বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত বলা যায় না। বিশ্লেষণে এটাও প্রতীয়মান হয় যে কর্তৃত্বকারীদের এই স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সচেতনভাবেই প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, সম্ভাব্য উপকারভোগী অর্থাৎ ভূমিহীন পরিবারগুলোর খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ রাখার ন্যূনতম অধিকার নেই বললেই চলে। এটাও শাসকগোষ্ঠীর সচেতন সিদ্ধান্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'সরকারি সম্পত্তি' স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না হলেও কৃষি খাসজমি নিঃসন্দেহে সরকারি সম্পত্তির শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, যার মালিক হবে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র অথবা সমবায়ভুক্ত সদস্য অথবা নির্ধারিত সীমার মতে ভূমিহীন দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবার (অনুচ্ছেদ ১০-এর সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি এবং ১৩-এর মালিকানার নীতি)। সংবিধানের ১৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এবং রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা মহীসোপানের উপরিস্থ সবকিছুই প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি। আর যেহেতু জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, সেহেতু এসবই জনগণের সম্পত্তি। বাংলাদেশের সংবিধান কোনো সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক এবং নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে প্রসারিত করেছে (অনুচ্ছেদ ১৪৪)। এক্ষেত্রে 'প্রসারিত' শব্দটি দিয়ে বোঝায় যে, সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ প্রজাতন্ত্রের মালিকানাধীন সম্পত্তি নিয়ে কাজ করতে পারবে। আগেই বলা হয়েছে যে, নীতিমালাটি প্রজাতন্ত্রের আওতাধীন কৃষি খাসজমি বিতরণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূল দলিল হিসেবে কাজ করছে। নগণ্য হলেও কৃষি খাসজমির একটি অংশ ইতিমধ্যে ভূমিহীন খানার মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। সংসদীয় আইনের পরিবর্তে নির্বাহী আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিপুল

পরিমাণ এ ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তরের ধারণাটি প্রশ্নবিদ্ধ। জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়ে সংসদীয় আইনেরই কাজ করা উচিত। সাধারণভাবে আইনি ক্ষমতা হলো জনসাধারণের জন্য আইনের বিধান রাখার ক্ষমতা, ঠিক যে রকম প্রশাসনিক ক্ষমতা হলো প্রশাসন পরিচালনার জন্য আইনের বিধান রাখার ক্ষমতা। বৃহৎ অর্থে, সংসদ সদস্যরা তাদের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ থাকলেও, কার্যনির্বাকেরা তাদের কাজের জন্য সাধারণত নিজ নিজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। কৃষি খাসজমি সরকারি সম্পত্তি বলেই জনসাধারণের জন্য তা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বচ্ছতা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় আইনের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা কার্যকর করার জন্য ১৯৯৭ সালে গৃহীত খাসজমির ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত নীতিমালার ভূমিকার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের সংবিধান খুব কম ক্ষেত্রেই সংবিধানের অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক নীতির অধীনে আসা বিষয়গুলো কার্যনির্বাহী আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর করার বিষয়ে অনুমোদন দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অনুচ্ছেদ ৪৭ (১) (চ)-এর বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ, বা নিয়ন্ত্রণের জন্য বলবৎ কোনো আইন এই ভিত্তিতে বাতিল বলে গণ্য হবে না যে এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যদি সংসদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রের নীতিমালার যেকোনো মৌলিক নীতিকে কার্যকর করার জন্য এ জাতীয় আইনের বিধান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪৭ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতিগুলোকে কার্যকর করার জন্য যে সংসদীয় আইন ব্যবহৃত হয় তা বিচারিক পর্যালোচনার বাইরে। কার্যনির্বাহী আইনগুলো এ মর্যাদা থেকে বাদ পড়েছে।

আইনি দৃষ্টিকোণ (*jural* relation) থেকে দেখা যায় যে, খাসজমির নীতিমালায় অধিকার, ক্ষমতা এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। কমিটিগুলোর ওপর খাসজমি বরাদ্দের দায়িত্ব রয়েছে; খাসজমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করার জন্য ক্ষমতা রয়েছে এই কমিটিগুলোর। তবে, কমিটিগুলো খাসজমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্বাচনের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। অন্যদিকে, 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭'-তে খাসজমিতে ভূমিহীন পরিবারের অধিকার, খাসজমি বরাদ্দের সহজলভ্যতা, এবং যোগ্যতার সব রকম মানদণ্ড পূরণের পরও খাসজমি প্রাপক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি; এসব বিষয় খাসজমির সঠিক ও সুষ্ঠু বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধানে আবশ্যক। খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মানদণ্ড সাপেক্ষে প্রার্থীকে নীতিমালায় উল্লিখিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে। তবে, ক্ষেত্রবিশেষে দায়িত্বরত কমিটির যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার রয়েছে। কমিটিগুলো খাসজমি বরাদ্দের জন্য কাজ করছে বটে, কিন্তু প্রার্থীদের প্রতি তাদের নেই কোনো দায়বদ্ধতা। তার ওপর, খাসজমির প্রাপকদের পক্ষে কৃষিজমি প্রাপ্তি বা বরাদ্দের জন্য নেই

কোন সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারের নথি। ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলো কৃষি খাসজমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে নির্বাহী কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেন না। কাজেই কমিটিগুলোর জবাবদিহিতা ও কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। খাসজমির বণ্টনে স্বচ্ছতা ও ভূমিহীন পরিবারের অধিকারের ন্যায়ানুগ স্বীকৃতি নেই বলেই খাসজমির বরাদ্দকে অনেকাংশেই দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা দাতব্য অনুদান দেয়ার মতো মনে হয় এবং ম্লান হয়ে যায় জনকল্যাণের স্বার্থে এই খাসজমির বণ্টনের তাৎপর্যও।

কৃষি খাসজমির মতো গণপণ্য বিতরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যোগ্যতা। এর কারণগুলো হলো: প্রথমত, গণপণ্য বিতরণের সময় নীতিমালায় বর্ণিত যোগ্যতার পরিপন্থী কোনো ব্যক্তিকে বাছাই করা হলে তা কখনোই জনকল্যাণকর হবে না, বরং তা নীতিমালার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত যোগ্যতার মানদণ্ডের অনুপস্থিতি খাসজমি বিতরণে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি করবে কার্যনির্বাহকদের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের। আর এই দুইয়ের সম্বন্বয়ে বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো, কৃষি খাসজমি আসলেই যাদের প্রয়োজন তারা পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। লক্ষণীয় বিষয়, দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি নীতিমালার উদ্দেশ্য হিসেবে সরাসরি বলা হয়নি এবং প্রার্থীর যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে দারিদ্র্যের মাত্রাকেও প্রাধান্য দেয়া হয়নি। এই নীতিটি খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিহীন হওয়ার বিষয়কেই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু, কৃষি খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুধু ভূমিহীন হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কারণ, এ দেশে এমন অনেক ব্যক্তি বা পরিবার রয়েছে যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে কোনোমতে টিকে থাকলেও তাদের নেই নিজস্ব কোনো জমি। অন্যদিকে, দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রাধান্য দিলে দেখা যাবে যে, ভূমিহীনতা ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলোকে অবশ্যই প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড বিচারে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন; যেমন– প্রার্থীর অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবিকার জন্য শুধু কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীলতা, খানায় প্রতিবন্ধী মানুষ, নারীপ্রধান খানা, খানায় দীর্ঘকাল অসংক্রামক রোগে-শোকে অসুস্থ-মানুষ (ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র, ক্যানসার) ইত্যাদি। সহজভাবে বলতে গেলে, কৃষি খাসজমি বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধু ভূমিহীনতা কোনোভাবেই একক আদর্শ মানদণ্ড হতে পারে না, এর সাথে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোকেও যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

কৃষি খাসজমি পাবার ক্ষেত্রে যোগ্যতার যেসব মানদণ্ড নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১-তে উল্লেখ আছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। অনুচ্ছেদ ১১(ঘ)-তে বলা হয়েছে যে, কৃষিজমি বা বসতভিটা নেই এমন পরিবার ৬ ধরনের প্রাপকের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪ নম্বরে থাকবে। মূলত, অনুচ্ছেদ ১১ (ঘ)-তে উল্লেখিত শ্রেণিটি নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভূমিহীন পরিবারের সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এটি যোগ্যতার একটি সাধারণ মানদণ্ড, যা সব শ্রেণির প্রার্থীর ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। সুতরাং, বলা যায় যে, ধারা দুটির শব্দগত উপস্থাপন ভিন্ন হলেও অর্থগত দিক দিয়ে অভিন্ন। একইভাবে অনুচ্ছেদ ১১ (ঙ)-তে বলা হয়েছে যে, খাসজমি প্রাপ্তির অগ্রাধিকারের তালিকায় ৫ নম্বরে থাকবে এমন পরিবার যারা সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়, কাজেই এই শ্রেণির ভূমিহীন পরিবারকে অগ্রাধিকার তালিকায় নিচে অবস্থান দেয়া প্রয়োজন। নিচের আলোচনাটি এই বিষয় সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

ধরা যাক, একখণ্ড খাসজমির জন্য চারজন সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রথম প্রার্থীর পরিবার নদীভাঙ্গনের কবলে বাস্তুচ্যুত ও ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন, যদিও এই পরিবারের সদস্যরা জীবিকার জন্য শুধু কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল নন; কারণ, তাদের মধ্যে কয়েকজন শহরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয় প্রার্থী হচ্ছেন একজন বিধবা, যার দুইজন পুত্র সন্তান রয়েছে। তবে তার সন্তানেরা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল নন এবং কৃষিকাজ সম্পর্কে কিছু জানেনও না। ধরে নেয়া যাক, বিধবা মহিলাটি প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র। অন্যদিকে, তৃতীয় প্রার্থীর পরিবার ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়েছেন এবং এই পরিবারের সদস্যরা আগে কৃষিকাজ করতেন কিন্তু বর্তমানে অধিগ্রহণের পর তারা সরকার থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকায় পারিবারিকভাবে ছোটখাটো মুদির ব্যবসা শুরু করেছেন। আবার, চতুর্থ প্রার্থীর পরিবার মূলত কৃষিকাজ করেন তবে তার ১০ শতাংশ বসতভিটার জমি ছাড়া কোনো কৃষিজমি নেই। সর্বশেষ প্রার্থীর আর্থিক অবস্থাও অনেক খারাপ; তবে, বিধবা মহিলার চেয়ে কিছু মাত্রায় ভালো। নীতিমালায় নির্দেশিত অগ্রাধিকারের ক্রম অনুযায়ী, প্রথম প্রার্থী খাসজমিটি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন যদিও তার পরিবার অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে দরিদ্র অবস্থানে নেই। আবার যদি খাসজমিটি বিধবা মহিলাকে দেয়া হয়, যিনি অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি দরিদ্র, তার পক্ষে প্রাপ্ত কৃষি খাসজমি ধরে রাখার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, তার পরিবারের কেউই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত নন। যদিও চতুর্থ প্রার্থীর পরিবারের ভূমিহীনতার অবস্থা, দারিদ্র্যের মাত্রা, এবং কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সব দিক বিবেচনায় খাসজমিটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু নীতিমালায় বর্ণিত অগ্রাধিকারের ক্রম অনুযায়ী অবস্থান হবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে সবার নিচে। এই উদাহরণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, কৃষি খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ে আরো বেশি বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেন উপযুক্ত প্রার্থী খাসজমি প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। #

নারীর প্রতি বৈষম্যের দুটি দিক এই নীতিমালায় স্পষ্ট। প্রথমত, অনুচ্ছেদ ১১ (গ)-তে বলা হয়েছে যে বিধবা বা স্বামী পরিত্যাগ করা নারীর পরিবারকে খাসজমি পেতে হলে সেই নারীর সক্ষম পুত্র সন্তান থাকতে হবে। অর্থাৎ, এই ধারা অনুসারে, কোনো বিধবা নারী যদি কৃষি খাসজমি পেতে চান তবে তার পরিবারে নির্দিষ্ট পুরুষ সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক। এই মানদণ্ডে বিধবা বা স্বামী পরিত্যাগ করা নারী বঞ্চিত হন কৃষি খাসজমি প্রাপ্তির অধিকার থেকে, যাদের প্রকৃত অর্থেই জমি পাওয়াটা

জরুরি। নীতিমালার এই ধারা থেকে এটি স্পষ্ট যে, পুরুষরাই খাসজমি পাবার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্য প্রার্থী। অথচ দেশে-বিদেশে অভিবাসন, অকৃষি খাতের বিকাশ ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ কৃষির নিয়ন্ত্রণভার এখন নারীর হাতে। দ্বিতীয়ত, কমিটিগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের বিশেষ কোনো বিধান নীতিমালায় নেই। যদিও বা বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ (৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, জাতীয় জীবনের সব স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

নীতিমালার অধীনে গঠিত কমিটিগুলোর মধ্যে ক্ষমতা এবং দায়িত্বের অসম বণ্টন লক্ষণীয়। কৃষি খাসজমি বরাদ্দের বিষয়ে উপজেলা কমিটি যে তালিকা প্রণয়ন করে তার অনুমোদন দেয় জেলা কমিটি। ভূমিহীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা, আবেদনগুলো বাছাই করা, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমিহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন, এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দের জন্য জেলা কমিটিকে সুপারিশ ইত্যাদি দায়িত্ব উপজেলা কমিটির। উপজেলা কমিটির সুপারিশের ওপর জেলা কমিটির কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এবং খাসজমি বরাদ্দের সব দায়িত্ব উপজেলা কমিটির হলেও, প্রকৃত অর্থে এর কোনো ক্ষমতা নেই। খাসজমি বরাদ্দের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় জেলা কমিটি, যেখানে তারা কোনো রকম জবাবদিহিতার জন্য বাধ্য নন। অন্যদিকে, উপজেলা কমিটি তার কাজ ও সিদ্ধান্তের জন্য জেলা কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকলেও জেলা কমিটি তার সিদ্ধান্তের জন্য কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ নয়। কমিটিগুলোর মধ্যে ক্ষমতা-দায়িত্বের এমন অসম সম্পর্ক খাসজমির সুষম বণ্টনকে ব্যাহত করে।

সবকটি নীতিমালায় কিছু সুনির্দিষ্ট শব্দ (পরিভাষা) ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কিছু শব্দের কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি এবং কিছু শব্দের সংজ্ঞা স্পষ্ট নয়। অনুচ্ছেদ ৬ (ছ)-তে বলা হয়েছে যে, একান্নবর্তী পরিবারের একাধিক সদস্য খাসজমি পাবার ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। অথচ, একান্নবর্তী পরিবারের কোনো সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়নি। একইভাবে, অনুচ্ছেদ ১১ (চ)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, কৃষিজমি নেই কিন্তু ১০ শতাংশ বা তার কম পরিমাণ বসতভিটার জমি আছে এবং পরিবারটি যদি জীবিকার জন্য কৃষিনির্ভর হয় তবে ওই পরিবারের সদস্য কৃষি খাসজমি পাবার জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন। এখানেও নীতিমালাটি 'জীবিকার জন্য কৃষিনির্ভরতা'—বলতে কী বোঝায় তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। অন্যদিকে, নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১০-এ 'ভূমিহীন পরিবার'-এর সংজ্ঞা অস্পষ্ট সংজ্ঞার একটি উদাহরণ। কেননা, ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের সুনির্দিষ্ট কোন কোন যোগ্যতা থাকতে হবে এ সংজ্ঞায় তার কোনো নির্দেশ নেই। এক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবার'-এর সংজ্ঞাটি আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ, খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই ভূমিহীন পরিবারের সদস্য হতে হবে। অনুরূপভাবে, নীতিমালার ৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা [১৮] সম্পূর্ণ নয়। সংজ্ঞায় সবকটি মেট্রোপলিটন এলাকা,

[১৮] বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ মার্চ, ১৯৯৫ সালে জারিকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্য সব খাসজমি কৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ দেশের সব

সব পৌর এলাকা এবং সব থানাসদর এলাকাভুক্ত কৃষি খাসজমিকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞাটি নীতিমালার ২৬ ও ২৭ নং অনুচ্ছেদে আরও সংশোধিত হয়েছে, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৯-এ যে কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে ৫ (পাঁচ) ধরনের খাসজমি অনুচ্ছেদ ১০ ও ১১ অনুযায়ী ভূমিহীন বা ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে অনুচ্ছেদ ২৬-এ বর্ণিত বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত কৃষি খাসজমি ও চিংড়ি ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি ও অনুচ্ছেদ ২৭-এ বর্ণিত নদী পয়োস্তি জমি বা চর ভূমি ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ না হওয়া পর্যন্ত এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। এসব অস্পষ্টতা প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

নীতিমালাটির অনেক জায়গায়ই রয়েছে অস্পষ্টতা। নীতিমালার মূলপাঠ থেকে এটি আদৌ স্পষ্ট নয় যে কোন আইনি সত্তা খাসজমির বন্দোবস্ত পাওয়ার অধিকার রাখে। অনুচ্ছেদ ১০-এ উল্লেখিত 'ভূমিহীন পরিবার'-এর সংজ্ঞা এবং অনুচ্ছেদ ১১-এ 'ভূমিহীন পরিবারসম্পর্কিত' বিষয়াবলী ইঙ্গিত দেয় যে, খাসজমির প্রার্থীকে অবশ্যই ভূমিহীন পরিবারের সদস্য হতে হবে। নীতিমালার ৬ (ছ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একই পরিবারের একাধিক সদস্যের কৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত পাওয়ার অধিকার নেই। আবার, ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক টাকা সেলামির বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করে দেবেন। অনুচ্ছেদ ৬ (জ)-তে বলা হয়েছে, কৃষি খাসজমি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নামে বন্দোবস্ত দেয়া হবে (সম্ভবত, এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে যেখানে কৃষি খাসজমির প্রার্থী বিবাহিত ব্যক্তি হবেন)। অনুচ্ছেদ ৬ (ছ)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, একান্নবর্তী পরিবারের একাধিক সদস্য খাসজমি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, যদিও কৃষি খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তবে প্রার্থী এককভাবে বা স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে কৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত পেতে পারেন। সমস্যাটি হলো বরাদ্দকৃত খাসজমির অধিকার ও দায়বদ্ধতার বিষয়ে প্রার্থীর পরিবারের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কোনো কিছু নীতিমালায় বলা হয়নি। তবে নীতিমালার উদ্দেশ্য ও শব্দের প্রয়োগ থেকে এটি অনুমান করা যায় যে, কৃষি খাসজমি শুধু প্রাপকের সুবিধার জন্যই বরাদ্দ দেয়া হয় না, বরং এক্ষেত্রে তার পুরো পরিবারের সুবিধার কথাই বিবেচনা করা হয়। এসব অস্পষ্টতা পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়: প্রকৃতপক্ষে খাসজমি প্রাপকের আইনি অবস্থান আসলে কী? যদি কোনো প্রাপক তার পরিবারের সাথে সম্পর্কের কারণে কৃষি খাসজমির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন, তবে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রাপকের অবস্থান একজন ট্রাস্টির মতো। প্রাপককে পরিবারের সব সদস্যের কল্যাণে ওই খাসজমি ব্যবহার করতে হবে। আবার, নীতিমালার ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, খাসজমি বন্দোবস্ত পাবার পর কোনো বন্দোবস্তগ্রহীতা সরকারের ভূমিসংক্রান্ত যেকোনো আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ আছে, তা লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য

মেট্রোপলিটন এলাকা, সব পৌর এলাকা এবং সব উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত সব ধরনের জমি ব্যতীত এর বাইরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সব খাসজমি-ই কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

হবে। এক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্ন ওঠে যে, গ্রহীতার দোষের জন্য নিরীহ পরিবার কেন ভুক্তভোগী হবে? কেন পরিবারের সব সদস্যের কল্যাণে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি প্রাপ্তির সুবিধা থেকে পুরো পরিবার বঞ্চিত হবেন?

নীতিমালার বিধানগুলো সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয়সম্বলিত বিধান রাখা হয়েছে; আবার, কখনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে পাঠ্যের স্পষ্টতা এবং বোধগম্যতা হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, নীতিমালার ৬ নং অনুচ্ছেদে 'ভূমিহীন বাছাইপ্রক্রিয়া' শিরোনামে ১০টি পৃথক উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে। ৬ নং অনুচ্ছেদের প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উপ-অনুচ্ছেদে আবেদনপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; তৃতীয় এবং চতুর্থ উপ-অনুচ্ছেদে প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া; সপ্তম উপ-অনুচ্ছেদে প্রার্থীর অযোগ্যতার শর্ত; অষ্টম উপ-অনুচ্ছেদে বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া; নবম উপ-অনুচ্ছেদে প্রার্থীকে কৃষি খাসজমি বরাদ্দের পরিমাণ; এবং দশম উপ-অনুচ্ছেদে খাসজমি বরাদ্দের সুযোগ সম্পর্কে বিধান রাখা হয়েছে। তবে, নীতিমালার ১৪ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদেও আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিধান রয়েছে। একইভাবে, কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ, প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া, বরাদ্দের পদ্ধতি, এবং ফলাফল ইত্যাদি বিষয়সম্বলিত বিধান নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় (বারকাত, আবুল এবং অন্যান্য ২০২০)।

উপরোল্লিখিত নীতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নীতিমালার বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরি করে। দেখা যাচ্ছে কৃষি খাসজমির নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় মহানগর এলাকার কৃষি খাসজমিকেও অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে; চিংড়ি চাষ এবং লবণ চাষের জন্য যে জমি ব্যবহার করা হয় তা কৃষি খাসজমির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিধবা মহিলাকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে হলে তার সক্ষম পুত্র থাকতে হবে, যা নারীর মৌলিক অধিকারবিরোধী; খাসজমি বন্দোবস্তের কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি; বন্দোবস্ত কার্যক্রমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূলপর্যায়ে কোনো কমিটি গঠনের বিধান নেই; খাসজমি হস্তান্তরের ওপর কোনো আইনি বিধিনিষেধ নেই।

আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির অনুপস্থিতি 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭' বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা। নীতিমালার ৩৪টি অনুচ্ছেদের ৩২টির বাস্তবায়ন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; বাস্তবায়নযোগ্য অনুচ্ছেদের বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই নানা সমস্যা রয়েছে বলে মাঠগবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালার ৩, ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদে সারা দেশে জাতীয়, জেলা এবং থানা বা উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং সেগুলোর কার্যপরিধি নির্দিষ্ট

করা হয়েছে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় হলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিটিগুলোর সভা হওয়ার কথা থাকলেও, নিয়মিত সভা হয় না। কমিটিগুলোতে নারীর নামমাত্র অংশগ্রহণ থাকলেও তাদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। গ্রামীণ জনগণের সবচেয়ে কাছের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত কোনো কমিটি নেই। উপজেলা কমিটির সভায় ভূমি অধিকার সংগঠনের কোনো সদস্যকে ডাকা হয় না। তাদের 'দোষ'—তারা বন্দোবস্ত নীতিমালা সম্পর্কে অবগত!

নীতিমালার ৫ (খ) অনুচ্ছেদ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি নির্দিষ্ট করেছে। কমিটির প্রথম কাজ আওতাধীন এলাকার কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও তা উদ্ধার করা। বাস্তবে, গোড়ায় গলদ রেখেই কমিটি তাদের কার্যক্রম চালায়, ঠিকমতো চিহ্নিত করা হয় না কৃষি খাসজমি। ভূমিগ্রাসীদের অবৈধ দখলে থাকা জমি উদ্ধার না করেই চলে বন্দোবস্ত কার্যক্রম।

সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণের (অনুচ্ছেদ ৫ খ-৩) কথা থাকলেও বাস্তবে ন্যূনতম প্রচারের ব্যবস্থাও নেই। এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম চলে নীরবে, সবার অজ্ঞাতে। বিশেষত, যেখানে ভূমিহীন সংগঠন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার আদায়ে নেই কোনো সোচ্চার এনজিও বা নাগরিক সংগঠন, সেখানে তো এই বিষয় সম্বন্ধে কোনো তথ্য কারো কাছে পৌঁছায়ই না ।

অনুচ্ছেদ ৫ (খ)-এর কার্যপরিধি অনুযায়ী, উপজেলা কমিটিকে একই সাথে খাসজমি নথিভুক্ত করা ও বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে দেয়।

প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই খাসজমি বন্দোবস্তের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। নীতিমালার ৬ নং অনুচ্ছেদে ভূমিহীন বাছাইপ্রক্রিয়ার পর্যায়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তবে যার কোনোটিই ঠিকমতো অনুসরণ করা হয় না। প্রতিটি ইউনিয়নে আবেদনকারীদের সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করার কথা উপজেলা কমিটির, অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা করে না। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তার সদস্যদের সাথে বৈঠক করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, এতে সুযোগ বাড়ে দুর্নীতির। প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্ত করে চূড়ান্তভাবে প্রকৃত ভূমিহীনের পরিচয় যাচাই করার কথা উপজেলা কমিটির, সেটিও তারা করে না। আবেদনপত্রের সাথে ইউপি চেয়ারম্যান অথবা সদস্যের সত্যায়িত ছবি দেয়ার বাধ্যবাধকতা সময়ক্ষেপন মাত্র; এবং এতে দুর্নীতির সুযোগ বাড়ে। একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি না দেয়ার বিধান থাকলেও জালিয়াতির মাধ্যমে পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেওয়া হয়। গবেষণাধীন উপজেলাগুলোতে এমন

উদাহরণও পাওয়া গেছে, যেখানে একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে [১৯] কৃষি খাসজমি বরাদ্দ নিয়েছেন।

নীতিমালার ৭ নং অনুচ্ছেদে বরাদ্দকৃত জমি উত্তরাধিকারসূত্র ছাড়া হস্তান্তর করা যাবে না বলে উল্লেখ আছে। হস্তান্তর করলে সেই জমি আবার সরকারের খাসজমিতে পরিণত হওয়ার কথা। বাস্তবে, কৃষি খাসজমি বিক্রি হচ্ছে (বা বলা ভালো হস্তান্তরিত হচ্ছে) অহরহ। বিক্রিত বা হস্তান্তরিত জমি খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদাহরণ নেই বললেই চলে।

কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নীতিমালার ৭ নং অনুচ্ছেদে; যেখানে পৌর এলাকার কৃষি খাসজমি স্বীকৃতি পায়নি।

১০ নং অনুচ্ছেদে ভূমিহীন পরিবারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর। এই সংজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নানান কৌশলে (যেমন- সন্তানদের ভূমি দান করে) ভূমিহীন পরিচয়ে খাসজমির বরাদ্দ নেন অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি।

নীতিমালার ১১ নং অনুচ্ছেদের ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি কৃষকের অধিকার। আগের ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকলেও এই অনুচ্ছেদের কোথাও উল্লেখ নেই যে তালিকাভুক্ত পরিবারকে হতে হবে কৃষিনির্ভর। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিজমির বন্দোবস্ত পেয়ে যায় অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত পরিবার। 'দুঃস্থ নয় এমন' অনেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তির পরিবারও বরাদ্দ পেয়ে যাচ্ছে কৃষি খাসজমি। সক্ষম পুত্র না থাকায় বিধবা বা স্বামী পরিত্যাগ করা নারীর পরিবার অন্যকে পুত্র সাজিয়ে খাসজমি বরাদ্দ পাবার চেষ্টা করে।

কৃষি খাসজমি বিতরণের প্রক্রিয়াটি প্রায়শই কমিটি গঠিত না হওয়ার কারণে বাধাগ্রস্ত হয় (১২ নং অনুচ্ছেদ)। ১৩ (ক) নং অনুচ্ছেদে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত করে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ এবং এর ব্যাপক প্রচারণার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাছে মৌজার সব খাসজমির তথ্য থাকে না বা তথ্যগুলো তারা হালনাগাদ করে না কিংবা তথ্য থাকলেও তা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ করে না। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রকল্পের ব্যাপারে অনেক যোগ্য ভূমিহীন প্রার্থীকে অবহিতই করা হয় না। এ বিষয়ে কোনো আধুনিক ডেটাবেজ/তথ্যভাণ্ডার নেই। অতিরিক্ত খাসজমি (সিলিং-এর বাড়তি, ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে উদ্ধার করা জমি, নদীতে পলি পড়ার কারণে জেগে ওঠা চরের জমি ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত হয় না তালিকায়।

---

[১৯] এখানে ভিন্ন ভিন্ন নাম বলতে একজন ব্যক্তি ভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে একাধিক নকল জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে, ভূমিহীন সেজে খাসজমি পাওয়ার চেষ্টা করে। নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার একজন ভূমি অধিকার কর্মী এ ধরনের ঘটনা এই এলাকায় ঘটেছে বলে জানান।

বন্দোবস্তের আবেদনপত্রের (১৪ নং অনুচ্ছেদ) সাথে অনেক রকম নথিপত্র এবং তথ্য চাওয়া হয়, যার সঠিক যোগান দেয়া নিরক্ষর-দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষকের জন্য দুরূহ। 'যথাযথভাবে পূরণ হয়নি'—এই বলে বাতিল করা হয় বহু আবেদনপত্র। এসবে ঘুষ আদায়ের পথ সুগম হয়। নীতিমালায় কৃষি খাসজমি পাওয়ার জন্য আবেদন থেকে শুরু করে দখল বুঝে পাওয়া পর্যন্ত যে সময়সীমা বলা হয়েছে (১৪ থেকে ২০ নং অনুচ্ছেদ), সেই অনুসারে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে বাস্তবে অনেক বেশি সময় লেগে যায় ।

বণ্টনের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের (২২ নং অনুচ্ছেদ) ব্যাপারে কার্যকর ও স্বচ্ছ কোনো উদ্যোগই নেয়া হয় না। ফলে, যোগ্য ভূমিহীন ব্যক্তিরা এ বিষয়ে জানতেই পারেন না। ২৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, থানা পর্যায়ের সব সরকারি-বেসরকারি অফিসে কৃষি খাসজমি বণ্টনের নোটিশ টাঙাবার কথা। কিন্তু, বাস্তবে বেসরকারি তো দূরের কথা, অনেক সরকারি অফিসেই কৃষি খাসজমি বণ্টনের নোটিশ টাঙানো হয় না।

ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে থানা কমিটির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে (২৪ নং অনুচ্ছেদ)। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে প্রভাবশালী সদস্যরাই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন। ভূমিহীন নির্বাচনে সতর্কতা ও নিরপেক্ষতা কঠোরভাবে অবলম্বন করার বিধান (২৫ নং অনুচ্ছেদ) থাকলেও তা করা হয় না। ভূমিহীনরা, চরের জমির একসনা ইজারা (২৭ নং অনুচ্ছেদ) যাদের বেশি প্রয়োজন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ওই ইজারা পান না।

আবেদনপত্রে ভুল তথ্য প্রদান ও তথ্য গোপনের অপরাধে আবেদন বাতিল ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ (২৯ নং অনুচ্ছেদ) করার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রভাবশালীদের সাথে যোগসাজসের কারণে আবেদনপত্রে ভুল তথ্য প্রদান ও তথ্য গোপনের অপরাধে আবেদনও বাতিল হয় না এবং নেয়াও হয় না আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা।

নীতিমালার ৩০ থেকে ৩৪ নং অনুচ্ছেদে জাতীয়-জেলা-উপজেলাপর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার বিভিন্ন নির্দেশনা থাকলেও কমিটিগুলোর কার্যক্রম প্রায় ক্ষেত্রেই স্থবির।

বর্তমান গবেষণায় কৃষি খাসজমির নীতিমালার বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং একই সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের খাসজমি পেতে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য ভূমি কর্মকর্তা, ভূমি অধিকার কর্মী, জনপ্রতিনিধি ও আইনজীবীদের পাশাপাশি সমাজের নানা পেশার মানুষদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নীতিমালার বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট নানামুখী সমস্যার চিত্র উঠে এসেছে। তাদের মতে, ভূমিহীন বাছাইপ্রক্রিয়া থেকে বন্দোবস্ত পাওয়া পর্যন্ত প্রায় সব স্তরেই দুর্নীতি বিদ্যমান, যার ফলে খাসজমির সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন ব্যাহত হচ্ছে। খাসজমি বাছাইপ্রক্রিয়ায় নাম অন্তর্ভুক্তিকালে স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যের জন্য কার্যত ভূমিহীনরা

খাসজমি পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার অনেক এলাকায় প্রভাবশালীরা খাসজমি নিজেদের দখলে নিয়ে রেখেছে এবং এসব জমি দখলমুক্ত করাটা চ্যালেঞ্জিং। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, নীতিমালায় উল্লেখিত প্রার্থীর যোগ্যতার মানদণ্ডের ত্রুটির কারণেও অনেক সময় প্রকৃত ভূমিহীনকে খাসজমির প্রার্থী হিসেবে বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে না। একজন ভূমি কর্মকর্তা বলেছেন, *"আমার কর্ম এলাকায় অনেক খাসজমি আছে এবং তার হিসাবও আছে। তবে, এসব খাসজমির বেশির ভাগই স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা দখল হয়ে আছে। উচ্ছেদ অভিযানে গেলে তারা দেওয়ানি আদালতে গিয়ে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসে। এছাড়া, তারা হাইকোর্টেও রিট করে রেখেছে। রিটগুলো বেশির ভাগ ২০০৬/২০০৭ এর দিকে করা এবং এই রিটগুলোকেই তারা ভূমি দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রশাসন এক্ষেত্রে ভূমি কর্মকর্তাদের কোনো সহায়তা করছে না। আসলে টাকা ছাড়া কেউ কাজ করতে চায় না; আর আমাদের এসব কাজের জন্য কোনো বাজেটও নেই, ফলে দখলমুক্ত করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের দখল উচ্ছেদ অভিযানে সার্বিক সহায়তা করত তবে দরিদ্র ভূমিহীনদের হয়রানি অনেক কমত বলে আমি মনে করি"*।

একইভাবে, জনপ্রতিনিধিরা জানান যে, তাদের এলাকায় খাসজমি থাকলেও সেগুলোর বেশির ভাগই স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের দখলে রয়েছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে এতটাই শক্তিশালী যে হয় প্রশাসন তাদের অপকর্মে সহযোগী অথবা তাদের সাথে পেরে উঠছে না।

> *"কোনো স্বামী পরিত্যাগ করা বা বিধবা নারী, যার ১৮ বছর বয়সের কোনো পুত্র সন্তান নেই, নাবালিকা মেয়ে আছে—তার জীবন এ দেশে এমনিতেই দুর্বিষহ। এর ওপরে যদি তিনি ভূমিহীন ও প্রান্তিক হন, তবে কতটা প্রতিকূলতা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাকে জীবন কাটাতে হয় তা কল্পনাতীত। সে কারণে নীতিমালায় উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ১১ (গ)-এর যোগ্যতার মানদণ্ডের পরিবর্তন একান্ত কাম্য। অন্যদিকে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমিহীনদের কোনো তালিকা সরকারের কাছে নেই; যেখানে তালিকাই থাকে না, সেখানে সুষ্ঠু বণ্টনও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর সুযোগ নিয়ে জোতদার বা প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা ইচ্ছেমতো ভূমিহীনদের তালিকা তৈরি করে খাসজমির বন্দোবস্ত নিচ্ছে, যা নীতিমালার উদ্দেশ্যকে চরমভাবে বিঘ্নিত করছে।"*
>
> *—ভূমি অধিকার কর্মী, ডুমুরিয়া, খুলনা*

নীতিমালার বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সমস্যা ও ভূমিহীনদের ভোগান্তি সম্পর্কে একজন আইনজীবী বলেছেন, *"ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বিতরণ নিঃসন্দেহে সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কিন্তু এর ফলে প্রকৃত ভূমিহীনরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সেটাই মুখ্য বিষয়। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রভাবশালীরা ভূমিহীন পরিচয়ে প্রকৃত ভূমিহীনদের চেয়ে বেশি খাসজমি বন্দোবস্ত পাচ্ছে।*

সরকার খাসজমি বন্দোবস্ত দেয় আরএস জরিপে [২০] *। যখন ভূমিহীনরা খাসজমি বন্দোবস্ত পায় তখন ওই জমির কোন চৌহদ্দি বা তফসিল বা সিডিউল* [২১] *উল্লেখ থাকে না, যে কারণে তাদের বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির কোনো সীমানা বা দাগ বোঝা যায় না। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে জমির সীমানা নিয়ে ভূমিহীনদের মাঝে তৈরি হয় বিরোধ, এমনকি আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়। আরএস জরিপ হওয়ার কারণে অনেক ভূমিহীনের বন্দোবস্ত পাওয়া খাসজমি তখন সরকারের রেকর্ডে ১নং খতিয়ানে* [২২] *চলে আসে। আবার, অনেক সময় দেখা যায় যে, ভূমিহীনরা কোনো জমি পেয়েও নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়; কারণ, প্রভাবশালীদের চাপে ওই জমিতে তারা বসবাস করতে পারে না"।*

নীতিমালার বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে একজন উন্নয়নকর্মী বলেছেন, *"জোতদার ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের জন্য প্রকৃত ভূমিহীনরা বরাবরই খাসজমি পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কোথাও নতুন কোনো চর জেগে উঠলে সেখানেই ভূমিদস্যুরা নিজেদের নাম বদল করে ভূমিহীন সেজে জমির মালিক হয়ে যাচ্ছেন। ভূমিহীনদের সরকার জমি দিয়ে কবুলিয়াত* [২৩] *সম্পাদন করেছে, তারা ভোগ দখল করছে। জোতদারেরা আবার এওয়াজ দলিল* [২৪] *করেছে। এই দলিলের মাধ্যমে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে ফেলেছে। নিঃশর্ত যে দলিল সেটি তার নামে রেকর্ডকৃত এবং খতিয়ানও তার নামে। অন্যদিকে, ইউনিয়ন ও উপজেলাপর্যায়ে যে বাছাই কমিটি আছে, সেখানেও জোতদারেরা ঢুকে পড়ছে। সুবর্ণচর এলাকায় ভূমিহীন বাছাই কমিটির যে প্রধান তার ৮/১০টা জমি আছে; যার পরিমাণ শতাধিক একর হবে। প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা ভূমিহীন সেজে জমির মালিক হচ্ছেন বারবার। এ এলাকায় একটা ইকোনমিক জোন হবার কথা। কম দামে জমি পাওয়ার ফলে দেদারছে জমি কিনছে কোম্পানিগুলো। এরই মধ্যে গ্লোব কোম্পানি, আল-আমিন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, পারটেক্স গ্রুপ এলাকাটাকে ইকোনমিক জোন করে তুলেছে। এলআরপি* [২৫] *নামে*

---

[২০] সিএস (ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে) সম্পন্ন হওয়ার সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর এই জরিপ পরিচালিত হয়। জমির অবস্থা, প্রকৃতি, মালিক, দখলদার ইত্যাদি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আরএস (রিভিশনাল সার্ভে) জরিপ সম্পন্ন করা হয়।

[২১] 'তফসিল বা সিডিউল বা চৌহদ্দি' শব্দগুলো একই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ তফসিল বা সিডিউল বা চৌহদ্দি হলো—জমির পরিচিতিমূলক বিস্তারিত বিবরণ। কোনো জমির পরিচয় প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির চতুর্দিকের অবস্থান, জমির পরিমাণ ইত্যাদি তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ।

[২২] ১নং খতিয়ানে বাংলাদেশ সরকারের খাসজমিসম্পর্কিত তথ্য ও পরিমাণ কালেক্টরের নামে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ সরকারি সম্পত্তি বিধি অনুযায়ী খতিয়ান ১-এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি খাসজমি (বারকাত, জামান, ও রায়হান, ২০০৯)।

[২৩] 'কবুলিয়াত' হলো—সরকার কর্তৃক কৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব প্রজা কর্তৃক গ্রহণ করে খাজনা প্রদানের যে অঙ্গীকারপত্র দেওয়া হয়।

[২৪] যেকোনো সম্প্রদায়ের বা একই সম্প্রদায়ের বা একই বংশের বা কোনো ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তির সহিত তাদের লপ্ত ও সুবিধামতো একের ভূমি অপরকে দিতে পারেন অর্থাৎ পরস্পর এওয়াজ পরিবর্তন করতে পারেন। এই দলিল অবশ্যই রেজিস্ট্রি হতে হবে। এওয়াজ পরিবর্তন দলিলের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হলো: ক এর জমি খ এর বাড়ীর নিকটবর্তী এবং খ এর জমি ক এর বাড়ির নিকটবর্তী। উভয়ের জমিই উভয়ের বেলপ্ত। কাজেই ক তার জমি খ-কে এবং খ তার জমি ক-কে দিয়ে উভয়ে একটি দলিল সম্পাদন করে রেজিস্ট্রি করে নিল। একেই এওয়াজ পরিবর্তন দলিল বলে। এই দলিলের কেউ প্রিয়েমশান করতে পারে না।

[২৫] বাংলাদেশ সরকার চরের বাসিন্দাদের উন্নত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির লক্ষ্য নিয়ে উপকূলীয় চরকে উৎপাদনশীল মানববসতির আওতায় আনতে চর অঞ্চলগুলোতে যে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত দুর্বলতা রয়েছে, তা

পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটা প্রকল্প আছে এখানে। এই প্রকল্পের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্নভাবে ভূমি উন্নয়নের নামে ভূমিহীনদের দখলে থাকা খাসজমি দখল করছে এবং সেখান থেকে ভূমিহীনদের পুর্নবাসন না করেই তাদের উচ্ছেদ করছে। মূলত, এ সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে নীতিমালার আন্তঃসমন্বয়ের অভাবে। এসব অনিয়ম বন্ধে বাছাই কমিটিকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। ভূমিহীনদের জন্য কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে, যেন একজন ভূমিহীন একবারের বেশি জমি না পায়।"

এ বিষয়ে অন্য একজন উন্নয়ন কর্মী বলেছেন, *"নীতিমালায় ভালো দিক থাকলেও সমস্যা হচ্ছে এর যথাযথ বাস্তবায়নে। উপজেলা বাছাই কমিটিতে নানা সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব; এই প্রভাবের কারণে সঠিক ভূমিহীন নির্বাচন ব্যাহত হচ্ছে। সরকার খাসজমি বন্দোবস্ত দিয়ে অনেক সময় দখল বুঝিয়ে দেন না। আর প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের কারণে এসব জমির দখল পাওয়া বেশ কষ্টকর বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিহীনদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয় বা ইউনিয়ন ভূমি (তহসিল) কার্যালয় এক্ষেত্রে খুব জোরালো ভূমিকা রাখছে না; এর বড় কারণ হলো নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া। অন্যদিকে, নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে কোনো বিধবা মহিলার যদি সক্ষম পুত্র সন্তান না থাকে তবে তিনি ভূমিহীন হওয়া সত্ত্বেও খাসজমি পাবার যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচ্য হবেন না। কিন্তু, এক্ষেত্রে যদি কন্যা সন্তান আছে এমন বিধবা নারীও খাসজমি পেতেন তবে সমাজে একদিকে যেমন তার অবস্থান দৃঢ় হতো, অন্যদিকে জমিটি তার দারিদ্র্য বিমোচনেও সহায়ক হতো। আদিবাসী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অন্য সব বিষয়ের মতো খাসজমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে। কাজেই এই জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে খাসজমি বিতরণ করা আবশ্যক। ভূমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে ডেটাবেজ বা তথ্য-উপাত্ত থাকাটা জরুরি। এতে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে। খাসজমি যখন চিহ্নিত থাকবে তখন তা বিতরণ হবে সহজতর। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই জমি চিহ্নিত করতে হবে এবং লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত জমিকে নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালা বাস্তবায়নে নানা সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই জানেন যে, নীতিমালা না মানলেও তেমন কোনো অসুবিধাই নেই। এ কারণে অতিসত্ত্বর কৃষি খাসজমিসংশ্লিষ্ট নীতিমালাকে আইনে রূপান্তর করা প্রয়োজন"।*

অন্যদিকে, নীতিমালার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও ভূমিহীনদের ভোগান্তি সম্পর্কে সাংবাদিকেরা মন্তব্য করেন যে, কৃষি খাসজমি নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা খাসজমির বেদখল হওয়া। দখলমুক্ত করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বরাদ্দ দেয়াটা বড় চ্যালেঞ্জ। একজন সাংবাদিক বলেন, *"গত ১৫/ ১৬ বছর ধরে খুলনার*

হ্রাস করতে 'ল্যান্ড রিক্লেমেশন প্রজেক্ট বা জমি পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (এলআরপি)' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এই প্রকল্পটি ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) বাস্তবায়ন করেছে।

ডুমুরিয়াতে খাসজমি বিতরণ বন্ধ রয়েছে। যার ফলে হাজার হাজার একর খাসজমি প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। এখানে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জমি রয়েছে। যেমন– রোডস্ এ্যান্ড হাইওয়ে বা সড়ক ও জনপথ-এর জমি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ইত্যাদি। সম্প্রতি পত্রিকায় আমি প্রতিবেদন করেছি, ডুমুরিয়া উপজেলাতেই হাজার একর জমি আছে, যেগুলো অবৈধ দখলে। ওই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই তদন্ত কমিটি সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে এবং তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন করেছে। কিন্তু, প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ছিল তা এখনো নেয়া হয়নি। আর, না নেয়ার কারণ হলো রাজনৈতিক প্রভাব।”

ভূমি অধিকার কর্মীদের মতে, মাঠপর্যায়ে যথাযথ প্রচার-প্রচারণার অভাবে মানুষ খাসজমির প্রকৃত হিসাব ও বণ্টন সম্পর্কে জানতে পারে না। আবার, নীতিমালা সম্পর্কে ভূমিহীনদের সঠিক ধারণা নেই বলে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে। এছাড়া, ইউনিয়নপর্যায়ে যে বাছাই কমিটি আছে তাতে রাজনৈতিক প্রভাব থাকার কারণে ভূমিহীন বাছাইপ্রক্রিয়াও সুষ্ঠু হচ্ছে না। এজন্য ভূমিহীনদের মধ্য থেকেও যদি কোনো প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য থাকতেন তবে তিনি অন্তত তাদের অধিকারের কথাগুলো বলতে পারতেন। আবার, ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দ দেয়ার পরও তার দখল নিতে পারে না ভূমিহীনরা, কারণ, সরকার থেকে বন্দোবস্ত দেয়া হলেও তা দখলে থাকে জোতদারদের। আর, জোতদাররা রাজনৈতিক ও স্থানীয়ভাবে এতটাই প্রভাবশালী যে, ভূমিহীনদের পক্ষে জমির দখল নেয়া হয়ে পড়ে অসম্ভব। কাজেই, সরকারকে শুধু খাসজমির বন্দোবস্ত দিলেই হবে না বরং, ভূমিহীনরা যাতে তা ভোগদখল করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে সমান গুরুত্ব দিয়ে। খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার পর সরকারিভাবে মাইকিং করে এর প্রচার করতে হবে, যেন সবাই জানে যে জমিটি কার; তারপর, জমি পূর্ণ দখলমুক্ত করে ভূমিহীনদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষি খাসজমি হিসেবে এমন জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে, যা কৃষিকাজের জন্য তো উপযুক্ত নয়ই, বরং অন্য কাজের জন্যও উপযোগী নয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক জায়গায় শ্মশানের জমি খাসজমি হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

> *“নীতিমালা আছে, বাস্তবায়ন নেই। জমি বরাদ্দ দেয়া হলেও তা ভূমিহীনদের দখলে নেই। অনিয়ম করে প্রভাবশালীরা আরো ক্ষমতাবান হচ্ছে, আরো বেশি নিঃস্ব হয়ে পড়ছে প্রান্তিক গোষ্ঠী। ১০ শতাংশ ক্ষেত্রেও নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।”*
>
> *—ভূমি অধিকার কর্মী, মধুপুর, টাঙ্গাইল*

কৃষি খাসজমি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থাৎ খাসজমিকে প্রভাবশালীদের দখলমুক্ত করতে ও ভূমিহীনরা যাতে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির দখল বুঝে পায় তা নিশ্চিতকরণে উন্নয়ন কর্মীরা নিজ নিজ উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে একজন উন্নয়ন কর্মী বলেছেন, *“আমাদের এলাকায় একজন নারী তার স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় যৌথ বন্দোবস্তের মাধ্যমে ১ একর জমি*

বরাদ্দ পান। কিন্তু, সেই জমির দখল বুঝে পাননি। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর ওই নারীর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। আমরা তখন ওই নারীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে তার পাশে দাঁড়াই এবং তদন্ত করে দেখা যায় যে, জমিটি ওই নারীর পরিবারকে বন্দোবস্ত দেয়ার আগে আরো ১০ জনকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। জমিটির তিনটি ভুয়া দলিল হয়েছে, যার কোনো দাগ নম্বর[২৬] নেই। যারা প্রভাবশালী তারা স্বাভাবিকভাবেই জমিটি নিজেদের দখলে রেখেছিল। আমরা তখন সংস্থার সবাই মিলে এবং তিন গ্রামের নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সার্ভেয়ার ডেকে ওই নারীর পরিবারকে জমিটি বুঝিয়ে দিই। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ লোকজন আমাদের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করে। আমরা তখন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে (তহসিলদার) কাগজপত্র দেখালাম। যেহেতু আমরা লিগ্যাল, তাই রায় আমাদের পক্ষেই এল এবং শেষ অবধি ওই পরিবার জমিটি বুঝে পেয়েছে।"

জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনায় কৃষি খাসজমি নীতিমালা বাস্তবায়নসম্পর্কিত নানা সমস্যার চিত্র পাওয়া গেছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বড় অংশ ছিলেন ভূমিহীন কৃষক এবং তারা প্রত্যেকেই হয় খাসজমি পাবার জন্য আবেদন করেছেন, নয়তো কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পেয়েছেন। তাদের মতে, খাসজমির বন্দোবস্ত পাওয়া ও দখলের মধ্যে অসম সম্পর্ক বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ হয়তো নীতিমালায় উল্লিখিত বিধি অনুসারেই খাসজমির বন্দোবস্ত পেয়েছেন, কিন্তু দখলে যেতে পারছেন না প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের জন্য। আবার, কোথাও কোথাও খাসজমি ভূমিহীনদের দখলে থাকলেও তারা সরকারিভাবে ওই জমির কোনো বন্দোবস্ত পাননি। ফলে, প্রভাবশালীরা যখন ওই জমি জোরপূর্বক তাদের কাছ থেকে দখল করতে চায়, তারা কাগজপত্র না থাকায় আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন না। তারা আরো বলেন যে, খাসজমি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হলেও সে আবেদনের যাচাই-বাছাইপ্রক্রিয়ায় অনেক বেশি সময় ক্ষেপণ হয়, আর সেই সুযোগে প্রভাবশালীরা জমি অবৈধভাবে নিজ দখলে নিয়ে যায়। আবার, উপজেলা ও ইউনিয়ন বাছাই কমিটিতে ভূমিহীনদের কোনো প্রতিনিধিকে রাখা হয় না, সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আধিপত্য বজায় থাকে। একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, *"আমরা প্রত্যেকেই ভূমিহীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এলাকার ভূমিহীন বাছাই কমিটিতে কে বা কারা আছেন তা আমরা জানি না। আমাদের ভূমিহীন সমিতির সভাপতিই এ বিষয়ে কিছু জানেন না—আমরা জানব কী করে? কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির যে সভা হয়, সে বিষয়েও কিছু জানানো হয় না"*। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাছাই কমিটি সম্পর্কে ভূমিহীনদের ধারণা নেই বলে কমিটির লোকেরা অনিয়ম করার সুযোগও বেশি পাচ্ছে। কমিটিকে তার কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধও থাকতে হচ্ছে না। ফলে, খাসজমি বরাদ্দের জন্য মনোনয়ন পাচ্ছে হচ্ছে অযোগ্য লোক।

---

[২৬] যখন জরিপ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় তখন মৌজা নকশায় ভূমির সীমানা চিহ্নিত বা শনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ভূমি খণ্ডকে আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়া হয়। আর এই নম্বরকে দাগ নম্বর বলে। মূলত, দাগ নম্বর অনুসারে একটি মৌজার অধীনে ভূমি মালিকের সীমানা খুঁটি বা আইল দিয়ে সরেজমিন প্রদর্শন করা হয়। দাগকে কোথাও কিত্তাও বলা হয়।

> *"উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটিতে একজন সক্রিয় ভূমিহীন নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকা জরুরি। নারীদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। কাজেই, কমিটিতে একজন নারী সদস্য থাকলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হতো।"*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী, ডুমুরিয়া খুলনা*

নীতিমালায় রয়েছে যে, খাসজমি ইজারা দেয়া যাবে না। কিন্তু, প্রভাবশালীরা নিয়মবর্হির্ভূতভাবে খাসজমি দখল করে তা বিভিন্ন কাজের জন্য ইজারা দিচ্ছে, আবার ভাড়াও দিচ্ছে। আর এই ভাড়া আবার দেয়া হচ্ছে ভূমিহীনদের কাছেই। অর্থাৎ, যে খাসজমির প্রকৃত দাবিদার ভূমিহীন কৃষক তারা তা পাচ্ছেন বটে, কিন্তু ভাড়ার বিনিময়ে। নীতিমালায় বলা আছে যে, কৃষি খাসজমি কোথায় কতটুকু আছে তার প্রচার করতে হবে এবং বণ্টনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে জানতে পারে। কিন্তু, বাস্তব অবস্থা এর পুরো উল্টো। এছাড়াও, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্তভাবে খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে হলে তাদের ঘুষ দিতে হয়। স্থানভেদে এই ঘুষের টাকার পরিমাণ কমবেশি হয়। এ প্রসঙ্গে টাঙ্গাইলের মধুপুরে দলগত আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, *"প্রতি শতাংশ খাসজমি পেতে আমাদের তিন হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়"*। একইভাবে, ভূমি অফিসে গেলেও ধাপে ধাপে তাদের ঘুষ দিতে হয়।

> *"ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। জেলা ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস কিংবা ইউনিয়ন ভূমি অফিস যেখানেই সেবা নিতে যাই না কেন, সেখানেই আমাদের ঘুষ দিতে হয়। তবে জেলা ভূমি অফিসে গেলে ঘুষ একটু বেশিই দিতে হয়। যেখানে ৫ হাজার টাকা দেয়ার কথা, সেখানে ৫০-৬০ হাজার টাকাও খরচ করতে হয় কাজ হাসিলের জন্য।"*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী, মধুপুর, টাঙ্গাইল*

খাসজমি বণ্টন ও বন্দোবস্তের পুরো প্রক্রিয়াতেই আদিবাসীদের কোনো অন্তর্ভুক্তি থাকে না। অংশগ্রহণকারীদের একাংশ বলেছেন, খাসজমি যখন বন্দোবস্ত দেয়া হয় তখন বাঙালি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা তা পান না। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর যখন ভূমিহীনরা আবেদন করেন, তখন তাদের মধ্যে থাকেন আদিবাসীরাও কিন্তু, আদিবাসীরা খাসজমি বন্দোবস্ত পান না, বাদ দেয়া হয় তাদের আবেদনপত্র।

২.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ

ভূমিহীনরা কি প্রকৃত অর্থেই খাসজমির বন্দোবস্ত পাচ্ছেন?[২৭]

দীর্ঘদিন ধরে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের চরমজিদ মৌজার খাসজমিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভূমিহীন ও নদীভাঙ্গনের শিকার জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছিল। কিন্তু, ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের জমি বরাদ্দ দেয়ার নাম করে চরমজিদের ভূমিহীনদের (৮৯৬টি পরিবারকে) তাদের দখলকৃত খাসজমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদের সময় তৎকালীন জেলা প্রশাসক তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, অন্য এলাকার খাসজমিতে পুনর্বাসনের পর তিন মাসের মধ্যে তাদের নামে জমির বন্দোবস্ত করে দেয়া হবে। তবে সে প্রতিশ্রুতি এখনো বাস্তবে রূপায়িত হয়নি; উপরন্তু, ভূমিহীনরা আবারো উচ্ছেদের শঙ্কায় দিনাতিপাত করছে।

বিগত ১০০ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভূমিহীন ও নদীভাঙ্গনে জমি-ভিটেমাটি হারানো ভূমিহীনরা ২ নং চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ মৌজায় বসতি স্থাপন করেছেন। মোট ৮৯৬টি ভূমিহীন পরিবার ছিল। সেখানে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তারা শান্তিপূর্ণভাবেই বসবাস করে আসছিলেন এবং তাদের জীবনযাত্রার মানেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। তারা যেখানে বসবাস করতেন সেটা ছিল খাসজমি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ওই এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা ভূমিহীনদের দখলে থাকা খাসজমি বরাদ্দ বা বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করে। আবেদনের ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়ার পর তারা সেখানে ভূমিহীনদের প্রতিরোধের মুখে খাসজমি দখল নিতে পারেনি। পরে মুক্তিযোদ্ধারা জেলা প্রশাসক ও পুলিশের সহায়তা নিয়েও কিছু করতে না পেরে, সরাসরি সেনাবাহিনীর সহযোগিতা কামনা করে। পরবর্তীকালে তারা (মুক্তিযোদ্ধারা) সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ভূমিহীনদের উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রেও ভূমিহীনরা তাদের জমির দখল না ছাড়তে অনড় ছিল। তাদের একটাই দাবি ছিল, তাদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত তারা এই ভূমি ছাড়বে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে তৎকালীন জেলা প্রশাসক ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদেরকে ওই জায়গা থেকে চলে যেতে বলেন। উচ্ছেদের পরপরই জেলা প্রশাসক উচ্ছেদকৃত ৮৯৬টি ভূমিহীন পরিবারকে দক্ষিণ চরমজিদ ও চরমজিদ মৌজায় (৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড) বসবাস করার জন্য জমি প্রদান করেন এবং তা তিন মাসের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু, আজ অবধি ভূমিহীনরা কোনো ধরনের বন্দোবস্ত পায়নি। 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭' অনুযায়ী এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা হলো যেসব ভূমিহীনের ন্যূনতম ২ শতাংশ খাসজমি

---

[২৭] গবেষকদল চরমজিদ (সুবর্ণচর, নোয়াখালী) এলাকার ভূমি অধিকার কর্মী ও একদল ভুক্তভোগী ভূমিহীনের সাথে আলোচনা করে ঘটনাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারে।

আছে, তাদের নামে বন্দোবস্ত ও কবুলিয়াত সম্পাদনের পাশাপাশি যাদের ঘর নেই তাদের বাড়ি করে দেয়া হবে। কিন্তু, উপরোল্লিখিত ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায় নীতিমালার বাস্তবায়ন হচ্ছে না, চরমজিদে বসবাসরত ভূমিহীনদের জমি বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে সরকার 'চর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট বা চর উন্নয়ন ও বন্দোবস্ত প্রকল্প (সিডিএসপি)'-এর মাধ্যমে চরমজিদে বসবাসরত ভূমিহীন পরিবারগুলোকে প্লট-টু-প্লট সার্ভে বা জরিপ করে টোকেন দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিহীনরা সিডিএসপি-৪ প্রকল্পে ভূমি বন্দোবস্তের জন্য চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত হন। ভূমিহীনরা এখন পর্যন্ত সেই জমিতে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন এবং তাদের দখলকৃত জমিতে ফসল ফলিয়ে অতিকষ্টে পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু, কয়েক বছর ধরে সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানাভাবে হয়রানি করে আসছে। ওই প্রতিষ্ঠান কয়েক দফায় তাদের ওপর পুলিশ দিয়ে লাঠিচার্জ করিয়েছে এবং ভূমিহীন ৪ জন নারী-পুরুষকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়াও ভূমিহীনদের কোনোরকম ক্ষতিপূরণ কিংবা পুনর্বাসন ছাড়াই ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। এই অবস্থায় ভূমিহীন শতশত পরিবার আবারও উচ্ছেদের সম্মুখীন। ইতিমধ্যে গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সুবর্ণচর উপজেলার ভূমি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৮৯৬টি পরিবারের (এখন ১,৫০০ ভূমিহীন পরিবার) মধ্যে ১২টি ভূমিহীন পরিবারকে প্রাথমিকভাবে উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময় নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাসজমি দখলের জন্য জমি পরিমাপ করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চরমজিদের ভূমিহীনদের দাবিগুলো হলো: (ক) ৭ নং চরবাটা ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের চরমজিদ মৌজায় বসবাসরত অসহায় ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করে সরজমিনে তদন্তের মাধ্যমে এখানে বসবাস করার সুযোগ এবং খাসজমির বন্দোবস্ত করে দিতে হবে; (খ) অন্য কোথাও পুনর্বাসন না করে এবং সেখানে ঘর না তুলে দেয়া পর্যন্ত ভূমিহীনরা তাদের ভোগদখলকৃত খাসজমি ছাড়বে না; (গ) তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে; (গ) ভূমিহীনদের যেখানে পুনর্বাসন করা হবে সেখানে তাদের তৎক্ষণাৎ জমির বন্দোবস্ত দিতে হবে; এবং (ঘ) ভূমিহীনদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। চরমজিদের ভূমিহীন পরিবারের এসব দাবি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভূমিহীনরা খাসজমি ভোগদখল করে বসবাস করছে। নীতিমালায় বলা আছে, যারা (ভূমিহীন) খাসজমিতে দখলে থাকবে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না; তাদেরকে বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭'-এর ১৯ ও ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আবেদনের ভিত্তিতে খাসজমি পাওয়া সাপেক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই

১৫ দিনের মধ্যে এক টাকা সেলামির বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করবেন এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলে দেবেন। কিন্তু, সুবর্ণচরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন যে, যারা খাসজমিতে ইতিমধ্যে বসবাস ও চাষাবাদ করছেন, তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি নিজে মাঠে গিয়ে ভূমিহীনদের তাদের ভোগদখলকৃত খাসজমি বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। সরকারি কর্মকর্তার এহেন আচরণ আমাদের সংবিধানে বিধৃত "সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য"সংশ্লিষ্ট ২১ (২) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের শামিল।

নীতিমালার ৪ (খ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি (কমিটির আহ্বায়ক জেলা প্রশাসক) তার সঠিক দায়িত্ব পালন করেন নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, জেলা কমিটি ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমিসংক্রান্ত সব অনিয়ম সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে তৎকালীন জেলা প্রশাসক তাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

নীতিমালার ৫ (খ) অনুচ্ছেদে উপজেলা বা থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কয়েকটি দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো থানার আওতাধীন এলাকায় কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও উদ্ধার করা এবং ভূমিহীন বাছাই করে তার একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা এবং বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন দখল বুঝিয়ে দেয়া। কিন্তু, বাস্তবে এই ক্ষেত্রে তা হয়নি।

নীতিমালার ৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের কাছে লিখিতভাবে জানাবেন। সদস্যসচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করবেন এবং এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু, এই ঘটনায় জেলা খাসজমিবিষয়ক কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেননি। এসব দরিদ্র মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতা ও জবাবদিহিহীনতার সমতুল।

কৃষি খাসজমির নীতিমালাবিরুদ্ধ হস্তান্তরের সুযোগ নিল ভূমিদস্যু [২৮]

গ্যাংরাইল নদীতে গড়ে ওঠা চরের খাসজমিতে দীর্ঘদিন ধরে ভূমিহীন কৃষকেরা ধান ও মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। কিন্তু, ভূমিদস্যু কামালের থাবায় সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল নিমেষেই। প্রথমত, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের অর্থের লোভ দেখিয়ে সামান্য মূল্য পরিশোধ করে কিছু জমি গ্রাস করে নিলেও পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী খাসজমির একটা বিরাট অংশ

---

[২৮] গবেষকদল সাহস ইউনিয়নের বাঁশতলা মৌজা (ডুমুরিয়া, খুলনা) এলাকার ভূমি অধিকার কর্মী ও খাসজমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল ভুক্তভোগী ভূমিহীনের সাথে আলোচনা করে ঘটনাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারেন।

জোরপূর্বক দখল করে নেয় ওই ভূমিদস্যু। এক্ষেত্রে, স্থানীয় ভূমি অধিকার সংগঠনের লোকজন ওই খাসজমিগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে ভূমিদস্যু কামাল তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। এসত্ত্বেও, সংগঠনের লোকজন দখলকৃত কৃষি খাসজমিগুলো ভূমিদস্যুর হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সময়টা ১৯৭৯ সাল। নদীর এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে। এই প্রক্রিয়ায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবহমান গ্যাংরাইল নদীর বাঁশতলা মৌজার পশ্চিম অংশ ভেঙ্গে নদীর পশ্চিম পাড়ে চর জেগে ওঠে। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ভরাটকৃত খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত করে দেয়। ওই জমিতে প্রায় ৬০ জন ভূমিহীন কৃষক ধান আবাদ করে ও মাছ চাষ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন।

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে খুলনা নিবাসী জনৈক মোস্তফা কামাল আলমগীর পার্শ্ববর্তী মাগুরখালী ইউনিয়নের শিবনগর মৌজার মিশনারি প্রতিষ্ঠানের কিছু জমি কিনে নেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর ওই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পার্শ্ববর্তী ভূমিহীনদের খাসজমির ওপর। প্রাথমিকভাবে সে স্বয়ংক্রিয় ইটভাটা নির্মাণের কথা বলে (পরবর্তীতে মাছ চাষ করা হয়)। প্রায় ২০ একর কৃষি খাসজমি এবং ওই সংলগ্ন রেকর্ডীয় জমি বন্দোবস্ত পাওয়া ১০ জন ভূমিহীন কৃষকদের কাছ থেকে বিঘা প্রতি ৪ লাখ টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কেনে এবং তাদের কিছু টাকা পরিশোধও করে। পরবর্তীতে, অন্য জমির মালিকদের সাথে কোনো কথা না বলেই স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আরও কিছু খাসজমি জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং প্রায় ৪০ একর জায়গার চারপাশে বাঁধ নির্মাণ করে সেখানে পানি উঠিয়ে চিংড়ি চাষ শুরু করে। ভূমিহীন কৃষকেরা অসংগঠিতভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে এ কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও সফল হননি।

ভূমিদস্যু মোস্তফা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় পানি উত্তোলন করে মাছ চাষ করার ফলে সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণে পার্শ্ববর্তী খাসজমি ও রেকর্ডীয় [২৯] জমির মালিকেরা জমিতে ঠিকভাবে ধান চাষ করতে পারছেন না। এ বিষয়ে কৃষকেরা প্রতিবাদ করলে মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ নিয়ে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে; যেকোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। ভূমিহীন সংগঠন তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে এবং এর একটি সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে ভূমিহীন

---

[২৯] 'রেকর্ডীয় জমি বা ভূমি রেকর্ড' হলো—সরেজমিনে জরিপ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভূমি রেকর্ড তৈরির প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। খসড়া গ্রাম (মৌজা) মানচিত্রই হলো ভূমি রেকর্ডের ভিত্তি। এই মৌজা ম্যাপ বা মানচিত্র প্রণয়নকে কিস্তওয়ার বলা হয়। এই মানচিত্র সাধারণত ১৬ ইঞ্চি = ১ মাইল স্কেলে প্রণয়ন করা হয়। প্রথমে রেকর্ড তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় প্রকৃত অবস্থা দেখিয়ে প্লটের পর প্লট ভিত্তিতে। একে খানাপুরিও বলা হয়। এতে জমির মালিকানা, আয়তন, জমির শ্রেণি, মালিকানায় অংশীদারির বিবরণ ও অবস্থা লিপিবদ্ধ থাকে। আর এগুলো খসড়া নামে একটি তালিকায় দেখানো হয়।

কৃষকদের কৃষি খাসজমি উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে। এই খাসজমি হস্তান্তরের কারণে যেসব ক্ষতি হয়েছে তা হলো: (ক) ফসলের উৎপাদন ব্যাহত; (খ) ঘেরের মাছ চাষে ক্ষতি হওয়া প্রতি বিঘাতে সর্বনিম্ন ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৫০ হাজার টাকা (২০২০ সালের ঘটনা); এবং (গ) গ্যাংরাইল নদীর পাড়ে ভূমিহীন নারীরা তাদের গরু-ছাগল চড়াতে পারে না। কেউ ভূমিদস্যুর জায়গা দিয়ে গেলে তাদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে চটচটিয়া কুমারঘাটা ভূমিহীন সংগঠনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনোভাবেই খাসজমির অবৈধ দখল ও বিক্রি মেনে নেয়া হবে না। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে খাসজমি উদ্ধার করবেন এবং ভূমিদস্যু মোস্তফাকে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। এরই ধারাবাহিকতায়, সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভূমিহীন সংগঠনের লোকজন একত্রিত হয়ে বাঁধের ভেতরের জমি মাপজোখ করে ৪ একর ভূমি পুনঃর্দখল করেন। ইতিমধ্যে দালালদের মাধ্যমে ঘটনা জানতে পেরে ভূমিদস্যু কামাল ভূমিহীনদের পুনরায় বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়।

এ অবস্থায় ভূমিহীন সংগঠনগুলো ভূমিহীন কৃষকদের অবৈধভাবে দখলকৃত কৃষি খাসজমি পুনঃর্দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভূমিহীন কৃষকদেরও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন। ভূমিহীনরা ভয় পাচ্ছেন। নিজেরা করিসহ অন্যান্য সংগঠন সাহস জুগিয়ে এবং পাশে থেকে সহযোগিতা দিয়ে কৃষি খাসজমি পুনঃর্দখলের কাজ করছে, পাশাপাশি চেষ্টা চলছে ভূমিদস্যুকে এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিহীনদের দাবি: (ক) ভূমিদস্যু উচ্ছেদ করা; (খ) খাসজমি যেগুলো ভূমিদস্যুর দখলে তা উদ্ধারের সুব্যবস্থা করা; (গ) এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া; এবং (ঘ) ওইসব গ্রামে যাতে ভূমিহীনরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।

সবশেষ তথ্যানুযায়ী শিবনগর, কুমারঘাটা, উলা ও চটচটিয়া গ্রামের ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা আইনের আশ্রয় নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিরোধপূর্ণ ওই এলাকা সরেজমিনে দেখে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং সেই তদন্ত রিপোর্টের আশায় ভূমিহীনরা অপেক্ষা করছেন যাতে দখলকারী ভূমিদস্যুর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করা যায়। ভূমিহীন সংগঠনের লোকদের আশা যে, একদিন না একদিন ভূমিদস্যু মোস্তফা কামাল আলমগীর তাদের দখলকৃত কৃষি খাসজমি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়িত হবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, খাসজমি উত্তরাধিকারী সূত্র ব্যতীত হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু, এই কেসে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। এখানে কিছু খাসজমি কজন ভূমিহীন বিক্রি করার জন্য হস্তান্তর করেছে ভূমিদস্যু কামালের কাছে, যা নীতিমালা অনুসারে অবৈধ। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭-এর অনুচ্ছেদ ৭.০-তে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, 'কোনো ভূমিহীনকে বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকারসূত্র ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কারো নিকট

হস্তান্তর করা যাবে না। কেউ এরূপ করলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হবে।' তাই শিবনগরে যেসব ভূমিহীন তাদের খাসজমি ভূমিদস্যু কামালের কাছে হস্তান্তর করেছে তা নীতিমালা পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ভূমিহীন মানুষেরা তাদের স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায় দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সাথে আপোস করেছে।

এ ছাড়াও, নীতিমালার ৪ (খ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জেলা কমিটি ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমিসংক্রান্ত সব অনিয়ম সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। নীতিমালার ৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের কাছে লিখিতভাবে জানাবেন। সদস্যসচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করবেন এবং এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু এই কেসে, জেলা খাসজমিবিষয়ক কমিটি এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেননি।

অনুচ্ছেদ ৫ (খ) (৮) অনুযায়ী বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি-না সে সম্পর্কে তদারক ও শর্তভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসকের কাছে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু, শিবনগরে অবৈধভাবে খাসজমি দখল হওয়া সত্ত্বেও থানা বা উপজেলা কমিটির কেউই এখন পর্যন্ত সরেজমিনে তদন্ত করতে আসেননি। শুধু ভূমিহীনদের আশ্বাসই দিয়ে গেছেন।

নীতিমালার ৩০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোনো বন্দোবস্তগ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে থানা/উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসাবে পুনঃগ্রহণ করে খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু, শিবনগর খাসজমি বন্দোবস্তগ্রহীতা কিছু দালাল ভূমিদস্যু কামালের কাছে টাকার লোভে বিক্রির উদ্দেশ্যে তাদের কিছু খাসজমি হস্তান্তর করে এবং বিনিময়ে তারা কামালের কাছ থেকে কিছু অগ্রিম টাকাও পায়, যা নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

২.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং

'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-কে ৪টি নির্দেশকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্কোরিং করা হয়েছে। এই ৪টি নির্দেশক হলো– (১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব। প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই

‘০’ থেকে ‘৫’ এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে: যেখানে ‘০’ নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ দশা, অপরদিকে ‘৫’ স্কোর মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। সবশেষে এই ৪ টি নির্দেশকের প্রতিটি স্কোরের একটি গড়ও করা হয়েছে।

এই ৪টি নির্দেশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দশা দেখা যাচ্ছে ‘প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য’—এই নির্দেশকে (স্কোর: ২.৩)। তারপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে একই স্কোর-মান নিয়ে আছে যৌথভাবে ‘অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা’ ও ‘সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব’—এই দুইটি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৪)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে ‘সাংঘর্ষিকতা’ (স্কোর: ৩.৮) নির্দেশকটি। লেখচিত্র ৭-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.৮।

লেখচিত্র ৭: স্কোরিং—‘কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭’-এর আইনি সমস্যা
(‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.২

অন্যদিকে এই নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশকের মাধ্যমে: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। আগের মতোই ‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে, এবং সবশেষে করা হয়েছে একটি গড়। ‘০’ অর্থ সবশেষে মন্দ অবস্থা, ‘৫’ নির্দেশ করেছে সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

‘কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭’-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে— ‘জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি’—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৯। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো ‘স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব’ (স্কোর, ১.১)। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে ‘রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন’, ‘সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর’ এবং ‘সমন্বয়হীনতা’—এই তিনটি নির্দেশক, যাদের প্রত্যেকেরই স্কোর ১.২। বাকি তিনটি নির্দেশকের অবস্থাও ভালো নয় মোটেও: ‘জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি’ (স্কোর ১.৯), ‘দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা’ (স্কোর ১.৮) এবং ‘রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন’—এই নির্দেশকের স্কোর ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.৪ অর্থাৎ, মন্দ দশা যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতিগুলোর বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়ে কিছু মাত্রায় বেশি হলেও সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ৮-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো অছে।

লেখচিত্র ৮: স্কোরিং—‘কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭’-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
(“০” থেকে “৫”-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.৪

নীতিমালা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে নীতিমালার তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতিমালার সমস্যার গড় স্কোর: ৩.২, এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ১.৪)। আদর্শ স্কোর যদি ‘৫’ হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতিমালার সমস্যার স্কোর ৩.২ (৬৪% অর্জন) এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ১.৪ (মাত্র ২৮% অর্জন) (লেখচিত্র ৯)। ‘নীতিমালা’-র স্কোর স্পষ্ঠতই দেখাচ্ছে যে নীতিমালাও আদর্শ অবস্থার অনেক পেছনে আর ‘বাস্তবায়ন’ তার থেকেও বহু পেছনে।

লেখচিত্র ৯: স্কোরিং—'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

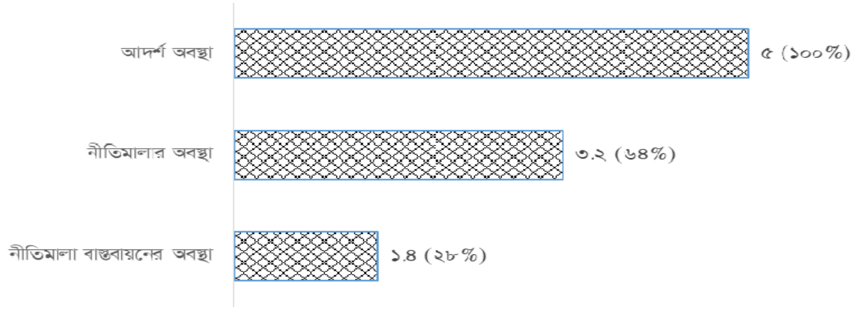

২.৮ সুপারিশমালা

আইনসংশ্লিষ্ট[৩০]

১) সুদীর্ঘ আড়াই দশক দেশে কৃষি খাসজমির ব্যবস্থাপনা, বিতরণ বা বণ্টন কার্যক্রম 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। সময়ের দাবি মেটাতে স্বাভাবিকভাবেই এই নীতিমালার যুগোপযোগী সংস্কার দরকার। গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এই নীতিমালা খাসজমিতে প্রান্তিক মানুষের, ভূমিহীন কৃষকের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসমর্থ্য। এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইন জরুরি।

২) বর্তমান নীতিমালায় *'বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর পরিবারকে খাসজমি পেতে হলে সেই নারীর সক্ষম পুত্র থাকতে হবে'* (অনুচ্ছেদ ১১-গ)—এই অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হতে হবে।

৩) ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকারের তালিকায় (অনুচ্ছেদ ১১) প্রান্তিক কৃষক, আদিবাসীসহ অন্যান্য ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করতে হবে। তৃতীয়

---

[৩০] কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭-এর ওপর পরিচালিত নিবিড়-গবেষণালব্ধ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো পাওয়া যাবে এখানে: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (চতুর্থ খণ্ড: কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত এবং অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা* ও বন্দোবস্ত)। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। পরিশিষ্ট ২-এ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোসহ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাটি সংযুক্ত করা হলো।

লিঙ্গের মানুষেরা খাসজমি পান না—এটি মানুষের অধিকারের সাথে দ্বন্দ্বাত্মক বিধায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের খাসজমি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪) পৌর এলাকায় কৃষি খাসজমির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং চিহ্নিত করার জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা।

৫) বেদখল জমি উদ্ধার এবং ভূমিহীনদের দখল বুঝিয়ে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য একটি কঠোর ও কার্যকর 'খাসজমি উদ্ধার ও বণ্টন আইন' প্রণয়ন জরুরি। প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা যেনো ঘুরেফিরে বারবার ভূমির মালিক না হতে পারেন সে জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।

বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট

১) খাসজমিসংশ্লিষ্ট হালনাগাদ ও সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সবার জন্য করতে হবে উন্মুক্ত; তথ্য প্রাপ্তি করতে হবে সহজতর।

২) খাসজামি প্রাপ্তির আবেদনের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য সহজ করা দরকার, অযথা কালক্ষেপণ যেন না হয় সে জন্য চাই নজরদারি।

৩) খাসজমির ধরন, অবস্থান, বিতরণ অবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তিগত অবস্থা ইত্যাদি সবধরনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি খাস ভূমি ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন।

৪) কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়টি যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে যেন প্রকৃত দাবিদারের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে চাই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। খাসজমি চিহ্নিতকরণের সমস্যাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলোতে (রেডিও, টিভি ও বাংলা দৈনিকসহ) প্রকাশ ও প্রচার করা এবং কোনো ধরনের কালক্ষেপন না করে তা তৃণমূলপর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি।

৫) ইউনিয়নপর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন ও তার কার্যপরিধি নির্ধারণ করা দরকার।

৬) সব পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য তদারকির প্রয়োজন; প্রয়োজন নারী, কৃষক এবং ভূমি অধিকার কর্মীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব।

৭) দরিদ্রবান্ধব, লিঙ্গবৈষম্যহীন ও ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়নবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান নীতিমালার সংশোধনী জরুরি; উন্নয়ন অংশীদার, অ্যাডভোকেট, আইনি পরামর্শদাতা, মহিলা অধিকার সংস্থা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নাগরিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারদের এ জাতীয় সংশোধন আরও জোরালো ও কার্যকরী উপায়ে করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

৮) প্রভাবশালীদের জমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় ভূমিহীন ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে কার্যকর চাপ সৃষ্টিকারী জোট। সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে, এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধের জন্য নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ। সংগঠিত সামাজিক চাপ প্রয়োগ ও নজরদারি ছাড়া লক্ষ্যগুলো থেকে যাবে অধরাই।

অধ্যায় ৩

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

সারকথা: বাংলাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ একর, যার সঠিক বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে অবদান রাখা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ। সরকার ১৯৯৫ সালের ৮ই মার্চ অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি প্রণয়ন করে, যা 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫' নামে অভিহিত। অথচ, অকৃষি খাসজমির প্রশাসনসম্পর্কিত পৃথক কোনো আইন নেই; নীতিমালা দিয়েই চলছে পুরো বিষয়টি।

নীতিমালার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা যেমন রয়েছে, তেমনি এর ব্যবহারিক সমস্যা প্রকট—এর অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাসজমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় নীতিমালাটি মোটেও সহায়ক হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ অকৃষি খাসজমি নথিভুক্তকরণ, পুনরুদ্ধার এবং বিতরণের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। অকৃষি খাসজমি শনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আসেনি সুসংহতরূপে। সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ ও জমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অনুপস্থিত। নীতিমালায় স্থান পায়নি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ জমির নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া। পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জমির যুগোপযোগী ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তার দিকনির্দেশনা নেই এখানে। বন্দোবস্তের জন্য অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নেই অগ্রাধিকারের তালিকা। অকৃষি খাসজমিতে বরাদ্দকৃত ব্যক্তিরা ধরে রাখতে পারছেন না জমির দখল ও মালিকানা। অভাব রয়েছে ভূমিগ্রাসীদের কবল থেকে অকৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের। অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য উপযুক্ত আবেদনকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নেই কোনো কমিটি, বিষয়টি প্রচারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপও নেয়া হয় না। প্রতি ধাপে ঘটে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম, যার ফল ভোগ করতে হয় দরিদ্র মানুষকেই। অকৃষি খাসজমির প্রকৃত পরিমাণ এবং রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য, রেকর্ডের চেয়ে জমির পরিমাণ বেশি।

নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নীতিমালার তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতিমালার সমস্যার গড় স্কোর: ৩.১, এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ১.১)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতিমালার সমস্যার স্কোর ৩.১ (৬২% অর্জন) এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ১.১ (মাত্র ২২% অর্জন)।

দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণে 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫'-এর বেশ কিছুটা পরিবর্তন করে 'অকৃষি খাসজমি

ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংশোধিত নীতিমালা ২০১৪'-এর খসড়া তৈরি করে সরকার, যেটিও চূড়ান্ত হয়নি এখনো পর্যন্ত এবং এই খসড়াটিও নানান সমস্যাযুক্ত।

প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নমুখী সংস্কার করে খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা জরুরি। পূর্ণাঙ্গ একটি আইন সময়ের দাবি। বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার তালিকা। অবৈধ দখলকৃত অকৃষি খাসজমি উদ্ধারের বাস্তবসম্মত আইনি বিধান থাকা জরুরি, দরকার বন্দোবস্ত দেয়ার পর কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে বন্দোবস্ত বাতিলের বিধান থাকা। প্রয়োজন পৌর এলাকা এবং থানা সদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমিকে অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচনা করার বিধান বাতিল করা। সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অকৃষি খাসজমি বরাদ্দের বিষয়টির জন্য চাই সুস্পষ্ট নির্দেশনা। জমির ধরন, অবস্থান, বিতরণ অবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তিগত অবস্থা ইত্যাদি সবধরনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি খাসভূমি ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন, যা হালনাগাদ রাখবার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সবার জন্য করতে হবে উন্মুক্ত। জমি বিতরণের বিষয়টি যথাযথ প্রচারের বিষয়ে চাই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। আবেদনের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য একই রকম সহজ করা দরকার, যেন অযথা কালক্ষেপণ না হয়, সে জন্য চাই নজরদারি। অকৃষি খাসজমি বিতরণের জন্য জেলা এবং উপজেলাপর্যায়ে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন, উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা কমিটিতে আপিল করতে পারবেন এই বিধান থাকা প্রয়োজন। কমিটি গঠন এবং সেটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জমির বাজারদর নির্ধারণের বিষয়টি স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে অকৃষি খাসজমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড়ি জমিতে, বিশেষ করে যার সাথে জীববৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট বনজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হবে; প্রাকৃতিক অবস্থার রূপান্তর যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেটি নিশ্চিত করা চাই; এজন্য জরুরি সামাজিক চাপ প্রয়োগ ও নজরদারি।

৩.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য, মোট অকৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ একর। সবকটি মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌর এলাকা এবং থানা সদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমিও অকৃষি খাসজমি এবং ওইসব এলাকার বাইরে কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সমস্ত জমি অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত (অনুচ্ছেদ ২, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫)। অকৃষি খাসজমির একটি অংশ অচিহ্নিত। এই খাসজমির সঠিক বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে অবদান রাখা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ। অথচ, চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত অকৃষি খাসজমির বড় অংশই প্রভাবশালী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর জবরদখলে (বারকাত, ২০১৬)।

অকৃষি খাসজমিসম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনটি হচ্ছে 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'। আড়াই দশকের পুরোনো এই নীতিমালার যেমন নীতিগত সীমাবদ্ধতা

রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যবহারিক সমস্যাও। এ নীতিমালার অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাসজমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা। সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি মূল উদ্দেশ্য হলেও প্রক্রিয়াগত অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে অকৃষি খাসজমির বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা ব্যাপক সমালোচিত একটি বিষয়। এ নীতিমালাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় মোটেও সহায়ক হয়নি, বরঞ্চ বেশকিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে অকৃষি খাসজমি নথিভুক্তকরণ, পুনরুদ্ধার এবং বিতরণের ক্ষেত্রে। যেমন: (১) অকৃষি খাসজমি শনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ়ভাবে এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি; (২) সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ ধরনের জমির নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া নীতিমালায় স্থান পায়নি; (৩) সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অনুপস্থিত; (৪) সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; এবং (৫) পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জমির যুগোপযোগী ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায় এ নীতিমালায় তা বলা হয়নি।

৩.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত[৩১]

অকৃষি খাসজমির প্রশাসনসম্পর্কিত পৃথক কোনো আইন কার্যকর করা হয়নি। 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫' ছাড়া অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে অন্য কোনো সার্বিক নির্দেশনা নেই। ভূমি সংস্কারের সমসাময়িক ইতিহাস মূলত খাসজমি অধিগ্রহণ ও বিতরণের ইতিহাস, তাই অকৃষি খাসজমি বিষয়ে জানতে খাসজমির সার্বিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ আমলে সরকার স্থায়ী রাজস্বের ভিত্তিতে খাসজমি অন্যের কাছে ইজারা দিতে পারত। এ জাতীয় খাসজমির ইজারাগ্রহীতা নিজেরাই চাষ করতে পারতেন; বা বর্গাদারদের (ভাগচাষী) মাধ্যমেও ওই একই জমি আবাদ করতে পারতেন, যাদের জমির ওপরে কোনো অধিকার ছিল না। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট মোঘল সম্রাট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি অধিকার অর্পণ করেন এবং ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিস সিদ্ধান্ত নেন যে, ভূমির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ 'জমিদার'[৩২] এবং 'তালুকদার'[৩৩] এর হাতে থাকবে।

---

[৩১] এই উপ-অধ্যায় রচনায় বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (চতুর্থ খণ্ড: কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত এবং অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা* ও বন্দোবস্ত)। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তা নেয়া হয়েছে।

[৩২] ফারসি যামিন (জমি) ও দাস্তান (ধারণ বা মালিকানা)-এর বাংলা অপভ্রংশের সঙ্গে 'দার' যুক্ত হয়ে 'জমিদার' শব্দটির সূচনা। মধ্যযুগের বাংলার অভিজাত শ্রেণির ভূমি অধিকারীদের পরিচয় প্রকাশ করে এই শব্দটি। মোঘল আমলে জমিদার বলতে প্রকৃত চাষির উর্ধ্বে খাজনা গ্রাহককে বোঝানো হতো। বৃহৎ জমিদারিগুলির জমিদারদের ছিল বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা। স্থানীয় স্বশাসনের সুযোগে অত্যাচারী হয়ে উঠতেন কোনো কোনো জমিদার।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানসাপেক্ষে জমিদারেরা তাদের সম্পত্তির মালিক হওয়ার অনুমতি পেয়েছিল। ভূমির ওপর তাদের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং তা হস্তান্তরযোগ্য করা হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে ১৭নং রেজুলেশন বা প্রবিধান কার্যকর করা হয়েছিল; এই প্রবিধান অনুযায়ী রায়তরা বাড়তি ভাড়া দিতে ব্যর্থ হলে ফসলসহ তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জমিদারদের বিক্রয় করার অধিকার বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাজস্বমুক্ত জমিগুলো 'লক্ষিরাজ'[৩৪] নামে আংশিকভাবে স্বীকৃত ছিল। 'খাসমহাল' হিসেবে বিবেচিত স্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকার বাইরে জমি বন্দোবস্তের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করেছিল। রায়তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৯ সালে রেন্ট এ্যাক্ট (১৮৫৯ সালের ১০নং আইন) কার্যকর করেছিল। আইনে বলা হয়েছিল, রায়ত যেকোনো জমি নিয়মিতভাবে ১২ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দখল রাখতে পারবে এবং সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হবে না, যদি না তারা তাদের দখলীয় জমির জন্য ভাড়া বা খাজনা দিয়ে থাকেন। তবে এই বিধানটি জমিদার, তালুকদার ও দখলি রায়তদের খাসজমিতে বার্ষিক ভাড়াটেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

জমিদারেরা চলতি খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে জমিদার ও রায়তদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে (ইসলাম ও আখতার, ২০১৪)।

[৩৩] 'তালুকদার' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ভূম্যাধিকারী'। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে 'তালুকদার' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো, যেমনটি উত্তর ভারতে বড় ভূস্বামীদের তালুকদার বলা হতো। কিন্তু বাংলায় অধীনস্ত ভূমির ব্যাপ্তি ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে জমিদারদের পরে তালুকদারদের স্থান ছিল। আঠারো শতকের দিকে বাংলায় ছোট ছোট ভূস্বামীদের স্থানে বিশাল জমিদারির উদ্ভব ঘটে এবং ছোট ভূস্বামীদের জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল তালুকদারের মর্যাদায় অবনমিত করা হয়। কারণ 'রাজা' 'মহারাজা' নামে পরিচিত এ বড় জমিদারদের মাধ্যমেই তাদের সরকারের কাছে খাজনা জমা দিতে হতো। অবশ্য অনেক পুরোনো তালুকদার সরাসরি সরকারের নিকট খাজনা জমা দিতেন। বড় জমিদারগণ নিজেরাই বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন পরিধির অনেক তালুক সৃষ্টি করেন যেমন, জঙ্গলবাড়ি তালুক, মাজকুরি তালুক, শিকিমি তালুক ইত্যাদি। একদিকে জমিদারি পরিচালনার কৌশল ও সুবিধা এবং অন্যদিকে বিশেষ উদ্দেশ্যে জমিদারি তহবিল গঠনের রাজস্ব নীতি হিসেবে এ তালুকগুলো সৃষ্টি করা হতো। কার্যত এটি ছিল নির্ভরশীল তালুক সৃষ্টির নামে জমি বিক্রয় করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর বিধান অনুযায়ী এ ধরনের আশ্রিত সব তালুকসংশ্লিষ্ট জমিদারি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো এবং এগুলো স্বাধীনভাবে খাজনা প্রদানকারী জমিদারি হিসেবে বিবেচিত করা হতো। বিভিন্ন নামে আখ্যাত সবগুলো স্বাধীন ও নির্ভরশীল তালুক স্বাধীন জমিদারিতে রূপান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ নতুন ধরনের তালুক সৃষ্টি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে অনেক জমিদার বিভিন্ন নামে নির্ভরশীল তালুক সৃষ্টি করতে থাকেন। এগুলো হচ্ছে পত্তনি তালুক, নোয়াবাদ তালুক, ওসাৎ তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্ধারিত অধিকার ও দায়বদ্ধতার অনুরূপ এসব তালুকদারদেরও জমি ভোগ-দখলের মধ্যস্বত্বীয় অধিকার ছিল। তালুকদারদের খাজনা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা ছিল এবং জমিদারদের সালামি প্রদানের মাধ্যমে তালুকদারি হস্তান্তরযোগ্য ছিল। এ অধীনস্থ তালুকগুলো কোনো স্পষ্ট আইনগত ভিত্তি ছাড়াই গড়ে উঠত। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এ ভোগদখলকারীদের নিয়মিত মধ্যবর্তী তালুকদার হিসেবে স্বীকার করে নেয় এবং এ আইনে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-এর বলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সকল তালুক প্রথার বিলুপ্তি হয়েছিল (ইসলাম, ২০১৪)।

[৩৪] 'লক্ষিরাজ বা লাখেরাজ' হলো—মোঘল ও ব্রিটিশ আমলে ভূমি অথবা কর বা খাজনা মওকুফকৃত জমি (ইসলাম, তারিখ নেই)।

'জমিদারি' প্রথা বিলোপের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের ভূমি রাজস্ব কমিশন ১৯৪০ সালে সমস্ত ভাড়া বা খাজনা গ্রহণের স্বার্থে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনটির সুপারিশের ফলে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়ার পর 'জমিদারি' ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। খাজনা গ্রহণের স্বার্থে প্রতিটি পরিবার থেকে ১০০ বিঘার বেশি জমি 'খাস' অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল (ভূমি সিলিং পদ্ধতি); তবে ১৯৬১ সালে সামরিক আইন জারি করার সময় পরিবারপ্রতি জমির সিলিং ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার পরিবার প্রতি জমির সিলিং আবার ৩৭৫ বিঘা থেকে ১০০ বিঘায় নামিয়ে এনেছিল; সরকারি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য অতিরিক্ত জমি দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এই আইনগুলো খাসজমি সম্পর্কিত। এসব আইনের অধীনে কৃষি খাসজমি ও অকৃষি খাসজমির জন্য আলাদা কোনো বিধান ছিল না। ১৯৮৭ সালে কৃষি খাসজমি বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তবে অকৃষি খাসজমির জন্য কোনো নীতিমালা ছিল না। সে কারণেই সরকার ১৯৯৫ সালের ৮ মার্চ অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি প্রণয়ন করে, যা 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫' নামে অভিহিত।

৩.৩ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকার খাসজমি আছে। আশির দশকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের একটি নীতিমালা ছিল; কিন্তু, অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের কোনো নীতিমালা ছিল না বলেই অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ ছিল। ফলে, শহরাঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোনো না কোনোভাবে প্রভাবশালী মহলের লোকজনের অবৈধ দখলে চলে যাচ্ছিল এবং তারা দখলের সমর্থনে অবৈধ কাগজপত্র তৈরি করে আদালত থেকে ডিক্রি লাভ করেছিল বা অপতৎপরতা চালাচ্ছিল। এ অবস্থায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তসংক্রান্ত একটি সুষ্ঠু নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সরকার ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা তৈরি করেন, যাতে যথাযথভাবে অকৃষি খাসজমি বিতরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এ নীতিমালা প্রবর্তনের রজতজয়ন্তী পেরিয়ে গেলেও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাফল্য এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এসব কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় সরকার বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণে 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫'-এর বেশ কিছুটা পরিবর্তন করে 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংশোধিত নীতিমালা ২০১৪'-এর খসড়া তৈরি করে। সংশোধিত খসড়া নীতিমালাটি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সবার মতামতের জন্য দেয়া আছে। খসড়া নীতিমালা, ২০১৪-এর কিছু পরিবর্তন নিচে উল্লেখ করা হলো:

১) খসড়া সংশোধিত নীতির ২ (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদি[৩৫] হবে। তবে ৩০ (ত্রিশ) বছর অতিক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় বার নবায়ন করা হলে আবার নবায়নের প্রয়োজন হবে না, তখন এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বল্পমেয়াদি বন্দোবস্ত হবে ৫ বছরের জন্য। কিন্তু, বিদ্যমান নীতিমালায় এ ধরনের কোনো বিধান নেই।

২) ৩ (ঙ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শহীদ/যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত/মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/সন্তানকে (যৌথভাবে)[৩৬] পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) শতাংশ জমি এবং পৌর এলাকার বাইরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমি বাজারদরের ১০ শতাংশ মূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। ১৯৯৫ সালের নীতিমালায় এ ধরনের কোনো বিধান বা নিয়মের উল্লেখ নেই।

৩) অনুচ্ছেদ ৩ (চ) অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিরা যদি রেজিস্ট্রিকৃত সমবায়ের মাধ্যমে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের (ন্যূনপক্ষে ৫ তলা ভবন হতে হবে) জন্য জমি বন্দোবস্ত নিতে চান, তাহলে সেই বহুতলবিশিষ্ট ভবনের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যের জন্য ১.২৫ শতাংশ হিসাবে ৬.২৫ শতাংশ জমি ৫ জনকে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া হবে। অন্যদিকে বিদ্যমান নীতিমালায় বহুতলবিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি ২ জন সদস্যের জন্য ২.৫ শতাংশ হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বন্দোবস্ত দেয়ার কথা বলা আছে।

৪) খসড়া সংশোধিত নীতির ৩ (ছ)-তে উল্লেখ রয়েছে, শহর এলাকার কোনো শিল্পমালিককে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য তার নিজস্ব জমিসংলগ্ন খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। এই ক্ষেত্রে তার মালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পরিমাণ জমি বাজারদরে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী, আবেদনকারী মোট প্রয়োজনীয় জমির তিন-চতুর্থাংশ নিজে সংগ্রহ করলে, সর্বোচ্চ এক-চতুর্থাংশসংলগ্ন খাসজমি বাজারদরে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫) ৩(ঢ) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব (যা বিদ্যমান নীতিমালায় ২০ বছর) সময় সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকরিতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এ রকম কমপক্ষে ৫ জন বা তদূর্ধ্ব (যা বিদ্যমান নীতিমালায় কমপক্ষে ৩০ জন

---

[৩৫] ৩০ বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত হলো 'নতুন খসড়া অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা অনুযায়ী যেকোনো ধরনের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ৩০ বছর পর্যন্ত হবে এবং উক্ত বছর অতিক্রান্ত হলে ২য় বার নবায়নের পর অকৃষি জমিটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ উক্ত অকৃষি জমি আর নবায়ন করতে হবে না।

[৩৬] কৃষি খাসজমি নীতিমালার মতোই খসড়া অকৃষি খাসজমি নীতিমালাতেও অকৃষি খাসজমি শহীদ/যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত/মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/সন্তানকে যৌথ নামে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান বা নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বা তদূর্ধ্ব) সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারি বা আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে ৫ তলা ফ্ল্যাট বাড়ি) নির্মাণের জন্য বাজারমূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। প্রতি ৫ জনের গ্রুপকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের বেশি (যা বিদ্যমান নীতিমালায় প্রতি ২ জন সদস্যের জন্য ২.৫ শতাংশ) খাসজমি বরাদ্দ দেয়া যাবে।

৬) অনুচ্ছেদ ৩ (ত)-এ বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১০ একর (বিদ্যমান নীতিমালায় ৫ একর) পর্যন্ত ও বিভিন্ন রকম ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ২ একর (বর্তমান নীতিমালায় ১৫ একর) পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে; এবং রাবার/বাঁশ/বেত/পাটি ও পাতিগাছের চাষ করার জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে সর্বোচ্চ ২০ একর (বিদ্যমান নীতিমালায় ৩০ একর) পর্যন্ত ও নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে সর্বোচ্চ ৫০ একর (বিদ্যমান নীতিমালায় ১০০ একর) পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে।

৭) ৩ (ধ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোনো রূপান্তর না করার শর্তে কৃষিজ, ফলদ, বনজ ও ঔষধী দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে বাজারদরে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু, বর্তমান নীতিমালায় পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোনো রূপান্তর না করার শর্তে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য শুধু বন্দোবস্ত দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে[৩৭]।

৮) খসড়া সংশোধিত নীতিমালার ৩ (প) অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস-এর[৩৮] জন্য মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় ১০ শতাংশ এবং এগুলোর বাইরে ১৫ শতাংশ জমি বাজারদরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনসাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত ৩০ বছর পর্যন্ত হবে। তবে, ৩০ বছর শেষ হবার পর দ্বিতীয়বার নবায়নের পর পুনঃনবায়নের প্রয়োজন হবে না। এটি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান ১৯৯৫ সালের নীতিমালায় এ ধরনের কোন বিধান বা নিয়ম উল্লেখ নেই।

---

[৩৭] ১৯৯৫ সালের অকৃষি খাসজমি নীতির এই অনুচ্ছেদে শুধু পাহাড়ের জমি বন্দোবস্তের কথা বলা আছে, কিন্তু এখানে ৩০ বছরের জন্য অকৃষি খাসজমি ইজারা দেওয়ার কথা বলা হয় নাই, যা খসড়া নীতিমালা ২০১৪-এ বলা উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৮] বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে সাধারণত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস নির্মাণ করার জন্য অকৃষি খাস জমি বরাদ্দ ৩০ বছর মেয়াদের জন্য বা দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

৩.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর প্রধান কটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

- দেশের সব মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌর এলাকা এবং থানাসদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমিও অকৃষি খাসজমি হিসেবে এবং এলাকাগুলোর বাইরে কৃষিযোগ্য খাসজমি বাদে অন্যান্য সব খাসজমি অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে (অনুচ্ছেদ ২)।
- প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই 'বাজারদর' হিসেবে গণ্য করা হবে (অনুচ্ছেদ ২)।
- সরকারি প্রয়োজনে যেকোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে; তবে, সেক্ষেত্রে বাজারদর অনুযায়ী জমির উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩)।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধভাবে পুনর্বাসিত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোনো প্রয়োজনে না লাগলে দখল বিবেচনায় নিয়ে পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (৫ শতাংশ) জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। তবে, নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় এ ধরনের বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না (অনুচ্ছেদ ৩)।
- সরকারি অনুমোদনক্রমে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয়পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে সরকারপ্রধান ইচ্ছা করলে রেয়াত মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারেন (অনুচ্ছেদ ৩)।
- অধিগ্রহণকৃত সব জমি পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে বা হবে; সেই সব জমির মূল মালিক বা তার বৈধ উত্তরাধীকারীদের ক্ষতিপূরণবাবদ দেয়া অর্থ সমন্বয় না করে 'বাজারদরে' বিভিন্ন এলাকায় (মেট্রোপলিটন, পৌরসভা, জেলা ও থানা সদর এবং এর বাইরে) জমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ তার কাছ থেকে অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেকের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। এছাড়া যেহেতু বন্দোবস্তগ্রহীতা জমির পূর্বতন মালিক, সেহেতু তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে শুধু একজনই সুবিধা পাবে। এরূপ বন্দোবস্ত প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩)।

- নিলামের মাধ্যমে বিক্রি ছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকার যেকোনো অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারপ্রধানের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সবক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থিত জমির সেলামি নির্ধারণ করে কেস রেকর্ড করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবেন (অনুচ্ছেদ ৪)।

- জমি যে উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত দেয়া হবে তা বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে, বন্দোবস্তগ্রহীতা চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভূমিসংক্রান্ত সরকারি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ লঙ্ঘন করলে এবং বন্দোবস্ত গ্রহণের পর কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখা বা শর্ত ভঙ্গের ঘটনা প্রকাশ হলে বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ তার বন্দোবস্ত বাতিল ও প্রদত্ত মূল্য বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন (অনুচ্ছেদ ৫)।

- বন্দোবস্তকৃত জমি সম্পর্কে উদ্ভূত যেকোনো বিতর্কিত বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাবে এবং নীতিমালার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সরকারপ্রধানের সার্বিক এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকবে (অনুচ্ছেদ ৮ ও ১০)।

৩.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা

বর্তমান নীতিমালা প্রণয়নের পর থেকে গত ২৫ বছরে এর বাস্তবায়নে অকৃষি খাসজমি শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণ এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে নানান প্রয়োগিক সমস্যা দেখা গেছে। অকৃষি খাসজমিতে বরাদ্দকৃত ব্যক্তিরা ধরে রাখতে পারছে না জমির দখল ও মালিকানা। অভাব রয়েছে ভূমিগ্রাসীদের কবল থেকে অকৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের। নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, যথাযথ প্রশাসনিক কার্যক্রম। অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য উপযুক্ত আবেদনকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নেই কোনো কমিটি। অভিযোগ রয়েছে, কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের প্রচারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়াও হচ্ছে না। আবেদনপত্রটি এতটাই দ্ব্যর্থক, জটিল এবং বিস্তৃত যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং পূরণ করা কঠিন– এর ফলে ঘটে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম। কখনো কখনো ছোটখাটো ভুলের জন্য সঠিক আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানও করা হয়, যার ফল ভোগ করতে হয় দরিদ্র-নিরক্ষর মানুষকেই

অকৃষি খাসজমির সংজ্ঞায় ভূমিগ্রাসীর দখলকৃত অকৃষি খাসজমিগুলো কৃষি খাসজমিতে রূপান্তরের পক্ষে সমর্থন দেয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটিতে আরও বলা হয়েছে: চারটি মহানগর অঞ্চল এবং সবকটি থানা সদরের আওতাধীন সব পৌর অঞ্চলকে নগর অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ওইসব অঞ্চলের কৃষি খাসজমিগুলো অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে। এই

অঞ্চলের খাসজমি ব্যতীত এ অঞ্চলের বাইরের অন্যান্য খাসজমিগুলোও অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বর্তমান সংজ্ঞায় মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে পৌর এলাকার কৃষি খাসজমিকে অকৃষি খাসজমি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অকৃষি খাসজমির প্রকৃত পরিমাণ এবং রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। রেকর্ডের চেয়ে জমির পরিমাণ বেশি। নীতিমালার ২ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, সব পৌর এলাকা এবং থানাসদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমিও অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে। সরেজমিনে দেখা গেছে, অনেক পৌর এলাকায় বেশির ভাগ জমি কৃষিজমি হিসেবে রয়েছে; কিন্তু, সেটা হয় খাসজমি নয়তো ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি। এর ফলে ওইসব কৃষি জমি দিনের পর দিন অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অকৃষি খাসজমি শনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ়ভাবে নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি। পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এ নীতিমালায় উপেক্ষিত হয়েছে। সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণপ্রক্রিয়া, জমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াও এ নীতিমালায় নেই।

অকৃষি খাসজমিসম্পর্কিত আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির অনুপস্থিতিই এর প্রধান বাস্তবায়ন সমস্যা। দীর্ঘ আড়াই দশকের পুরোনো এই নীতিমালার অনেক কিছুই পরিবর্তন করা এখন একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে (যেমনঃ থানার পরিবর্তে উপজেলা, ৪টি মেট্রোপলিটন সিটির পরিবর্তে ৮টি মেট্রোপলিটন সিটি প্রভৃতি)।

অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নেই অগ্রাধিকারের তালিকা। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের সরকারি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩-এ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য ১৬ বর্গের মানুষ অথবা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে[৩৯], এর মধ্যে ভূমিহীন কৃষক, জলাহীন জলাজীবী, এবং শহরের দরিদ্র মানুষের কোনো কথা নেই; বাস্তবে, ভূমিদস্যুরা অকৃষি খাসজমির বরাদ্দ পেয়ে যায়।

---

[৩৯] ১৬ বর্গের মানুষ অথবা প্রতিষ্ঠান হলো– ১) সরকারি দপ্তর বা সংস্থা, ২) ধর্মীয় উপসনালয়, এতিমখানা, ও শ্মশ্মানঘাট, ৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধভাবে পুনর্বাসিত লোকজন, ৫) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয়পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তি, ৬) প্রবাসী বাংলাদেশি, ৭) শহর এলাকার বাইরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি, ৮) অন্তত ১০ বৎসরের বেশি সময় ধরে নিয়মিতভাবে সরকারি পাওনা পরিশোধ করে একসনা লিজমূলে জমি দখলে আছেন এমন লোকজন, ৯) যেসব অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে বা হবে সেই সব জমির মূল মালিক বা তার বৈধ উত্তরাধিকার, ১০) মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলা শহরের বাইরে গবাদিপশু বা দুগ্ধ খামার এবং হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, ১১) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য খামার স্থাপনকারীদের জন্য সরকারি খাস পুকুর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে, ১২) বিদেশি বিনিয়োগকারী অথবা যৌথ উদ্যোক্তা শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য, ১৩) কারখানা ও বাড়িসংলগ্ন খাসজমি আছে এবং এই খাসজমির অবস্থান এমন যে তা অন্য কাউকে বন্দোবস্ত প্রদান করলে বাড়ি বা শিল্পকারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি যাই হোক না কেন) বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে, ১৪) কমপক্ষে ২০ বছর বা তদূর্ধকাল যাবৎ সরকারি/আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকরিতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ৩০ জন বা তদূর্ধসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারি/আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত

অনুচ্ছেদ ২ (গ) অনুযায়ী প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই বাজারদর হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। তবে, ওই নীতিমালায় বাজারমূল্য নির্ধারণের জন্য কোন কমিটি নেই বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল্য নির্ধারণ স্থির থাকে না বা মূল্য নির্ধারণ সঠিক হয় না।

নীতিমালার ৩ (ক) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি প্রয়োজনে যেকোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে। এ কারণে ইতিমধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি দেয়া হয়ে গেছে, আর যা বাকি আছে তাও বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পৌর এলাকায় এখন কৃষিজমিও সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ফলে কৃষিজমি দিন দিন অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

নীতিমালার ৩ (গ)-তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য পরিমাণমতো জমি দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, এ বরাদ্দ কীভাবে ও কী পরিমাণ দেয়া যাবে তার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

অনুচ্ছেদ ৩ (ঘ)-এ বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোনো প্রয়োজনে না লাগলে দখল বিবেচনায় এনে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। তবে, প্রভাবশালী রেন্টসিকার বা ভূমিদস্যুদের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীনরা দখলে থাকার পরও এ খাসজমির বন্দোবস্ত পায় না। মাঠগবেষণায় দেখা গেছে যে, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু খালি জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ভূমিহীন হয়ে পড়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন অনেক দিন ধরে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু, ওই এলাকায় ভূমিহীনরা তাদের দখলীয় জমি বন্দোবস্ত পেতে পানি উন্নয়ন বোর্ড বা প্রশাসনে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও প্রভাবশালীদের চাপের মুখে তার বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে না। প্রভাবশালীরা সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে।

৩ (ঙ) নং অনুচ্ছেদে সরকারি অনুমোদনক্রমে জাতীয়পর্যায়ে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে এ কারণে সাংবিধানিক সম-অধিকার নষ্ট হচ্ছে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের অকৃষি খাসজমি পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য স্বীকৃত ব্যক্তিদের বাজারদর অনুযায়ী জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু, নীতিমালায় নেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, এবং তার অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তি চিহ্নিত করার কোনো মানদণ্ড।

নীতিমালার ৩ (ধ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোনো রূপান্তর না করার শর্তে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য শুধু বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। কিন্তু, ওই নির্দেশনা মানা হয় না এবং

সমবায় সংগঠন, ১৫) কমপক্ষে ১৫ জন বা তদূর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠন, এবং ১৬) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ফুল ও রাবার চাষ এবং বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে।

নির্বিচারে পাহাড় কেটে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে ম্রো আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে সিকদার গ্রুপের পাঁচ তারকা হোটেল ও পর্যটন স্থাপনা নির্মাণের অপচেষ্টা এর সাম্প্রতিক উদাহরণ।

মাঠগবেষণায় সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার সময় ভূমি অধিকার কর্মী ও পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর বাস্তবায়নসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ভূমি অধিকার কর্মীদের মতে, অকৃষি খাসজমি প্রধানত সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হয়। এরপর খালি জমি থাকলে টেন্ডারের মাধ্যমে তা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানকে বা একক কোনো ব্যক্তিকে চাহিদার নিরিখে পর্যালোচনা করে দেয়ার বিধান– এই টেন্ডারের সময় ব্যাপক অনিয়ম হয়। কোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি টেন্ডারে অংশ নেন তবে তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অন্য গ্রুপরা জমিটি পাবার জন্য অধিক যোগ্য হলেও তাদের সেই জমি দেয়া হয় না। আবার, নীতিমালায় বিধান রাখা হয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, কবি, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ যদি অকৃষি খাসজমির জন্য আবেদন করেন তবে তারা জমি পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। নীতিমালার এই বিধানের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, অকৃষি খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে প্রয়োজনীয়তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নইলে এই বিধির অপপ্রয়োগ আরো বাড়বে। উপজেলাপর্যায়ে অকৃষি খাসজমি বরাদ্দের সময় সমাজের শ্রেণিকাঠামোর ওপর দিককার লোকদের যে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তার বিরুদ্ধেও ভূমি অধিকার কর্মীরা একইভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন। তারা জানান, বাংলাদেশের মসজিদ, মন্দিরের জমির ক্ষেত্রে অনেক 'ফাঁকফোঁকর' রয়েছে। মসজিদের জমিতে মার্কেট হচ্ছে, আর তা নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। কাজেই, খাসজমি বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে তারা ভূমি প্রশাসনকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একজন ভূমি অধিকার কর্মী বলেন, *"ময়মনসিংহের কিছু পাহাড়ি এলাকায় যারা খাসজমি বরাদ্দ পেয়েছে, তারা বরাদ্দকৃত জমির চেয়ে বেশি জমি নিয়মবহির্ভূতভাবে দখল করে চাষাবাদ করে। এসব দেখার কেউ নেই। পাহাড় কেটে ভূমির শ্রেণিবদল করে বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে বা অন্য স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে, যা নীতিমালা সমর্থন করে না। আর প্রশাসনও এসব নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা পালন করছে না। এর ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তা অপূরণীয়। আসলে, নীতিমালা থাকলে কী হবে, প্রয়োজন এর যথাযথ বাস্তবায়ন। খাসজমি বাছাই কমিটিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। নীতির সমর্থনে আইন তৈরি করতে হবে, যাতে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।"*

সাংবাদিকেরা বলেছেন, এসব খাসজমির বেশির ভাগই ব্যবসায়ী মহল, বিত্তবান এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবৈধ দখলে রয়েছে। এ কারণে অকৃষি খাসজমি নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টনে বিঘ্ন সৃষ্টি

হচ্ছে, সাধারণ জনগণ এর থেকে কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে, অকৃষি খাসজমি দেয়ার সময় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার বিধান রাখা হয়েছে নীতিমালায়, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি দেখা যায় না। অনেকটা গোপনেই খাসজমি বিতরণ করা হয়। এখানে মূল কারণ হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও প্রভাবশালীদের আধিপত্য। প্রভাবশালীরা হয় নিজেরা জমি দখল করে অথবা নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের নামে এসব খাসজমি দখলে রাখে। আর স্থানীয় প্রশাসনকেও এসব বিষয় রোধে খুব বেশি তৎপর হতে দেখা যায় না বলে তারা মন্তব্য করেন। তাদের মতে, নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ভূমি প্রশাসন একান্ত জরুরি এবং ভূমি সংস্কার কমিটিকেও হতে হবে পুরোপুরি নিরপেক্ষ।

> *"মধুপুরে নদীর পাশে খাসজমিতে একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলটি এখন আর নেই। বর্তমানে সেই জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। স্কুলের খাসজমি কীভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়? অকৃষি খাসজমি বিতরণে এখানে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম। যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের লোকেরাই সাধারণত এসব খাসজমি ভোগদখল করে। সাধারণ জনগণ এসবের ধারেকাছেও যেতে পারে না। ভূমি প্রশাসনও প্রভাবশালীদের হয়েই কাজ করে। প্রভাবশালীরা এতোটাই শক্তিশালী যে তাদের কাজে বাধা দেয়ার ক্ষমতা জনসাধারণের নেই। আর কেউ বাধা দিতে চাইলে বা এসব কর্মকাণ্ড প্রকাশ করতে চাইলে তার প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে।"*
>
> *—স্থানীয় সাংবাদিক, মধুপুর, টাঙ্গাইল*

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণের সাথে আলোচনার সময় তারা বলেছেন, অকৃষি খাসজমি থাকলেও তার বেশির ভাগই জোতদারদের দখলে। জোতদরেরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে ভূমিহীনদের ব্যবহার করে এসব খাসজমি দখলে নিয়ে রেখেছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ বলেন, *"আমাদের পাশের এলাকার (টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মির্জাবাড়ি-এর পাশের এলাকা) অকৃষি খাসজমিতে গুচ্ছগ্রাম করা হয়েছে। সরকারিভাবে ভূমিহীনদের আবাসন নিশ্চিতে এই গুচ্ছগ্রাম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তবে স্থানীয় প্রভাবশালীদের জন্য গুচ্ছগ্রামে ভূমিহীনরা নিরাপদে থাকতে পারছেন না, অনেকেই সেখান থেকে চলে আসছেন। মূলত, প্রভাবশালীরা চাচ্ছেন ওই জায়গাকে নিজেদের দখলে নিতে, যার কারণে তারা ভূমিহীনদের সেখান থেকে নানা কৌশলে বিতাড়িত করছেন।"* তারা বলেন, বাস্তবে প্রভাবশালী ও সচ্ছল ব্যক্তিরাই জমির বরাদ্দ পাচ্ছেন। সমন্বয়ের অভাব সর্বত্রই।

> *"আমি একজন নদীভাঙ্গা মানুষ। কৃষি ও অকৃষি উভয় খাসজমি পাওয়ার জন্যই অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। প্রশাসন কোনভাবেই আমাদের মতো দরিদ্র, অসহায়, নদীভাঙ্গা লোকজনদের সহায়তার আশ্বাস দেয় না। বারবার খাসজমির জন্য আবেদন করেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাইনি।"*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী, সুবর্ণচর, নোয়াখালী*

৩.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ

বন, পাহাড়, উন্নয়ন-বিনাশ এবং আদিবাসী জীবনের কথকতা

পাহাড় কিংবা সমতল, এ দেশের আদিবাসীরা যেখানেই বাস করুন না কেন, তাদের প্রথাগত ভূমি অধিকার বরাবর লুট হয়ে আসছে। উন্নয়ন এবং আধুনিকতার বাতাবরণে দখল হচ্ছে সেই জমি, যেখানে তারা বাস করে আসছে বংশপরম্পরায়; ঐতিহ্যগতভাবে যে জমির মালিক তারা। নানান আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে কেড়ে নেয়া হচ্ছে তাদের ভূমি, বন ও পাহাড়। তাদের জীবন, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সবকিছুর মূল যে ভূমি, সেই ভূমি থেকেই তাদের বিতাড়িত হতে হচ্ছে। দখলের এই সংস্কৃতি নতুন নয়; বিশেষত, আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবনে এ যেন এক নৈমিত্তিক সত্যি; এই যেন তাদের নিয়তি। আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুযায়ী আদিবাসীদের ভূমি অধিকার একটি স্বীকৃত বিষয়। অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ কোনো সংলাপ, আলোচনা কিংবা ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের কোনোরকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছাড়াই তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে ভূমি থেকে।

এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২০ সালের, একটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা হলো: বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়সংলগ্ন অঞ্চল ঘিরে শিকদার গ্রুপের উদ্যোগে স্থানীয় আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা-সমাজ-সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলে তাদের উচ্ছেদের মুখোমুখি করে পাঁচ তারকা হোটেল ও পর্যটন স্থাপনা নির্মাণ প্রচেষ্টা।

জানা যায়, প্রথমে সেনাকল্যাণ সংস্থা ওখানকার জমি ৪০ বছরের জন্য লিজ নেয়, পরবর্তীকালে তাদের থেকে লিজ নিয়েছে সিকদার গ্রুপের "আর এন্ড আর হোল্ডিং"। উদ্দেশ্য বিলাসবহুল হোটেল এবং পর্যটন স্থাপনা নির্মাণ। স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীর দিন কাটছে উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে। ম্রো জনগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা এমনিতেই কম, এমন কার্যক্রম চলতে থাকলে তাদের বিলীন হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। স্থানীয় কজন কারবারি বা পাড়াপ্রধান (পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলের গ্রামের সমতুল্য হলো "পাড়া") জানান যে, তাদের এলাকায় পর্যটন স্থাপনার জন্য একটি কবরস্থানে হয়েছে বাঁধ; ঝর্ণায় পানির ট্যাঙ্ক বসানোর ফলে পানিতে এখন অনেক ময়লা; ওই পানি পান করা কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন; পাড়ার ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তা; তাদের জনস্বাস্থ্যসহ সামাজিক-জীবন পড়ছে হুমকির মুখে (মারমা, ২০২০)।

কতটুকু জমি লিজের নামে দখল নেয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে নানান বক্তব্য শোনা যায়; হোটেল এবং পর্যটন স্থাপনা নির্মাণকারীর বক্তব্য যে প্রথমে তারা ২০ একর জমি লিজ, এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী আরো ১০ একর, অর্থাৎ মোট ৩০ একর জমি লিজ নিয়েছে। তাদের দাবি যে, এর চেয়ে বেশি জমি লিজ নেয়নি তারা (মারমা, ২০২০)। অন্যদিকে, যারা উচ্ছেদ আতঙ্কে আছে তাদের দাবি অন্তত এক হাজার একর জমি এই দখলের আওতায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপের ভিত্তিতে এটুকু বোঝা যায় যে, কাগজে-কলমে জমি লিজের পরিমাণ যা-ই থাকুক না

কেন, বাস্তবে এমন একটি পাঁচ তারকা হোটেল এবং পর্যটন স্থাপনা ওখানে নির্মাণ করা হলে ওখানকার নেতিবাচক প্রভাব কোনোভাবেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে থাকবে না; বিশেষ করে ম্রো সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা তো বটেই, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভীষণরকম। তাছাড়া, আলোচনায় এটিও উঠে আসে যে, ক্ষতিপূরণ হচ্ছে আলোচনার দ্বিতীয় বিষয়; প্রধান বিষয় হচ্ছে যে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলাপ আলোচনা না করে এবং সহনশীল একটি সমাধানের দিকে না এগিয়ে যেভাবে একতরফা এই নির্মাণ নিয়ে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে তা নিতান্তই আইন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। নীতিমালার ৩ (ধ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোনো রূপান্তর না করার শর্তে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য শুধু বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে যে, ওই নির্দেশনা মানা হয় না এবং নির্বিচারে পাহাড় কেটে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়।

এমন অমানবিকতা তাদের জীবনে নতুন নয়। ২০০৬ সালেও পাশের এলাকা থেকে তাদের একবার এমন করেই উচ্ছেদ করা হয়। কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই উচ্ছেদ করা হয় প্রায় ৭৫০ পরিবারকে; ম্রো ছাড়াও তাদের মধ্যে ছিল বম, চাকমা, এবং কয়েক ঘর বাঙালিও। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর একটি অংশ চিম্বুকের পথের ধারে গড়ে তুলেছেন নতুন বসতি, ক্রামাদি পাড়া। তাদের পাহাড়, বন, ঝর্ণা– কিছুই আর তাদের নেই। জমি নেই, কমে গেছে চাষাবাদ– নেই ক্ষুদা মেটাবার খাবার। এখন তারা আবার দিনাতিপাত করছে পুনরায় উচ্ছেদ হবার তীব্র আতঙ্কে (রঞ্জনা, ২০২০)। এর আগে, ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশ সেনা ও বিমান বাহিনীর গোলন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়; ফলে বান্দরবানের সুয়ালক ও টংকাবতী ইউনিয়নের তিনটি মৌজা থেকে ৩৮১টি ম্রো পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। ২০০৬-০৭ সালে একই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয় আরও তিন শতাধিক ম্রো পরিবারকে। এছাড়াও, নীলগিরি হিল রিসোর্টস নির্মাণকালে উচ্ছেদের শিকার হয় ২০০ ম্রো ও মারমা পরিবার (দ্য ডেইলি স্টার, ২০২১)।

এ বিষয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ২০২০ সালের নভেম্বর মাসেই একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। পরিষদের চেয়ারম্যান, তার লিখিত বক্তব্যে জানান যে, ২০১২ সালে জেলা পরিষদের নামে জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়। কিন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রামে বন্দোবস্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির নিষ্পত্তি সম্ভব নয় বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়। পরবর্তীতে ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড, বান্দরবান সেনানিবাসের প্রস্তাব ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০৫৫ সন পর্যন্ত ৪০ বছরের জন্য ১৮টি শর্তের চুক্তিতে উল্লিখিত জমিটি ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডকে ইজারা দেওয়া হয়। এই সংবাদ সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চিম্বুক পাহাড়বাসী তাদের একটি লিখিত বক্তব্যে দাবি করেন যে যেখানে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এখনো জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর হয়নি, সেখানে কেমন করে তারা পাহাড়ি এই ভূমি ইজারা দিতে পারেন? এছাড়া তাদের

বক্তব্য অনুযায়ী পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ, স্থানীয় সাধারণ আদিবাসীদের কোনো সম্পৃক্ততা এতে অনুপস্থিত (পার্থ, ২০২১)।

এ নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে, হচ্ছে। গত ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে এই নির্মাণ এবং উচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রতিবাদে বান্দরবান জেলা শহর থেকে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দূরে চিম্বুক পাহাড়ে কাপ্রুপাড়ায় একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী কর্মসূচির আয়োজন করে ম্রো সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রায় ২৫টি পাড়া থেকে আগত বাসিন্দারা ওই প্রতিবাদে যোগ দেন, তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র এবং পোশাকের মাধ্যমে জানান দেন প্রতিবাদ; পাঁচ শতাধিক অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। এর আগেও অক্টোবর ২০২০-এ পর্যটন স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ এবং উচ্ছেদের আশঙ্কা জানিয়ে চিম্বুক পাহাড়ের আটটি পাড়ার বাসিন্দারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছিলেন (মারমা, ২০২০)। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে এই নির্মাণের প্রতিবাদে ম্রো আদিবাসীরা একটি লংমার্চ-এর আয়োজন করে। চিম্বুকের রামরি পাড়া থেকে এই লং মার্চ শুরু হয়ে, প্রায় ৩০ কিলোমিটার হেঁটে তারা শহরের বোমাং রাজার মাঠে সমাবেশ করেন। সমাবেশের লিখিত বক্তব্যে দাবি করা হয় যে, এই নির্মাণের ফলে প্রায় ১ হাজার একর ভূমি বেদখল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, উচ্ছেদের মুখে পড়বে ছয়টি পাড়া। ওই সমাবেশ থেকে ৫টি দাবি লিখিত আকারে উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো: (১) চিম্বুকের নাইতং পাহাড়ে পাঁচতারকা হোটেল ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাতিল করা; (২) অবৈধভাবে ভূমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন-প্রতিবাদকারীদের হয়রানি ও হুমকি-ধামকি দেয়া বন্ধ করা; (৩) চিম্বুকের ম্রোদের বংশপরম্পরায় ভোগদখলীয় ভূমিতে কোনো ধরনের পর্যটন বা বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা; (৪) স্থানীয়দের ভূমি দখল করে নীলগিরি পর্যটনকেন্দ্র সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ না করা; এবং (৫) যে উদ্দেশ্যেই চিম্বুক পাহাড়ের ভূমি ব্যবহার করা হোক না কেন তা স্থানীয় কারবারি (পাড়াপ্রধান), হেডম্যান (মৌজা প্রধান), জনপ্রতিনিধি ছাড়াও চিম্বুক পাহাড়ের সব পাড়াবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা (সমকাল, ২০২১)। ২০২১-এর মার্চ মাসের শুরুতে চিম্বুক পাহাড় ম্রো ভূমি রক্ষা আন্দোলন রাজধানী ঢাকার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে একটি প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ থেকে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত নির্মাণের ফলে ছয়টি গ্রামের বাসিন্দারা সরাসরি উচ্ছেদের মুখে পড়বেন। এছাড়াও আরো ১১৬টি পাড়ার আনুমানিক ১০ হাজার বাসিন্দা বিভিন্নভাবে স্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবেন (দ্য ডেইলি স্টার, ২০২১)।

ভূমি অধিকার কর্মীদের শঙ্কা কা যে এই প্রতিবাদকে দমিয়ে দেয়া হবে, ওখানকার নির্মাণ আর দখল চলবে পরিকল্পনামাফিক। মাঝখান থেকে মামলা-মোকদ্দমা, হয়রানির মুখে পড়বেন প্রতিবাদকারীরা।

অকৃষি খাসজমির অবৈধ দখল, উচ্ছেদ অভিযান[৪০]

খুলনার ডুমুরিয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)-এর অধিগ্রহণকৃত অকৃষি খাসজমি বহু বছর ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অবৈধভাবে দখল করে নানা স্থাপনা নির্মাণ করে আসছে। পাউবোর কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তারা এ কাজ করছে। এমনকি প্রভাবশালীরা দখলকৃত এসব জমি অন্যদের কাছে বিক্রিও করে দিচ্ছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ভূমিহীন হয়ে পড়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনও পাউবোর জমিতে বেশকিছু বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। এদিকে ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে এসব অবৈধ দখল অবমুক্তকরণের জন্য বলা হলে, পাউবো কর্তৃপক্ষ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কিছু চেষ্টা করলেও কোনো ধরনের সফলতা পায়নি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগে প্রভাবশালীরা তাদের দখলপ্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। উল্টোদিকে, পাউবো কর্মকর্তারা ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদ করছে কোনো ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই। যেখানে নীতিমালায় বলা আছে, অকৃষি খাসজমি প্রদানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতে হবে, সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে ক্ষমতাবান প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।

তৎকালীন ওয়াপদা (বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-পাউবো) ১৯৬৬-৬৭ সালে খুলনার উপকূলীয় এলাকার ডুমুরিয়ায় ৬টি পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ডুমুরিয়া উপজেলার পাউবোর কিছু খালি জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ভূমিহীন হয়ে পড়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন আসতে থাকে। বিশেষ করে, ২০০৭ সালের নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায় এবং ২০০৯ সালের ২৫ মে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জনপদে আঘাত হানে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ‘আইলা’। ওই দুই ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন দরিদ্র লোকজন খুলনার বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়ার সরকারি খালি জায়গাতে আশ্রয় নেয়া শুরু করে। পরবর্তীকালে, তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিল।

কিন্তু, অধিগ্রহণকৃত পানি-উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) জমিতে ডুমুরিয়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বহুতল ভবন, মার্কেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মৎস্যখামার, মাছের ডিপো, মিল, কলকারখানা নির্মাণ করছে। পাউবোর অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এসব স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। ডুমুরিয়া সদরে আরাজী সাজিয়াড়া মৌজায় ৯২ শতাংশ মূল্যবান জমির ওপর একজন প্রভাবশালী বহুতল ভবন ও মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। প্রভাবশালী অবৈধ দখলদার বলেন যে যে জমির ওপর মার্কেট বা ভবন নির্মিত হচ্ছে, ওই জমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সত্য; তবে এক লোকের কাছ থেকে তা কিনে নিয়ে ওই জমি তার বাবা অবমুক্ত করে

---

[৪০] গবেষকদল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা সদর এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর কর্মকর্তা, ভূমি অধিকার কর্মী অকৃষি খাসজমিতে বসবাসকারী মানুষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে ঘটনাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারেন।

রেখে গেছেন। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের সঙ্গে এখন তাদের কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা যা ছিল তা মিটে গেছে। ডুমুরিয়ার থুকড়া এলাকায় পাউবোর জমির একজন অবৈধ দখলদার বলেন, পাউবোর জমিতে তিনি ২০ বছর ধরে বসবাস করছেন। এ পর্যন্ত এখানে পাউবোর কেউই খোঁজ নিতে আসেনি। কয়েকবার পাউবো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দোকানের জমি পরিমাপ করে ডিসিআর নেয়ারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু পায়নি। ডুমুরিয়ার একজন মৎস্য আড়তদার-এর দখলে রয়েছে প্রায় ১ একর অকৃষি খাসজমি। তিনি বলেন যে, ওই জমি কিনে নিয়ে সেটি পাউবো থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে। ডুমুরিয়া উপজেলার একজন ইউপি চেয়ারম্যান ৪০ শতাংশ জমি দখল নিয়ে আলিশান বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। খুলনার ডুমুরিয়ার পাউবোর একজন সার্ভেয়ার বলেন, ওইসব জমি অবমুক্ত হয়নি, সম্পূর্ণ জমি পাউবোর। প্রভাবশালী অবৈধ দখলদারেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জোর করে পাকা ভবন নির্মাণ করছে। এ বিষয়ে পাউবোর পক্ষ থেকে স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসে ১৮৭ থেকে ২০৬ পর্যন্ত আপত্তি দেওয়ার পরও তারা নির্মাণ কাজ বন্ধ করেননি। এদিকে, উপজেলার একজন প্রকৌশলী বলেন, ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন পোল্ডারে বেশকিছু পরিত্যক্ত ভবন ও মূল্যবান জমি রয়েছে, সেগুলো সার্ভের মাধ্যমে রিপোর্ট তৈরি করে বোর্ডের সম্পদ উদ্ধার করা হবে। মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের বা সরকারি সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে (সমকাল, ২০১৫)। যদিও ক্ষমতাশালী রেন্ট সিকারদের দাপটে তার এই বক্তব্য অরণ্যে রোদন মনে হয়।

উপজেলার অন্য একজন প্রকৌশলী বলেন, ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে ২০৯৬ জন দখলদার শনাক্ত হয়েছে। এসব দখলদারদের তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত অভিযান শুরু করা যায়। সরেজমিনে জানা যায় যে, প্রভাবশালী দখলদারদের বিরুদ্ধে মৌখিক এবং লিখিত নোটিশ দেয়া হলেও তা কোনও কাজে আসছে না। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারছে না পাউবো কর্তৃপক্ষ। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে উচ্ছেদ অভিযানও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে, এসব দখলদারদের তালিকা করেই দায়িত্ব পালন শেষ করতে হচ্ছে বোর্ডকে। সাহাপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা অভিযোগ করেন, পাউবোর জায়গাগুলো দখলে নিয়ে প্রভাবশালীরা বিক্রি করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষই এ জমি কিনেছে। তিনি আরও বলেন, বাজার কমিটির সভাপতি প্রতিবছর এখানকার দোকানগুলো থেকে চাঁদা তুলে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের দিয়ে থাকেন। উপজেলার পাউবোর একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এখানে যোগদানের পর বেশ কয়েকটি স্থানে দখলদারদের উচ্ছেদ করেছেন। এসব দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশও আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে বিভিন্ন সময়ই উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়। তখন দখলদারেরা উকিল নোটিশ দেয়াসহ মামলা করেন। কারণ, বর্তমান আরএস রেকর্ডে দখলদাররা ওই জমি তাদের নামে নিয়ে নিয়েছে। ভূমি জরিপের সময়ে তারা ওই রেকর্ডের বুনিয়াদে হয়রানি করছে। জনবল সংকটের কারণে সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে।

পাউবো থেকে দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে গেলে রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালীরা হস্তক্ষেপ করে থামিয়ে দেয় (বাংলা ট্রিবিউন, ২০২০)।

কিন্তু উপজেলার সদরের নদী তীরবর্তী ওইসব এলাকায় প্রভাবশালীরা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুভিটাহীন পরিবারগুলোও বসবাস করছে। তাদের পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পরিবারগুলো বলছে, সরকারের প্রয়োজন হলে আমাদেরকে উচ্ছেদ করতেই পারে; কিন্তু, আমাদের পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। কারণ, উচ্ছেদ হলে আমরা যাব কোথায়? ইতিমধ্যে তারা তাদের দখলীয় জমির একসনা বন্দোবস্ত পেতে পানি উন্নয়ন বোর্ড বা প্রশাসনে বারবার আবেদন করেছে। কিন্তু, প্রভাবশালীদের চাপের মুখে সেই বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে না। প্রভাবশালীরা তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে।

বিদ্যমান অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার ৩ (ঘ)-তে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে সরকারের অন্য কোনো প্রয়োজনে না লাগলে সংশ্লিষ্ট জমি দখল বিবেচনায় এনে পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। তবে, বাস্তবে রেন্টসিকার ভূমিদস্যুদের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীনরা দখলে থাকার পরও ওই খাসজমির একসনা বন্দোবস্ত পাচ্ছে না। এখানে ডুমুরিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু অসাধু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা ঘুষ খেয়ে ওইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুভিটাহীন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন না করেই উচ্ছেদ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

৩.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দঃ স্কোরিং

‘অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫’-কে ৪টি নির্দেশকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্কোরিং করা হয়েছে। এই ৪ টি নির্দেশক হলো: (১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব। প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই ‘০’ থেকে ‘৫’ এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছেঃ যেখানে ‘০’ নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, অন্যদিকে ‘৫’ স্কোর মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। সবশেষে, এই ৪ টি নির্দেশকের প্রতিটি স্কোরের একটি গড়ও করা হয়েছে।

এই ৪ টি নির্দেশকের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে ‘প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য’– এই নির্দেশকে (স্কোরঃ ২.২)। মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ‘সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব’—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ৩.৩। তুলনামূলক মন্দ অবস্থানে রয়েছে বাকি দুটি নির্দেশক, ‘সাংঘর্ষিকতা’ ও ‘অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা’ (উভয়ের ক্ষেত্রেই স্কোরঃ ৩.৪)। লেখচিত্র-১০ এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হলো। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.১।

লেখচিত্র ১০: স্কোরিং—'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর আইনি সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.১

অন্যদিকে, এই নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশকের মাধ্যমে: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। আগের মতোই '০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে, এবং সবশেষে করা হয়েছে একটি গড়। '০' অর্থ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, '৫' নির্দেশ করেছে সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে–'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' ও 'রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন'- নির্দেশক দুটি, উভয়েরই স্কোর ০.৮। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' (স্কোর: ০.৯)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় আছে 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব', 'জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি' এবং 'সমন্বয়হীনতা' নির্দেশকগুলো (প্রত্যেকেরই স্কোর ১.১)। সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা নির্দেশক 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা'-এর অবস্থাও মন্দ; স্কোর: ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.১, অর্থাৎ, মন্দ অবস্থা যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতিগুলোর বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়ে কিছু বেশি হলেও মোটেও সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ১১-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১১: স্কোরিং— 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.১

নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নীতিমালার তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতিমালার সমস্যার গড় স্কোর: ৩.১, এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ১.১)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতিমালার সমস্যার স্কোর ৩.১ (৬২% অর্জন) এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ১.১ (মাত্র ২২% অর্জন) (লেখচিত্র-১২)।

লেখচিত্র ১২: 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

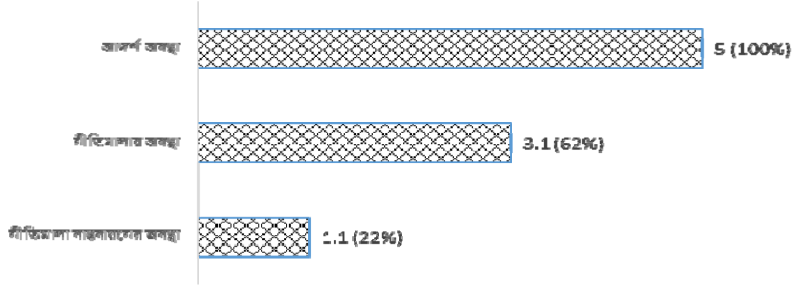

৩.৮ সুপারিশমালা

আইনসংশ্লিষ্ট[৪১]

১) 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর অনেক কিছুই পরিবর্তন করা জরুরি (যেমনঃ থানার পরিবর্তে উপজেলা, ৪টি মেট্রোপলিটন সিটির পরিবর্তে ৮টি প্রভৃতি)। প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নমুখী সংস্কার করে খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা জরুরি।

২) দেশের অকৃষি খাসজমির পুরো ব্যবস্থাপনাটুকুই হচ্ছে 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর মাধ্যমে, আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির অনুপস্থিতির প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ একটি আইন এখন সময়ের দাবি। এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইন জরুরি।

৩) অবৈধ দখলকৃত অকৃষি খাসজমি উদ্ধারের বাস্তবসম্মত আইনি বিধান থাকা জরুরি।

৪) বন্দোবস্ত দেয়ার পর কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে বন্দোবস্ত বাতিলের বিধান থাকা দরকার।

৫) বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার তালিকা।

৬) পৌর এলাকা এবং থানা সদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমিকে অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

৭) সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অকৃষি খাসজমি বরাদ্দের বিষয়টির ন্যায্য সমাধানের জন্য চাই সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট

১) অকৃষি খাসজমির ধরন, অবস্থান, বিতরণ অবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তিগত অবস্থা ইত্যাদি সব ধরণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি খাস ভূমি ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন। অকৃষি খাসজমিসংশ্লিষ্ট এই হালনাগাদ তথ্যাদি সবার জন্য করতে হবে উন্মুক্ত; তথ্য প্রাপ্তি করতে হবে সহজতর।

---

[৪১] অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর ওপর পরিচালিত নিবিড় গবেষণালব্ধ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো পাওয়া যাবে এখানেঃ বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ- প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (চতুর্থ খণ্ডঃ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত এবং অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা* ও বন্দোবস্ত)। ঢাকাঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। পরিশিষ্ট ২-এ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোসহ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাটি সংযুক্ত করা হলো।

২) অকৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়টি যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে যেন প্রকৃত দাবিদারের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে চাই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। অকৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণের সমস্যাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলোতে (রেডিও, টিভি ও বাংলা দৈনিকসহ) প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি।

৩) অকৃষি খাসজমি প্রাপ্তির আবেদনের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য সহজ করা দরকার। অযথা কালক্ষেপণ যেন না হয়, সে জন্য চাই নজরদারি।

৪) অকৃষি খাসজমি বিতরণের জন্য জেলা এবং উপজেলাপর্যায়ে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। অকৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ, বিতরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান, পর্যালোচনা, তালিকা প্রণয়ন, দখল, অর্পণ ইত্যাদি দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা কমিটির কাছে অর্পণ করা উচিত। উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা কমিটিতে আপিল করতে পারবেন এই বিধান থাকা প্রয়োজন।

৫) কমিটি গঠন এবং সেটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জমির বাজারদর নির্ধারণের বিষয়টি স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য একই রকম সহজ করা দরকার, অযথা কালক্ষেপণ যেন না হয় সেজন্য চাই নজরদারি।

৬) পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে অকৃষি খাসজমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড়ি জমিতে, বিশেষ করে যার সাথে জীববৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট বনজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হবে; প্রাকৃতিক অবস্থার রূপান্তর যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেটি নিশ্চিত করা চাই; এজন্য সামাজিক চাপ প্রয়োগ ও নজরদারি জরুরি।

অধ্যায় ৪

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা

সারকথা: যেসব জলাশয় বছরের একটি বড় সময় জলমগ্ন থাকে সেগুলোই জলমহাল। এদের পরিচিতি নানান নামে—পুকুর, বিল, ঝিল, ডোবা, খাল, হাওর, বাওর এমন কত বিচিত্র উপাধা। জলমহাল মিঠাপানির গুরুত্বপূর্ণ এক উৎস। জলজ-জীববৈচিত্র্যের ধারক-বাহক তো বটেই, একই সঙ্গে এক বিশাল জনগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার উৎসই এই জলমহাল। এ দেশের প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা আবর্তিত হয় এই জলাশয়কে কেন্দ্র করেই। অথচ এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে। তাদের এই দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অধিকারহীনতা-প্রান্তিকতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো জলমহালে তাদের আইনসঙ্গত অধিকার নিশ্চিতে নেই কোনো কার্যকর ব্যবস্থা।

দেশের জলমহাল-বিষয়ক প্রচলিত সর্বোচ্চ আইনি দলিলটির নাম "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯"। আপাতদৃষ্টিতে এই নীতি প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য অনুকূল মনে হলেও, বাস্তবে এতে রয়ে গেছে অন্তর্নিহিত বেশ কিছু সমস্যা, যা এর বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো কেবল প্রকট থেকে প্রকটতরই করে তুলছে। এই নীতি অনুযায়ী মৎস্যজীবী সমিতিকে জলমহাল ইজারা দেয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের যে পথনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করা অধিকাংশ নিরক্ষর মৎস্যজীবীর জন্য মোটেও সহায়ক নয়। ইজারার মেয়াদ ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৬ বছর, যা মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করে না; বরঞ্চ প্ররোচিত করে যাচ্ছে যথেচ্ছা মৎস্য নিধনে। জলমহালের ইজারা বন্দোবস্তের নির্ধারিত অর্থমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত-দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয়ত্তের বাইরে। ফলে, তাদের নির্ভর করতে হয় ধনী ব্যক্তি বা মহাজনের ওপর—জলমহালের নিয়ন্ত্রণ থেকে যায় রেন্টসিকার এই গোষ্ঠীর হাতেই। অন্যদিকে নীতি অনুযায়ী ইজারার আর্থিক মূল্য কিস্তিতে দেবারও কোনো সুযোগ নেই, তাই মহাজনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না দরিদ্র মৎস্যজীবীদের।

জলমহাল সাব-লিজ দেয়া নিষিদ্ধ, অথচ বাস্তবে এই চর্চা ঘটছে সবার চোখের সামনে। জলমহাল উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ব্যবহার, জলমহাল ব্যবহারের মৌলনীতি—"জাল যার, জলা তার"—সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। নীতি অনুযায়ী শুধু প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী; অথচ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় অমৎস্যজীবীরাও এই কাজ করছে। মৎস্যজীবীরা সমিতির সদস্য হিসেবে থাকলেও, সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ থাকে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতেই। সমিতি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী সব না করতে পারলে ইজারা বাতিল হবার বিধান মানা হয় না বললেই চলে। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সহায়তায় সহজ

শর্তে ঋণের কথা বলা হলেও, ব্যাংকগুলোর এ ব্যাপারে কোনোই উৎসাহ-উদ্যোগ নেই। জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংসদ সদস্যগণ উপদেষ্টা হিসেবে থাকেন, তাদের বিরুদ্ধে অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ অনেক। জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা নিশ্চিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজের তেমন কোনো সক্রিয় উদ্যোগই নেই। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায়, প্রশাসনের সহযোগিতায় অনেক জায়গায় নীতি লঙ্ঘন করে প্রবহমান পানি আটকে মাছ চাষ করা হচ্ছে। চুক্তিবদ্ধ সমিতির জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের বিষয়টি বরাবরই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রভাবশালী ইজারাদারেরা বর্ষা মৌসুমে পানি যতদুর যায়, ততদূর নিজেদের সীমানার বিস্তৃতি ঘটিয়ে ফেলে—অধিকার বঞ্চিত হয় সাধারণ মৎস্যজীবীরা। কোনো কমিটিতেই নেই নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, এ বিষয়ে নেই কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনাও। সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের কার্ড দেয়া নিয়ে হয় ব্যাপক অনিয়ম।

নীতির নিজস্ব সমস্যার তুলনায় বাস্তবায়ন সমস্যা অনেক তীব্র। আদর্শ স্কোর '৫' এর মধ্যে নীতির সমস্যার স্কোর ৩.৫ (অর্থাৎ, ৭০% অর্জন), অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নে সমস্যার স্কোর মাত্র ০.৯, অর্থাৎ আদর্শের তুলনায় মাত্র ১৮% অর্জন।

প্রান্তিক জলা-মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষায় চাই পূর্ণাঙ্গ একটি আইন এবং কার্যকর বিধিমালা। দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বিবেচনায় ইজারা-মূল্য পুনর্নির্ধারণের পাশাপাশি ব্যাংকিং এবং কিস্তি সুবিধাও প্রয়োজন। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় চাই ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। বিলুপ্তি প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিধান। সাব-লিজ বন্ধ করতে প্রয়োজন কঠোরতর আইনি বিধান। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যেন জলমহাল ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য আইনি-প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজন সংগঠিত সামাজিক তদারকি।

৪.১ ভূমিকা

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' অনুযায়ী, জলমহাল হলো সেইসব জলাশয় যা বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর নামে পরিচিত। জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না। ভূমি মন্ত্রণালয়ের '২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (খসড়া)'য় দেশের মোট বদ্ধ জলমহাল-এর প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রণীত হয়েছিল। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪২৬-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর অনুকূলে ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যা ছিল ১৫৪ টি।

তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে জলমহালের সংখ্যা হলো:

১) ২০ একরের ঊর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা- ২,৪৯৭টি;

২) ২০ একরের নিচে জলমহালের সংখ্যা- ৩২,৮৪২টি;

আবার, প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত কিছু জলমহালগুলোকে অভয়াশ্রমও ঘোষণা করা হয়েছে।

১) গাজীপুর জেলার– কামশন বিল, আউলা বিল, গলাচিপা কুম বিল, গাবতলী বিল, এবং সৈয়দপুর কুম জলমহাল;

২) শেরপুর জেলার মালিজি নদীর ধেয়ার কুর জলমহাল;

৩) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন যদুরিয়া বিল (হাইল হাওড়), চাপড়া মাগুরা বিল (বাইক্কা বিল), এবং হাকালুকি হাওড়, মাইছলার ডাক, টোলার বিল জলমহাল;

৪) সিলেট জেলার কেন্দ্রী বিল জলমহাল;

৫) সুনামগঞ্জ জেলার টাংগুয়ার হাওড় জলমহাল; এবং

৬) নেত্রকোনা জেলার ফরিদপুরের ঘোনা জলমহালটি অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কিছু জলমহাল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পে হস্তান্তরিতও হয়েছে। তা হলো—

১) স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (হিলিপ) প্রকল্পে ১৪২৬ বাংলা সনে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ২৪০টি জলমহাল হস্তান্তরিত রয়েছে।

২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পে ১৪২৯ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৭৮৩টি পুকুর হস্তান্তরিত রয়েছে (ভূমি মন্ত্রণালয়, ২০১৮-১৯)।

মিঠাপানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহাল শুধু জলজ জীববৈচিত্র্যের ধারক-বাহক নয়; একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবন-জীবিকার উৎসও এটি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জল-জলাসংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৎস্যখাতে স্থায়ী-প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে ১২ লক্ষ মানুষ; আর ১ কোটি

২০ লক্ষ মানুষ কাজ করছে ঋতুভিত্তিক-সাময়িক। বিপুলসংখ্যক এই মানুষ নানানভাবে জলমহালের ওপর নির্ভরশীল; তাদের জীবন, জীবিকা, এবং সংস্কৃতি আবর্তিত হয় এই জলরাশিকে কেন্দ্র করেই। পরিতাপের বিষয়, ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর ৮০ লক্ষই দরিদ্র। সদস্য-সদস্যাসহ মৎস্যজীবী পরিবারে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যাদের অর্ধেকের বেশি যেকোনো মাপকাঠিতেই দরিদ্র এবং যাদের দৈনন্দিন আয়-প্রবাহ অতিমাত্রায় অনিশ্চিত (বারকাত, ২০১৬)।

মৎস্যজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার প্রধান কারণ হলো জল-জলায় আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত (legal and justiciable) অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। জলমহাল লিজ-চুক্তি তাদের আইনি অধিকার ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম। আইনগতভাবেই জলমহাল লিজ নেবার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের-সমবায় অগ্রাধিকার পাবার কথা। অথচ, বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুর্বৃত্ত রেন্টসিকাররা দুর্নীতি-কারচুপির মাধ্যমে জলমহাল লিজ নেন এবং/অথবা লিজ গ্রহণকারীর কাছ থেকে নিয়মিত অথবা এককালীন কমিশন নেন। রেন্টসিকার লিজ-হোল্ডাররা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কেবল বঞ্চিতই করছেন না, তাদের শ্রমের ফসল (জলা-খাজনা) আত্মসাৎ করছেন; মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১ হাজার ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দরিদ্র মৎস্যজীবীর দারিদ্র্য হ্রাস-এর চিন্তা সুদূরপরাহত, দারিদ্র্য-দূরীকরণ তো প্রায় অসম্ভব। এ কথা আরো সত্য এ জন্য যে, দেশের মোট ১২ লক্ষ একর খাস জলাভূমির মাত্র ৫ শতাংশ এ পর্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ খাস জলাভূমিই বেদখল-জোরদখল হয়ে আছে (বারকাত, ২০১৬)।

এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে এখন মাত্র ১০ শতাংশ এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। জল-জলা সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবীকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার, জলা তার"। এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টিসংক্রান্ত দারিদ্র্য (income-food-nutrition poverty) দূর হতে পারে যথেষ্ট মাত্রায়। এসবই মৎস্য খাতের ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মৎস্য রপ্তানি থেকে আয় বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস নাও হতে পারে, এ দেশের মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ, এ সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য কমবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মালিকানা ও

অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। প্রকৃত অর্থেই, এটি জলা সংস্কারের (aquarian reform) বিষয় (বারকাত, ২০১৬)।

জলমহাল নিয়ে কিছু গবেষণা থাকলেও এর নীতি সংশ্লিষ্ট গবেষণার অভাব রয়েছে; নীতি বাস্তবায়ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট গবেষণার অভাব আরো প্রকট। আমরা গবেষণায় এ বিষয়ে কী মাত্রায় কী পরিমাণ বাস্তবায়ন সমস্যা রয়েছে তা দেখার চেষ্টা করেছি। জলমহালবিষয়ক নীতির প্রয়োগোপযোগী ব্যবস্থাপনা, কাঠামো/পরিকাঠামো, নীতিনির্দেশনা, অবকাঠামো-মানবসম্পদ-অর্থের যোগান, সমন্বয়, উপযোগী পরিবেশ ও আচরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীও আমাদের গবেষণার পরিধিভুক্ত ছিল।

৪.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

ঐতিহাসিকভাবে, নদী, বিল, হাওর ও বাঁওড়গুলোতে বিনা মূল্যে বা কিছু টোল দিয়ে বা তাদের মাছ ধরার কিছু অংশ রাষ্ট্রের লোকদের হাতে তুলে দিয়ে মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরার প্রথাগত অধিকারগুলো ভোগ করত। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ব্রিটিশ সরকার ভূমি অধিকারের একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল, যার অধীনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জলাশয়, নদী, বিল, হাওর ও বাঁওড়সহ ভূমির বিশাল অংশের মালিকানা দেয়া হয়েছিল। তারা জমিদার হিসেবে পরিচিত বা ভূমি মালিক ছিল যারা জলমহালগুলো (নদীগুলোর শাখা, বিল ও বাওড়ের এককভাবে/ গোষ্ঠীগত মালিক), মাছ সংগ্রহের জন্য সমৃদ্ধশালী ইজারাদারদের কাছে ইজারা দিতেন। ইজারাদারেরা মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের জড়িত করতেন বা কখনো কখনো মৎস্যজীবীরা টাকার বিনিময়ে মাছ ধরার অধিকার পেতেন। জলমহাল বা জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের সরাসরি মাছ ধরার অধিকার ছিল না, সাধারণত মৎস্যজীবীরা ধনী ও শক্তিশালী মহাজনদের শোষণের শিকার হতেন। মহাজনদের কাছ থেকে তারা মাছ ধরার সরঞ্জাম কিনতেন এবং মাছ ধরা বন্ধ থাকাকালীন জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণ নিতেন।

১৯৫০ সালে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, হ্রদের মতো জলমহালগুলোর মালিকানা মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল। 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০'-এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলা সরকার (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান) জমিদারদের খাজনা নেয়ার অধিকার পেয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ এভাবে জমিদারদের বসতভিটার পুকুর, দীঘিসহ সমস্ত জলমহালের মালিক হয়ে যায়। পূর্ববর্তী প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ (এখন ভূমি মন্ত্রণালয়) জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত জলমহালগুলোর প্রশাসন ও পরিচালনার ব্যবস্থা ধরে রেখেছে। তবে, ১৯৬৫ সালে দরিদ্র জেলেদের সহায়তার জন্য সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত জেলেদের সমবায় সমিতিগুলোকে জলমহাল ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল (UK Essays, 2015)।

৪.৩ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি[৪২]

পাকিস্তানি উপনিবেশিক আমলে ১৯৫১ সালে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রবর্তন করে সর্বপ্রকার নব্যস্বত্ব বিলোপের মাধ্যমে সকল অভ্যন্তরীণ জলমহাল অর্থাৎ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাঁওড়, ইত্যাদি সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে অনেক জলমহালের স্বত্ব নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার কারণে অধিকাংশ জলমহাল এবং অনুরূপভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের অনেক জলমহাল সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে থেকে যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক জারিকৃত (১৯৭২ সালের ৩রা আগস্টে জারিকৃত) রাষ্ট্রপ্রধানের ১০নং আদেশবলে ওইসব মামলা নাকচ বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে ওইসব জলমহালসমূহও সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে (ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়, ১৯৭৪)।

১৯৭৩-১৯৭৪ সালে রাজস্ব বোর্ড জেলাগুলোর কালেক্টরদের (বর্তমানে জেলা প্রশাসক হিসেবে মনোনীত) মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে জলমহাল ইজারা দিয়েছিল। সর্বোচ্চ দরদাতাদের জলমহাল ইজারা দেয়ার জন্য উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইজারাদারেরা সাধারণত সহযোগী হিসেবে জেলেদের সামনে ব্যবহার করেছিল এবং জেলেদের কাছ থেকে সাব-লিজের মাধ্যমে জলমহালগুলো নিয়ে তারা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।

১৯৭৪-১৯৮৪ সময়কালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশের মাধ্যমে সবকটি জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। জলমহাল ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে রাজস্বভিত্তিক থেকে আরও টেকসই ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে সরানোর প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়া হলেও তা পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। নদী ও খালের জন্য জলমহালের ইজারা এক বছরের মেয়াদে (বাংলা বছর) দেয়া হয়েছিল; যেখানে বিল, বাঁওড় এবং বড় পুকুর বা জলাশয়গুলোর ইজারা সাধারণত তিন বছরের জন্য দেয়া হয়েছিল। তখন একবার ইজারা দেয়া জলমহালের দখল ইজারাদারদের কাছে হস্তান্তরিত হলে, অনেকক্ষেত্রেই ইজারাদারেরা জলমহালগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত এবং মাছ বা চিংড়ি ধরার প্রাকৃতিক উৎসগুলো ধ্বংস করত।

১৯৮৪-১৯৮৬ সময়কালে আলোচনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে ইজারা দেয়ার জন্য উন্মুক্ত নিলাম পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, তবে তা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জলাশয়গুলোকে ইজারা দেয়ার প্রকাশ্য নিলাম পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে সিল টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে বিড বা নিলামে পরিবর্তন করা হয়েছিল, তবে নিলাম সম্পর্কিত অন্য সব শর্ত অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। ২০ একরের জলমহালকে নতুন করে নির্মিত উপজেলা

---

[৪২] এই উপ-অধ্যায় (৪.৩) রচনায় 'UK Essays, 2015'-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

পরিষদগুলোতে তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে ২০ একরের জলমহালগুলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল পরিচালনাকারী উপজেলা পরিষদ, বিধি অনুযায়ী জলমহাল থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১ শতাংশ ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করতো। ২০ একরের উর্ধ্বে অন্যান্য উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলমহালগুলো ভূমি মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হতো।

১৯৮৬-১৯৯৫ সময়কালে জলমহাল নিয়ে যা ঘটেছে তা হলো এ রকম: মৎস্যসম্পদের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এবং জলাশয়গুলোতে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত স্থানে 'নিউ ফিশারি ম্যানেজমেন্ট পলিসি (এনএফএমপি)'-এর আওতায় একটি লাইসেন্স চালু করা হয়েছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত জলমহালগুলো মৎস্য অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছিল। এই নীতিমালার লক্ষ্য ছিল, জীবিকার জন্য পুরো সময় মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রকৃত জেলে হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে মৎস্যজীবীদের জন্য বেশকিছু জলাশয় সংরক্ষণ করা। তখন ইজারা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ করে, এনজিও থেকে ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে তার অগ্রগতি ছিল ধীর, ভূমি মন্ত্রণালয় তার আয়ের প্রধান উৎস ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে, জলাশয়গুলো থেকে সরকারের উপার্জন হ্রাস পেয়েছে; জলাশয়গুলোর উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং জৈবিক সম্ভাবনার সাথে লাইসেন্স ফি সংযোগ করতে ব্যর্থতার কারণে মৎস্যজীবীরা মাঝে মাঝে লাইসেন্স ফি দিতে ব্যর্থ হতো, কারণ অনেক মৎস্যজীবীদের জন্য লাইসেন্সের ফি খুব বেশি ছিল এবং ফি প্রতি বছর বাড়তো। অধিকন্তু, যারা মৎস্যজীবী নয়, তারা ধনী মৎস্যজীবীদের সহায়তায় জলাশয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ওইসব ব্যর্থতার কারণে এবং কমিউনিটির সাথে জড়িত প্রকল্পভিত্তিক পদ্ধতিগুলো প্রচলনের পর থেকে ওই নীতিটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৯৫-১৯৯৬ সময়কালে প্রবাহিত নদীগুলোর জন্য ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং যান্ত্রিক নৌকাগুলো ব্যবহার করে যারা মাছ ধরেন তারা বাদে সবক্ষেত্রেই মাছ ধরা বিনামূল্যে ঘোষণা করা হয়েছিল। নীতিটি দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে প্রণীত হয়েছিল। এই উন্মুক্তকরণের ফলে মাছ ধরা ছিল অনিয়ন্ত্রিত এবং মাছ সংরক্ষণ করার বিষয়টি হুমকির মুখে পড়েছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং মাস্তানরা কিছু অঞ্চলে নদীর জলাশয়গুলো নিয়ন্ত্রণ এবং মৎস্যজীবীদের হয়রানি ও শোষণ করে।

কমিউনিটিবেইজড ফিশারি ম্যানেজমেন্ট (সিবিএফএম) প্রকল্পটি ১৯৯৫ সালের শেষ থেকে ১৯৯৭ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পটিতে সরকারের (ডিওএফ) সাথে অংশীদার ছিল এনজিও—কারিতাস, প্রশিকা, ব্র্যাক, বাঁচতে শেখা, সিআরইডি এবং আইসিএলআরএম। সিবিএফএম হলো একটি অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা, যেখানে

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার এবং মৎস্য কমিউনিটির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এই পদ্ধতির অধীনে ব্যবহারকারীরা তার টেকসই ব্যবহার এবং সুবিধাগুলোর ন্যায়সঙ্গত বিতরণ নিশ্চিত করতে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন।

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পটি ২০০০ সালে শুরু হয়েছিল, এতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে মাছ ধরা কমিউনিটির ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপকভাবে জড়িত করা হয়েছিল, প্রকল্পের সুবিধাভোগী কমিউনিটি অর্থাৎ মৎস্যজীবীরা যাতে এই প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্ষতিপূরণমূলক হস্তক্ষেপের সুবিধা ধরে রাখতে পারে। প্রকল্পটিতে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য ৪৯টি সাইটে ১৪টি এনজিওকে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অফিসিয়াল বক্তব্য হলো— মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যাতে গ্রামীণ অভিজাত বা প্রভাবশালীদের দখল প্রচেষ্টা রোধ করতে পারে সে জন্য এনজিওদের সংযুক্ত করা।

১৯৯৫ সাল থেকে প্রবাহিত নদীর জলমহালগুলো ইজারা মুক্ত করতে এবং মাছ ধরার প্রয়োজনে সবার জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। জলাশয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও জাতীয় মৎস্য নীতি অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে টেকসই ভিত্তিতে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) দায়বদ্ধ। ২০০৫ সালে সরকার একটি নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি করে, তবে প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং মৎস্য সংরক্ষণসম্পর্কিত বিবেচনার অভাবে এটি ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

সরকারিভাবে বলা হয় যে "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৫" সরকারি জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত। কিন্তু এর বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি ত্রুটি ও অন্তরায় লক্ষণীয়:

১) রাজস্বকেন্দ্রিক নীতি শুধু ধনী ব্যক্তিদের ইজারা পাওয়ার অনুমতি দেয় এবং দরিদ্র প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত করে।

২) ইজারাগ্রহীতাকে তার সম্পত্তির অধিকার (জলাশয়কেন্দ্রিক) নির্দিষ্ট করে দেয় না।

৩) ইজারার কৌশলসম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও আলোচনা হয় না।

৪) বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে উৎসাহ এবং জড়িত থাকার বিষয়ে আগ্রহে অভাব থাকে।

৫) স্বল্পমেয়াদি ইজারা নীতি মৎস্যজীবীদের কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক চাষের পদ্ধতি প্রবর্তন করা থেকে বিরত রাখে।

সরকার ২০০৫ সালের নীতির কিছু বিধান পরিবর্তন আনার মাধ্যমে ২৩ জুন, ২০০৯ সালে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনক্রমে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' গ্রহণ করে। এই নীতির পরিবর্তন বা সংশোধনীগুলো হলোঃ

১) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এই মর্মে সুপারিশ করবেন যে, সমিতির সদস্যরা প্রকৃত মৎস্যজীবী কি না; তিনি সুপারিশ করার পর উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্দিষ্ট জলাশয়সংলগ্ন বসবাসরত প্রকৃত মৎস্যজীবী বা জেলেদের সমবায় সমিতির তালিকা প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করবেন।

২) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ একরের ঊর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর নেতৃত্বে পরিচালিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ইজারার অনুমোদন দেবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যরা জেলা জলমহাল কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন এবং উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য।

৩) জলাশয়সংলগ্ন যেকোন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়/গোষ্ঠী/সমিতির বাসিন্দা সেই নির্দিষ্ট জলাশয়ের সুবিধাভোগী হবেন।

৪) ২০ একর অবধি বদ্ধ জলাশয়ের ইজারার মেয়াদ ১ বছর থেকে ৩ বছরে বেড়েছে।

৫) ইজারাগ্রহীতাদের জলমহালগুলো সাব-লিজ দেয়ার অনুমতি নেই এবং ওই জলাশয় অবশ্যই মাছের উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৬) উপজেলা ও জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, কৃষি অধিদপ্তর এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৭) জেলা প্রশাসক (ডিসি) সরকারি জলাশয়ের তালিকা বার্ষিক হালনাগাদ করবেন এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর জন্য নোটিশ বোর্ড, স্থানীয় দৈনিক এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেবেন।

৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি জলাশয়গুলো পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে বরাদ্দ দেয়া হবে।

৯) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন বা সমিতি যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে এবং নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবেন।

১০) দেশের সব জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা নিশ্চিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসম্বলিত

একটি ডেটাবেজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সংরক্ষণ করতে হবে। ডেটাবেজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করতে হবে।

১১) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সারাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রবর্তন করবে।

১২) সরকারি জলমহালসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের জন্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ভিত্তিক একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে।

৪.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতি: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

দেশের জলমহালবিষয়ক সর্বোচ্চ আইনি দলিলটির নাম "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯"। এই নীতি অনুযায়ী:

- যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার এবং বিক্রি করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন (অনুচ্ছেদ ২)।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০ (বিশ) একরের ঊর্ধ্বে সরকারি জলমহালগুলো ৩ বছর মেয়াদে এবং 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ২০ একরের ঊর্ধ্বে সীমিতসংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬ বছরের জন্য স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকে ইজারা দেবেন (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৭)।
- জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির কাছে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করে দৈনিক পত্রিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। আবেদন আহ্বানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে (অনুচ্ছেদ ৫)।
- কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত পাবেন না (অনুচ্ছেদ ৫)।
- আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে ওই সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবেন। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট

জলমহালের ইজারামূল্যের ২০ শতাংশ ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে জমা দেবেন (অনুচ্ছেদ ৫)।

- প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের ইজারামূল্যের গড় নির্ধারণ করে, এর ওপর ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে ইজারামূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারামূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের ওপর কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বর্ধিত হারে ইজারামূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারামূল্যেই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারামূল্য ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬)।
- ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাব-লিজ দেয়া যাবে না। যদি সাব-লিজ দেয়া হয়, তাহলে ওই জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ওই ইজারাগ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোনো জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন না (অনুচ্ছেদ ৯)।
- প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ ১২)।
- ইজারা দেয়া জলমহালগুলোতে ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কি'না সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে (অনুচ্ছেদ ১৩)।
- দেশের সব জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত সব তথ্যসম্বলিত একটি ডেটাবেজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সংরক্ষণ করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ওই ডেটাবেজ তৈরি ও সফটওয়ার প্রণয়নের ব্যবস্থা করবে (অনুচ্ছেদ ১৭)।
- বদ্ধ ও উন্মুক্ত সব জলমহালে মৎস্যসম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্যবিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচে নমুনা মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড

পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে; তবে, এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৯)।

- বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২১)।
- সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্তগ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবে (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকতে হবে) (অনুচ্ছেদ ২৩)।
- সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা নিবন্ধিত কোনো মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায়দায়িত্ব বহন করবে এবং এক্ষেত্রে কোনো সরকারি জলমহালে ওই সমিতির ইজারা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/ বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে (অনুচ্ছেদ ২৪)।
- বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার শুধু ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে (অনুচ্ছেদ ২৬)।
- ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করতে পারেন (অনুচ্ছেদ ২৮)।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার করা না হয় এবং “মা” মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং জেলা প্রশাসক অথবা ইউএনও এর লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা শুধু মাছ শিকার করতে পারবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবেন (অনুচ্ছেদ ২৯)।
- সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করবেন (অনুচ্ছেদ ৩১)।

৪.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা

২০০৫ সালের নীতিমালার ভিত্তিতে সরকারি “জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯” তৈরি করা হয়েছিল। এতে নিবন্ধন, প্রকৃত মৎস্যজীবী বা জেলেদের মাছ ধরার প্রবেশাধিকার, সাব-লিজের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সে অর্থে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য অনুকূল বলে মনে হয়। তবে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে, যা নীতিটির বাস্তবায়নেও সমস্যা তৈরি করেছে ।

নীতির অনুচ্ছেদ ৫ (৪) (গ)-তে বলা হয়েছে যে, জেলা প্রশাসক একটি দৈনিক পত্রিকায়, ডিসি অফিসের ওয়েব পোর্টালে এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ বোর্ডে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়ার আবেদন করার জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবেন। কিন্তু প্রচারের এই পদ্ধতি ও মাধ্যম বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৎস্যজীবীরা বাস করেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, হালনাগাদ তথ্য জানার সুযোগ তাদের অতি সীমিত। এমনকি ওই বিষয়ে মৎস্যজীবীদের বোধগম্যতাও কম কারণ, তাদের একটি বড় অংশই নিরক্ষর।

অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৭-এ জলমহালের ইজারার মেয়াদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বের পদ্ধতিতে ইজারার মেয়াদ ছিল ১০ বছর বা তারও বেশি, যা কমিয়ে ৬ বছর করা হয়েছে। ইজারার এই মেয়াদ হ্রাস টেকসই ব্যবস্থাপনাকে বাধাগ্রস্ত করে। ইজারার মাধ্যমে জলমহালের স্বল্পমেয়াদি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থাটি মৎস্যজীবী এবং মৎস্যসম্পদ উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই পদ্ধতি ইজারাগ্রহীতাদের অতিরিক্ত মাছ আহরণেই উৎসাহিত করে। ইজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ কম থাকায়, মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নের কথা না ভেবে কম সময়ে লাভ নিশ্চিত করার জন্য যথেচ্ছা মৎস্য নিধন করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫-এ জলমহালের ইজারা দেয়ার মূল্য প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অবস্থা বিবেচনায় বেশি। জলমহালের ইজারা বন্দোবস্তের নির্ধারিত অর্থমূল্য দেয়া দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সাধ্যের বাইরে। ফলে, ধনীরাই জলমহাল ইজারা পেয়ে যান। জলমহাল ইজারাসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকায় এবং ওয়েবসাইটে প্রচার করা হলেও দরিদ্র মৎস্যজীবীর কাছে তা পৌঁছে না। জলমহাল ইজারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পক্ষে অগ্রাধিকার হিসাবে নির্দিষ্ট করা থাকলেও, দরিদ্র ভূমিহীন প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ইজারার অর্থ দেয়ার সামর্থ্য নেই বলে তাদের ধনী ব্যক্তি বা মহাজনের ওপর নির্ভর করতে হয়। রেন্টসিকার এই গোষ্ঠী মৎস্যজীবী সমাজের পক্ষে জলমহাল ইজারার অর্থ প্রদান করেন; ফলে, জলমহালগুলোর পুরো নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকে।

প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অবস্থা বিবেচনা করা হলে সহজেই বোঝা যায় যে, জলমহাল ইজারা নেয়ার পুরো টাকা এক সাথে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ, অনুচ্ছেদ ৫ (১১) এবং অনুচ্ছেদ ৭ (৭) অনুযায়ী জলমহাল ইজারার টাকা কিস্তিতে ও আংশিক প্রদানের সুযোগ নেই।

৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যে জলমহাল ইজারা দেয়া হয়েছে, তা কোনোভাবেই সাব-লিজ দেয়া যাবে না। যদি কোনো জলমহাল সাব-লিজ দেয়া হয়, তাহলে জলমহালের মূল ইজারাসংশ্লিষ্ট ডিসি/ইউএনও কর্তৃক বাতিল হয়ে যাবে এবং জমাকৃত অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং জলমহাল ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র আগামী ৩ বছরের জন্য ওই ইজারাগ্রহীতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। কিন্তু, বাস্তবে সাব-লিজ চালু রয়েছে। সুতরাং, যথাযথ কার্যকরকরণ নিশ্চিত করার জন্য শাস্তি হিসেবে আরো কঠোর বিধান করা উচিত, যেমন– জলমহাল সাব-লিজপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত এবং ভবিষ্যতে আরো ইজারা নেয়ার অনুমতি পাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করার কৌশলগুলোর অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সীমিতসংখ্যক জলমহাল পরিচালনা করবে। এই পরীক্ষামূলক জলমহালের জন্য ইজারারমূল্য গত ৩ বছরে গড়ে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অধীনে কিছু জলমহালের প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ভূমিকা বা দায়িত্ব-কর্তব্য অথবা জড়িত থাকার বিষয়টি পরিষ্কার নয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের এই বিধানটি জলমহাল ব্যবস্থাপনার মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিরোধী। জলমহাল নীতির প্রকৃত অর্থ—"জাল যার জলা তার"—ধরে রাখতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কর্মসূচি বাদ দেয়া উচিত। যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তারাও এই নীতি অনুসারে জলমহাল ইজারায় বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে যান। সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতির (পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের) মাধ্যমে বিত্তবান রেন্টসিকাররা (যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়) অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পান, বঞ্চিত হন প্রকৃত মৎস্যজীবী।

এই সব নীতিগত ঘাটতি বা খামতির কারণে নীতিটির বাস্তবায়নে নানা সমস্যা তৈরি হয়। আবার যেসব অনুচ্ছেদে তেমন কোনো নীতিগত ঘাটতি নেই, সেগুলোর বাস্তবায়নেও রয়েছে নানা সমস্যা।

নীতির ২ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, শুধু প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার ও তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই অমৎস্যজীবীরাই প্রাকৃতিক উৎস থেতে মাছ ধরছে এবং তা ঘটছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়, প্রভাবশালীদের সহায়তায়। যিনি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনিই মৎস্যজীবী; কিন্তু, প্রভাবশালী মহল মিথ্যা পরিচয়ে জলমহালের দখল নেন। এতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা বহিঃস্থই থেকে যান।

২ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন, যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন; তবে সেই সমিতি কোনো সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। বাস্তবে দেখা যায় বেশির ভাগ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সমিতিগুলোতে কিছু প্রকৃত মৎস্যজীবী সদস্য থাকলেও, নিয়ন্ত্রণ থাকে প্রভাবশালী রেন্টসিকার অমৎস্যজীবীদের হাতেই।

নীতির ৩ (ঘ) অনুচ্ছেদে কোনো জলমহাল প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত সুফল না আনতে পারলে সংশ্লিষ্ট সমিতির ইজারা বাতিলের বিধান রয়েছে। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের ইজারাকৃত সরকারি জলাশয়ে কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে না পারলেও সংশ্লিষ্ট সমিতির ইজারা বাতিলের খুব একটা উদাহরণ নেই। কারণ, সেখানে রেন্ট-সিকার অমৎস্যজীবীদের দৌরাত্ম্য থাকে।

৫ নং অনুচ্ছেদে 'জাল যার জলা তার' এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সুবচন নির্বাসনে, তাই যা হওয়ার কথা তা হয় না।

অনুচ্ছেদ ৫ (৪) (খ)-এ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে, এর ওপর ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে ইজারামূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে। বাস্তবে, এর পুরোটা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পক্ষে যথা সময়ে পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়।

নীতির ১২ নং অনুচ্ছেদে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যাতে জলমহাল ইজারা নিতে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। বাস্তবে, দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ব্যাংক থেকে কীভাবে ঋণ নেবেন সে বিষয়ে খুব কম তথ্যই জানেন; ব্যাংকগুলোও তাদের বাড়ি থেকে সাধারণত অনেক দূরে হওয়ায় সেখানে তাদের যাওয়ার আগ্রহ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাংকগুলোর তাদের ঋণ প্রদানে কোনোই উদ্যোগ-উৎসাহ নেই।

অনুচ্ছেদ ৫ (৭) ও ৬ (২)-এ উল্লেখ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যরা জেলা ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন। বাস্তবে উপদেষ্টা হলেও তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সংসদ সদস্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকারই হরণ করে কেবল ।

৭ (৯) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো মৎস্যজীবী সমিতিকে একটির বেশি (উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে নয়) জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। বাস্তবে, প্রভাবশালী রেন্টসিকাররা একাধিক সমিতির ব্যানারে একাধিক জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে নেয়; একাধিক সমিতিকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তা বুঝেও জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কিছু করার থাকে না; কারণ বন্দোবস্তগুলো নিয়মের মধ্য দিয়েই হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৯-এ বলা হয়েছে, ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনোক্রমেই সাব-লিজ দেয়া যাবে না; যদি দেয়া হয় ইজারা বাতিল হবে। 'ছদ্মবেশী রূপে' সাব-লিজ নিয়মিত দেয়া হচ্ছে, তার কারণ হলো– দরিদ্র প্রকৃত মৎস্যজীবীদের একটা জলমহাল চালানোর মতো ক্ষমতা থাকে না, তাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। মৌসুমের বাইরে যখন মাছ ধরা বন্ধ থাকে তখন তাদের ধার-কর্য করে চলতে হয়, সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও প্রণোদনা থেকে যৎসামান্যই পায়, যা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। এর ফলে, তারা ঋণগ্রস্ত হয়। আর, সেই সুযোগ কাজে লাগায় প্রভাবশালী মাছ ব্যবসায়ীরা; তারা বড় অংকের টাকার লোভ দেখিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির ইজারাকৃত জলমহাল সাব-লিজ নিয়ে থাকে। কিন্তু, এ কারণে ইজারা বাতিলের কোনো দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, দেশের সব জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা নিশ্চিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যসম্বলিত একটি ডেটাবেজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সংরক্ষণ করতে হবে। ডেটাবেজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু, বাস্তবে এ ধরনের কোনো পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরি হয়নি, কার্যকর কোনো উদ্যোগই নেই এ লক্ষ্যে।

২১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত জলমহালের কোথাও প্রবহমান প্রাকৃতিক পানি যেন আটকে না রাখা হয়, সে বিষয়ে নির্দেশনা আছে। কিন্তু সরেজমিনে দেখা গেছে যে, টাঙ্গাইলের মধুপুর, খুলনার ডুমুরিয়া, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে নদী ও প্রবহমান জলাশয়ের পানি আটকে রেখে মাছ চাষ করা হচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়, প্রশাসনের সহযোগিতায়।

অনুচ্ছেদ ২৩-এ বলা হয়েছে যে, জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ বৃদ্ধি করবে চুক্তিবদ্ধ সমিতি। কিন্তু, বাস্তবে চুক্তিবদ্ধ সমিতি তা সঠিকভাবে করে না। কারণ, তারা অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে চায় না। এ বিষয়ে কোনো কার্যকর নজরদারিও অনুপস্থিত।

২৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, ইজারাদারদের মৎস্য আহরণ করার অধিকার শুধু ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু, বাস্তবে প্রভাবশালী ইজারাদাররা বর্ষাকালে পানি যতদূর যায় (ভাসান পানি), ততদূর পর্যন্ত নিজেদের সীমানা বিস্তৃত করে। এতে সাধারণ মৎস্যজীবীদের বর্ষা মৌসুমে তাদের ইজারার সীমানার বাইরে মাছ ধরার অধিকার থাকলেও প্রভাবশালী ইজারাদারদের বাধার মুখে তারা তা করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ৩৩ অনুযায়ী সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। কিন্তু, কমিটির সভা কত দিনের বিরতিতে অনুষ্ঠিত হবে তা নির্দিষ্ট করা নেই এবং বাস্তবে নিয়মিত সভা হয়ও না। কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করারও কোনো সুস্পষ্ট বিধান-নির্দেশনা নেই।

মাঠগবেষণায় ভূমি কর্মকর্তারা সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা কাজ করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাদের মতে, জলমহাল ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা মেনেই সবকিছু করার চেষ্টা করেন তারা। নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও সময় অনুসারে সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা করবার কথা, যা লেখচিত্র ১৩-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ১৩: ২০ একরের নিচের জলমহালের ইজারা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ

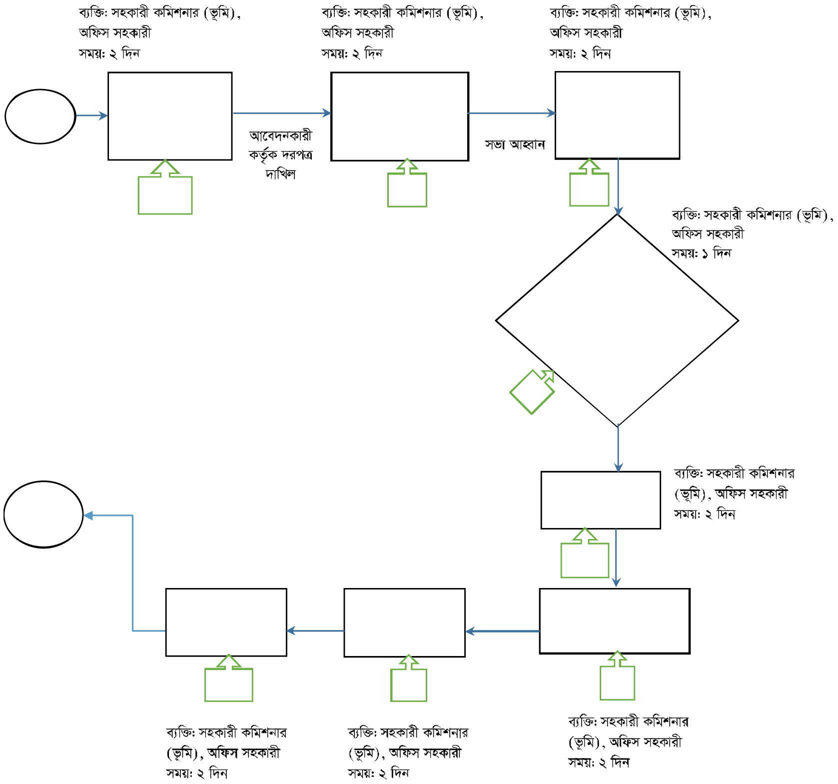

তথ্য উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২১

তবে, উপরিল্লিখিত পদ্ধতি ও সময় বেঁধে দেওয়া থাকলেও এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের জন্য নিয়ম মেনে অনেক কিছুই করা যায় না। জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে উপরের লেখচিত্র যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। উপরন্তু এসব প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে কখনো কখনো তারা (ভূমি কর্মকর্তাগণ) অপারগ হন। তারা আরও বলেছেন, বছরের সবসময় জেলেরা মাছ ধরতে পারেনা, বিশেষত, শুষ্ক মৌসুমে ও মাছের প্রজনন সময়ে। এ সময় কার্ডধারী জেলেদের[৪৩] জন্য সরকার থেকে

[৪৩] কার্ডধারী জেলে বা মৎস্যজীবী হলো— গভীর সমুদ্রে যেসব মৎস্যজীবী মৎস্য শিকারে যান তাদের আইডেনটিটি কার্ড খুব প্রয়োজনীয়। পরিচিতি কার্ড না থাকলে উপকূলরক্ষী বাহিনী গ্রেফতার করতে পারে এবং তারা নানা রকম হয়রানির শিকার হতে পারে। তাছাড়া মৎস্যজীবী যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যান বা নিখোঁজ হন তা হলে সরকারি সাহায্য পেতে তাঁর পরিবারের কোনো অসুবিধা হয় না।

ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে, এই ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। নীতিমালার ব্যত্যয় সম্পর্কে একজন ভূমি কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, নদী সাধারণত উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তার কর্ম এলাকার জেলা প্রশাসক নদীর দুই পারের মানুষদের কিছু অর্থের বিনিময়ে ৩ মাস বা ৬ মাসের জন্য মাছ ধরার অনুমতি দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে টোকেন দেয়া হয়। এজন্য, নদীকে বিভিন্ন প্লটে ভাগ করা হয় এবং নির্দিষ্ট প্লটে মাছ ধরার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যদিও এই পদ্ধতি নীতিমালাবহির্ভূত, তারপরও সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু, এখানেও প্রভাবশালী মহলের অশুভ তৎপরতা লক্ষ করা যায়। অন্য একজন সহকারী কমিশনার (ভূমি) বলেছেন, *"আমাদের উপজেলা ভূমি অফিস থেকে কেবল কার্ডধারী মৎস্যজীবীদেরই জলাশয় লিজ দেয়া হয়; এর বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তিকে লিজ দেয়া হয় না। বদ্ধ জলাশয় লিজ দেয়া হয়, কিন্তু প্রবহমান জলাশয় লিজ দেয়া হয় না। সবসময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকেই লিজ দেয়া হয়। তবে, অনেক সময় দেখা যায়, ভূমি অফিসের অগোচরে মৎস্যজীবী সমিতির লোকেরা আমাদের কাছ থেকে জলাশয় লিজ নিয়ে তা আবার অন্যদের কাছে সাব-লিজ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, আমাদের কিছুই করার থাকে না।"* আবার, কেউ কেউ বলেছেন, নীতির বিরুদ্ধে তাদের বলার তেমন কিছুই নেই। তাদের মতে, যেসব জলাশয় অবৈধ দখলে আছে সেগুলো যদি দখল মুক্ত করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে ইজারা দেয়া যায় তবেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রশাসনের সাহায্য একান্ত দরকার বলে তারা দাবি করেন।

> *"সরকারি জলমহাল থাকলেও তার বেশির ভাগই অবৈধ দখলে। নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কারা জলমহাল ইজারা পাবে, এক্ষেত্রে দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কথাও বলা আছে। কিন্তু, স্থানীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের জন্য প্রকৃত ও অসহায় মৎস্যজীবীরা জলাশয় ইজারা নিতে পারে না। আবার, কোথাও কোথাও জলমহাল অবৈধ দখল করে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। আর এ কাজে বাধা দিলেই নাস্তিক অপবাদ দেয়া হয় এবং পরিস্থিতি এমন হয় যে তাদের সাথে সমঝোতা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।"*
>
> *—একজন উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা*

নীতি বাস্তবায়নসম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ গবেষণায় ভূমি অধিকার কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। তাদের মতে, নদী উন্মুক্ত জলাশয়, যেখানে সবারই অধিকার রয়েছে মৎস্য আহরণের। এটি কারো একক বা গোষ্ঠীগত সম্পদ হতে পারে না, যা নীতিমালায় স্পষ্ট বলা আছে। কিন্তু, বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণই এর বিপরীত। বেশির ভাগ জায়গায়ই নদী প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দখলে থাকে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কোথাও কোথাও তো দুই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় দখল নিয়ে। প্রশাসনেও সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকেন এবং প্রভাবশালীদের পক্ষে কাজ করেন। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হতে হয় বঞ্চিত। মৎস্যজীবী সমিতি থাকলেও সেখানে স্থান হয় না প্রকৃত মৎস্যজীবীর। অনিয়মের মাধ্যমে কমিটির লোকেরা নিজেদের পছন্দের লোকদের এসব সমিতির সদস্য বানান, কার্ড দেন। ফলে, সরকার থেকে মৎস্যজীবীদের জন্য

যে প্রণোদনা দেয়া হয় তা প্রকৃত মৎস্যজীবীরা পান যৎসামান্যই। অন্যদিকে, প্রণোদনার পরিমাণ কম। ওয়ার্ডভিত্তিক প্রণোদনা আসে, যা বিতরণের ক্ষেত্রেও ঘটে ব্যাপক অনিয়ম। এক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় একান্ত জরুরি।

এ প্রসঙ্গে বিষয়াভিজ্ঞ একজন আইনজীবী বলেন, *"জলমহাল নীতিতে বলা আছে যে উপজেলা জলমহাল কমিটিতে উপজেলা পরিষদের প্রধান, চেয়ারম্যান, সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, আইনজীবী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; তবে, বাস্তবে এমনটা করা হয় না। আবার, জেলা প্রশাসক মহোদয় উন্মুক্ত জলাশয়কে অর্থের বিনিময়ে ৩ মাস বা ৬ মাসের জন্য ইজারা দেন যার কোনো বিধান নীতিতে নেই। এ রকম বহু নীতিবহির্ভূত ঘটনা ঘটছে অহরহ।"* একইভাবে, উন্নয়ন কর্মীরাও উপজেলা জলমহাল কমিটির অসঙ্গতির নানান দিক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে, নীতিমালাটি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে নিয়মবহির্ভূতভাবে কমিটি গঠন ও মৎস্যজীবী বাছাইপ্রক্রিয়া। একদিকে যেমন প্রভাবশালী মহল দ্বারা বেশির ভাগ জলাশয় বেদখল হয়ে আছে অন্যদিকে, এই রেন্টসিকার গোষ্ঠীরাই আবার জলমহাল কমিটির সদস্য হয়ে নিজেদের পছন্দমতো লোককে মৎস্যজীবী হিসেবে বাছাই করছেন। ফলে, প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সব দিক থেকেই হচ্ছেন বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত। স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করছে না বলে তারা উল্লেখ করেন। সুনামগঞ্জ জেলার একজন উন্নয়ন কর্মী জানান, *"জলমহাল নীতিমালার বাস্তবায়ন তেমন একটা হচ্ছে না বললেই চলে। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা কার্ড পাচ্ছেন না। যারা প্রভাবশালীদের চেনা-জানা তারাই কার্ড পাচ্ছেন এবং তাদের বেশির ভাগই আবার মৎস্য ব্যবসায়ী। জোতদারদের দ্বারা এলাকার বেশির ভাগ জলাশয়ই এখন বেদখল। বেদখল হওয়া জলাশয়ে সাধারণ মৎস্যজীবীরা প্রবেশও করতে পারে না। আর এসবই ঘটছে প্রশাসনের চোখের সামনে।"*

গণমাধ্যমকর্মীরাও মন্তব্য করেন, বর্তমানে দেশের বেশির ভাগ হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দখলে। জলমহাল নীতিমালার মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা তেমন একটা উপকৃত হচ্ছে না। বরং, পেশাদার মৎস্যজীবীরাই এই নীতিমালার সুবিধা ভোগ করছে। নদী, খাল-বিলে দেশীয় মাছ অনেক কমে গেছে, সবখানে বইছে বাণিজ্যকীকরণের হাওয়া। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, মৎস্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো করে মাছ চাষ করছেন। অন্যদিকে, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থা দিন দিন হচ্ছে আরো শোচনীয়। প্রভাবশালীর সরকারি জলাশয়গুলো লিজ নিয়ে নিজেদের দখলে নিয়ে যাওয়ায় প্রকৃত মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পারছেন না। আবার, সরকারি প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যদের জন্য অনেক সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রণোদনা বা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু, এক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়ম হয়। সাধারণত, ঘুষ দিয়ে মৎস্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের নামে মৎস্যজীবী কার্ড করে নেন এবং এর বিনিময়ে তারা বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেন। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভাগ্যে কেবল বঞ্চনাই জোটে।

> *"মৎস্যজীবীদের সমিতি এবং কার্ড থাকলেও প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শতকরা ১০ থেকে ২০ জনেরও কার্ড নেই। কার্ড আছে মৎস্য ব্যবসায়ী বা অন্য পেশার লোকদের। এসবের ওপর প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সব এখন ব্যবসায়ীদের হাতে। জাল যার জলা তার, এই নিয়মটা এখন আর নেই। রাজনৈতিক নেতারা ও প্রভাবশালীরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।"*
>
> *—একজন ভূমি অধিকার কর্মী, মধুপুর, টাঙ্গাইল*

তবে বিভিন্ন জায়গায় সমাজ কর্মীরা এসব জলাশয় দখলমুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখে ইতিমধ্যে কিছু জলাশয় দখলমুক্তও হয়েছে। একজন ভূমি অধিকার কর্মী বলেন, *"২০১৬ সালে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি জলমহাল (খাস জলাশয়) হলো–মরা ভদ্রা নদী ও তার আশাপাশের উন্মুক্ত জলাশয় যা সর্বমোট ১৯১.৬১ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। মাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার বিনিময়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ওই জলমহাল লিজ নেয় এবং মাছ চাষ শুরু করে। তারা বাঁশের পাটা (বাঁধ) দিয়ে মাছ চাষ শুরু করে, যা ছিল পুরোপুরি নিয়মের বাইরে। পরবর্তীতে, আমরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনমত তৈরি করে প্রায় ৯০০ মানুষের সই নিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দিই। এর ফলে ব্যাপক জনমত তৈরি হয় এবং একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, মোতায়েন করা হয় পুলিশ। সবশেষে, প্রশাসনের সহায়তায় সব স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে দখলদারদের উচ্ছেদ করতে সমর্থ হই।"*

স্থানীয় জনসাধারণ ও মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনাকালে নীতিমালার নানান বাস্তবায়নসমস্যা জানা যায়। প্রভাবশালী গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করে উন্মুক্ত জলাশয় নিজেদের দখলে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোতস্বিনী নদীকেও টাকার বিনিময়ে আর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে লিজ নিয়ে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা। জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য মৎস্যজীবীরা কোথাও কোথাও একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে জলাশয় দখলমুক্ত করতে সক্ষমও হচ্ছেন। কিন্তু, মোটা দাগের বাস্তবতাটা হলো যে বেশির ভাগ জায়গায় এমন আন্দোলন গড়ে উঠছে না, এবং জলমহাল ভোগ করছে অবৈধ দখলদারেরা। মামলা মোকদ্দমা করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ, প্রভাবশালীরা বেশি টাকা খরচ করে মামলার রায় নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, টাকা না থাকার কারণে ভুক্তভোগীরা বেশি দূর এগোতে পারছেন না। পাশাপাশি প্রশাসনও প্রভাবশালীদের হয়ে কাজ করছে বলে তারা মন্তব্য করেছেন। দখলমুক্ত করার পরও প্রভাবশালী রেন্টসিকাররা সেই জলাশয়ের শ্রেণি পরিবর্তন [৪৪]করে আবার তা ইজারা নিয়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। যেমনটি ঘটেছে টাঙ্গাইলের মধুপুরের জলই বিলের ক্ষেত্রে। জলই বিল নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা মামলা-

---

৪৪ 'শ্রেণি পরিবর্তন' হলো—যে জমি কোনো খতিয়ান বা পর্চায় যে ধরন হিসেবে রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা যদি অবৈধভাবে বা অসাধুভাবে আইনগত ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনো ধরনে পরিবর্তন করা হয়; তাহলে সেটাকে অবৈধভাবে জমির শ্রেণি পরিবর্তন বলা যায়। আর যে জমির শ্রেণি আইনগত বা বৈধভাবে পরিবর্তন করা হয়, তাকে বৈধভাবে জমির শ্রেণি পরিবর্তন বলা যায়।

মোকদ্দমা করে, অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে দখলমুক্ত করেন। কিন্তু, পরবর্তীতে প্রভাবশালীরা ওই বিলের শ্রেণি পরিবর্তন করে লিজ নিতে সক্ষম হয়। যেসব বিল ও নদী প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে, সেখান থেকে দুঃস্থ মৎস্যজীবীরা মাছ আহরণ তো দূরের কথা, পানিও সংগ্রহ করতে পারেন না। সি.এস/আর.এস এর কাগজপত্র মৎস্যজীবীদের পক্ষে থাকলেও প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে তারা পেরে উঠছেন না।

> *"আমাদের এলাকায় একটি জলাশয় থাকলেও কোনো মৎস্যজীবী সমিতি নেই। প্রশাসনের লোকেরাই এটি ভোগদখল করে খাচ্ছে। এ ছাড়া আশপাশের এলাকার জলাশয়গুলোও প্রভাবশালীদের দখলে। মূলত, আইন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে প্রভাবশালী গোষ্ঠী।"*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন মৎস্যজীবী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ*

আবার, সরকারপক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের যে কার্ড দেয়া হয়েছে সেখানেও রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম। একজন মৎস্যজীবী জানান, *"আমরা মৎস্যজীবী, আমাদের কার্ড আছে। কিন্তু, আমাদের এলাকার* (টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের আম্বাড়িয়া) *কিছু মৎস্যচাষী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদেরও এ কার্ড রয়েছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক সচ্ছল। তারা তো মাছের ব্যবসা করে, তারা কী করে মৎস্যজীবীদের কার্ড পায়?"* অন্যদিকে, সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের জনসাধারণ ও মৎস্যজীবীদের সাথে আলোচনা করেও একই চিত্র পাওয়া যায়। সেখানেও বিভিন্নভাবে নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটছে এবং মৎস্যজীবীরা নানাভাবে প্রভাবশালীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছেন। *এলাকার এক স্থায়ী বাসিন্দা জানান, "খাস জলাশয়ে ভূমিহীনদের কোনো অধিকার নেই। হাওরে যখন পানি কমে যায় প্রভাবশালীরা খুঁটি গেড়ে সীমানা নির্ধারণ করে, যতটুকু তার সীমানা তার বেশিই দখল করে নেয়। পানিতে বিষ প্রয়োগ করে, যার ফলে শামুক, হাঁস ও পরিযায়ী পাখিও মারা যায়। এভাবেই দিনে দিনে হাওর এলাকায় মাছের পরিমাণ কমে আসছে। জোতদারদের এখানে 'ওয়াটার লর্ড' বলা হয়। আর ব্যাংক ঋণের কথা তো মৎস্যজীবীরা জানেই না।"* দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ বলেছেন, নীতিমালায় অনেক ভালো দিক রয়েছে। কিন্তু, সেসবের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় সরকারের দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করেছে। তারা প্রভাবশালীদের সর্বাত্মক সাহায্য করছেন, প্রশ্রয় দিচ্ছে। উন্মুক্ত জলাশয় জোতদারদের দখলে থাকায় মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের চাঁদা দিতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও চাঁদার পরিমাণ এতো বেশি নির্ধারণ করা হয় যে, ভূমিহীন মৎস্যজীবীদের পক্ষে সে টাকা দেয়া প্রায় অসম্ভব। এছাড়া, ভূমিহীন মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরিতেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়।

৪.৬ নীতির ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ

মরা ভদ্রা নদীকে উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে ঘোষণার অপেক্ষায় হাজারো মানুষ

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার একসময়ের স্রোতস্বিনী প্রবহমান ভদ্রা নদী এখন একটি সরু খালে পরিণত হয়েছে। নদীসংলগ্ন গ্রামগুলোর শত শত মৎস্যজীবীদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল যে নদী, তা আজ মৃতপ্রায়। উন্মুক্ত এই জলাশয়কে বারংবার শ্রেণি পরিবর্তন করে বদ্ধ জলাশয় হিসেবে প্রভাবশালী মহলের কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র মৎস্যজীবী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতিরোধের মুখে প্রভাবশালীরা প্রাথমিকভাবে নদীর দখল নিতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে তারা কৌশলে নদীটিকে দখল করতে সক্ষম হয়। তারা একত্রিত হয়ে নদীর বিভিন্ন স্থানে আড়াআড়ি নেট-পাটা[৪৫] ও বাঁধ দিয়ে পানির গতিরোধ ও নৌ-চলাচলের পথ বন্ধ করে মাছ চাষ শুরু করে। ফলে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে নদীটি একটি সরু খালে পরিণত হয়। সেই সাথে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং কৃষি চাষাবাদ বিশেষত, শাকসবজির ক্ষেত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় শত শত কৃষক নিঃস্ব হয়ে পড়েন। স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর নদীটির অবৈধ দখল উচ্ছেদে একাধিকবার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও ইতিবাচক কোনো ফলাফল পায়নি। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ও নদীর স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটায় বিঘ্ন ঘটার কারণে নদীর স্থানে স্থানে কচুরিপানা জমে মারাত্মক পানি দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দরিদ্র কৃষক, মৎস্যজীবী ও এলাকার সাধারণ মানুষেরা অনতিবিলম্বে ভদ্রা নদীর অবৈধ দখল মুক্তকরণ, জলাবদ্ধতার আশুসমাধান নিশ্চিতকরণ, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নদীর ইজারা বাতিল ও পুনরায় ইজারা প্রদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে ভদ্রা নদীকে উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণা করা ইত্যাদি দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন চলমান রেখেছেন।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ১১নং ডুমুরিয়া, ১০নং ভাণ্ডারপাড়া, ৯নং সাহস ও ৮নং শরাফপুর মোট ৪টি ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে মরা[৪৬] ভদ্রা নদীটি প্রবাহিত। প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী। নদী তীরবর্তী ২২টি গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বসতি; এদের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই নদীটির ওপর নির্ভরশীল। আশির দশকে বহমান ছিল এই নদী; কিন্তু, আস্তে আস্তে পলি পড়ে এর এক প্রান্ত ভরাট হয়ে যায়। নদীর অন্য প্রান্ত মূল ভদ্রার সঙ্গে স্থানীয় স্লুইসগেটের মাধ্যমে সংযুক্ত; নদীর মাঝ বরাবর শুষ্ক মৌসুমে কিছুটা শুকিয়ে যায়। তবে এলাকার মানুষ নদীটি উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে জানে। উল্লিখিত ইউনিয়নগুলোর পানি নিষ্কাশন

---

৪৫ 'নেট-পাটা' হলো—নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁশ বা বেত দিয়ে বাঁধ দেওয়া।

৪৬ যে নদী আগে অনেক গভীর ছিল এবং বিভিন্ন জলজ প্রাণী বিচরণ করতো, অনেক স্রোত ছিল, কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে অথবা প্রাকৃতিক কোনো কারণে নদীতে পলি এসে নদীর গভীরতাকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা বা নদীর পানিকে দূষিত করে নদীকে তার আপন গতিতে চলতে না দেওয়ার ফলে যে অবস্থা হয়, সেটাই হলো 'মরা নদী'। অর্থাৎ এখানে ভদ্রা নদীকে উক্ত কারণেই মরা নদী বলা হয়েছে।

ও জলাবদ্ধতা নিরসনের এক ও অভিন্ন মাধ্যম এই মরা ভদ্রা নদী। এই নদী থেকে কৃষি চাষাবাদে জলসেচ, কৃষিপণ্য পরিবহনসহ এ গ্রামগুলোর ব্যাপকসংখ্যক হতদরিদ্র মৎস্যজীবী বা জেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল।

১৯৮৫ সালের দিকে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি নদীটি খুলনা জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ইজারা নেন। ওই ইজারার বিরুদ্ধে এলাকার বেশিরভাগ লোকের বিরোধিতা ও প্রতিরোধের কারণে এ যাবৎ কেউ দখলে যেতে পারেনি। এ কারণে ওই প্রভাবশালীরা স্থানীয় ৪৮ জন ভূমিহীন ও নিরীহ লোকজনের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। মামলাটি দীর্ঘদিন চলতে থাকে। পরে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় বিমল মিত্র নামে এক লোক আবারও নদীটির ইজারা নিয়ে আসেন। স্থানীয় ভূমিহীন ও মৎস্যজীবীদের জনরোষে তিনিও দখলে যেতে পারেননি। এরপর নদীটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত থাকে। ২০০০ সালে সরকার মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প চালু করে। কিন্তু, এখানকার সাধারণ মৎস্যজীবীদের ধারণা ছিল, আবারও হয়তো কোনো প্রভাবশালী মহল নদীটি ইজারা নিতে এসেছে। তাই এখানকার মৎস্যজীবীরা প্রকল্পের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করতে থাকেন।

২০০৩ সালে সরকারি উদ্যোগে ওই নদীতে পোনা মজুদ রাখার কার্যক্রমের পর প্রকল্পের প্রতি সাধারণ মৎস্যজীবীদের আস্থা ফিরে আসে। ২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিল খুলনার জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ওই নদীটির বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা ইজারা নির্ধারণ করা হয়। ওই সময় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষে ১০ হাজার টাকার বেশি ইজারা দেয়া সম্ভব ছিল না।

এরপর চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে খুলনা জেলা প্রশাসক বরাবর বার্ষিক ইজারা মওকুফের জন্য একটি সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম সরোয়ারসহ ৫ থেকে ৭ জন ইউপি চেয়ারম্যানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালের জুন মাসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইজারা পুনর্নির্ধারণের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির সভায় আবারও ৪০ হাজার টাকা ইজারা নির্ধারণ করা হয়। পরে মৎস্যজীবীরা ওই ভদ্রা নদীতে পৃথক দুটি অভয়াশ্রম তৈরি করেন। ফলে, নদীতে আগের তুলনায় দেশি প্রজাতির মাছ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। নদীটি উন্মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা কিংবা বার্ষিক ইজারা ১০ হাজার টাকা ধার্য করার দাবি জানিয়েছিলেন সাধারণ মৎস্যজীবী এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। সাড়ে ১৩ বছর (২০০০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত) অতিবাহিত হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ওই বদ্ধ ভদ্রা নদীতে সরকারের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় অভয়াশ্রমের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

মৎস্যজীবী মনিন্দ্র বিশ্বাস ও আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, বর্তমান ভদ্রা নদীটির প্রায় ১৪ কিলোমিটার অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে গেছে। স্থানীয় প্রভাবশালী মল্লিক নাছিমুলের সহযোগিতায় ইউপি সদস্যসহ একাধিক লোক নদীতে আড়াআড়ি নেট-পাটা ও বাঁধ দিয়ে পানির গতিরোধ ও নৌ-চলাচলের পথ বন্ধ রেখে মাছ চাষ করছে। ফলে বিপাকে পড়েছে

এলাকার ৬০০ জেলে পরিবার। অবৈধ দখলদার রাসেল খান ও ইউপি সদস্য নূর মোহাম্মদ বলেন, বেশি সমস্যা হলে নদী থেকে নেট-পাটা তুলে নেয়া হবে। আপাতত এখানে মাছ চাষ করা হবে। স্থানীয় একজন নেতা বলেন, নদীটি এখন অরক্ষিত। একটি মহল নদীতে আড়াআড়ি নেট-পাটা ব্যবহার করে মাছ শিকার করছে। হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ। নদীর দু পাড়ের দরিদ্র মানুষ ও জেলে পরিবারগুলো উন্মুক্ত জলাশয়ে আগের মতো আর মাছ শিকার করতে পারছেন না।

পরবর্তীতে এই এলাকার জোটবদ্ধ ভূমিদস্যুরা প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে নদী দখল এবং দীর্ঘ সময় সংস্কারের অভাবে নদীতে কচুরিপানা জমে নদীর স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নদীটি মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল অবৈধ নেট-পাটা বসিয়ে মাছ ধরার নামে নদীতে স্থায়ী দখল প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে, নদীতে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এবং চাষাবাদ, বিশেষ করে, শাকসবজির ক্ষেত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় শত শত কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাই, বিক্ষুব্ধ দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, মৎস্যজীবী ও এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি— অবিলম্বে মরা ভদ্রা নদীটি সংস্কার ও অবৈধ দখলদার মুক্ত করে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ফিরিয়ে আনা হোক।

ইতিপূর্বে, নদী থেকে নেট-পাটা ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে নদীটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে একাধিকবার উপজেলা প্রশাসন বরাবর শত শত মানুষের গণস্বাক্ষরসম্বলিত স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নেট-পাটা উচ্ছেদের জন্য প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় পুনরায় নেট-পাটা দেয়া চলতে থাকে। উল্লেখ্য, নদীতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও অবৈধ নেট-পাটা উচ্ছেদের জন্য দুবার মাইকে প্রচার করে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলেও উপজেলা প্রশাসনের ঘোষণাকে অমান্য করে নেট-পাটার মালিকেরা সেগুলো বহাল রেখেছে। তবে, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সরোজ কুমার মিস্ত্রী স্থানীয় মৎস্যজীবী ও সাধারণ লোকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, *"ভদ্রা নদীটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নদী থেকে অবৈধ নেট-পাটা দ্রুত উচ্ছেদ করা হবে।"*

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ ভূমিহীন, মৎস্যজীবী ও সাধারণ জনতার দাবি: (১) অনতিবিলম্বে নদী থেকে অবৈধ নেট-পাটা উচ্ছেদ করে নদীটি উন্মুক্ত করা এবং দরিদ্র-ভূমিহীন মৎস্যজীবীসহ সর্বসাধারণের জীবিকা নির্বাহের অধিকার নিশ্চিত করা; (২) নদীর স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটা ফিরিয়ে আনার জন্য নদী সংস্কার ও অবিলম্বে কচুরিপানা পরিষ্কার করে এলাকার জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান করা; (৩) ডুমুরিয়া থেকে শরাফপুর তেলীখালী গেট অবধি ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত মরা ভদ্রা নদী হতে দখলদারমুক্ত করা; (৪) উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্যকারী অবৈধ নেট-পাটার মালিকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৫)

পরিকল্পিতভাবে নদী খনন করে কৃষি সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; (৬) জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া; এবং (৭) এলাকার সাধারণ জনতার বৃহত্তর স্বার্থে মরা ভদ্রা নদীর ইজারা বাতিল ও পুনরায় ইজারা দেয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করা।

বিশেষ উল্লেখ্য, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির বাস্তবায়ন সমস্যা হচ্ছে ভদ্রা নদী থেকে অবৈধ নেট-পাটা উচ্ছেদ করে নদীটি এখনো উন্মুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, মাছ ধরে দরিদ্র-ভূমিহীন মৎস্যজীবীসহ সর্বসাধারণের জীবিকা নির্বাহের অধিকারও নিশ্চিত করা হচ্ছে না। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির ২ (গ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জলমহাল এমন জলাশয়কে বোঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না। অর্থাৎ বলা যায় যে, ভদ্রা নদী একটি উন্মুক্ত জলাশয়, এটি কোনো বদ্ধ জলাশয় নয়, কারণ নদীর কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা নেই। তারপরও, সরকার এই ভদ্রা নদীকে বদ্ধ জলমহাল হিসেবে বিভিন্ন সময় ইজারা দিয়েছে, যা আইনত বৈধ নয়। ভদ্রা নদীর পাড়ের ভূমিহীন কৃষক, মৎস্যজীবী ও সাধারণ জনতার দাবি, নদীটি উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে প্রশাসনিকভাবে ঘোষণার পাশাপাশি এলাকার বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনা করে মরা ভদ্রা নদীর ইজারা বাতিল ও পুনরায় ইজারা দেয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হোক। নীতির ২২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যেসব জলমহাল থেকে জমিতে সেচের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ দেয়া বিঘ্নিত করা যাবে না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে ইজারা নিয়ে ওই ভদ্রা নদীতে প্রভাবশালীরা পানি আটকিয়ে মাছ চাষ করছে এবং কৃষকেরা নদী তীরবর্তী জমিতে ওই নদীর পানি ব্যবহার করতে পারছে না। কারণ, প্রভাবশালীরা পানি দিচ্ছে না। সুতরাং, কৃষকদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে নদী খনন করে কৃষি সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং নদীর পানি আটকিয়ে প্রভাবশালীদের মাছ চাষ করা বন্ধ করতে হবে।

এখানে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মৎস্য অধিদপ্তর তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। এখানে ব্যত্যয় ঘটেছে নীতিমালার। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা ভদ্রা নদীকে উন্মুক্ত জলাশয় হিসেবে এখনো সরকারি ঘোষণার অপেক্ষায় আছে।

আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ জলাশয় উন্মুক্তকরণে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রাম

দীর্ঘসময় যাবৎ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মির্জাবাড়ী ইউনিয়নের ছেওগাঙ জলাশয়ে আম্বাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। সেইসাথে, উক্ত জলাশয়ের চারপাশের ভূমিহীন দরিদ্র ও সাধারণ লোকজন তাদের পারিবারিক ও কৃষিকাজের প্রয়োজনে জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে আসছিলেন। তবে, ২০০০ সালের প্রথম দিকে কিছু প্রভাবশালী জলগ্রাসী রেন্টসিকার জলাশয়টি সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে এর স্বাভাবিক

পানির প্রবাহ বন্ধ করে সেখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ শুরু করেন। এই ইজারা নেয়ার ক্ষেত্রে তারা নানাভাবে সরকারি জলমহাল নীতির ব্যত্যয় ঘটান। প্রথমত, তারা নিজেদের পছন্দমতো লোকদের মৎস্যজীবী সাজিয়ে এই জলাশয়টি ইজারা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, জলাশয়টি মূলত বংশাই নদীর অংশ ও উন্মুক্ত জলাশয় হলেও এর শ্রেণি পরিবর্তন করে ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জলাশয়টিকে বদ্ধ জলাশয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে তিন বছর করে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ইজারা পেয়ে আসছিলেন। তৃতীয়ত, জলাশয়টি ২০ একরের কম হলেও তারা মিথ্যা বলে জলাশয়টির ইজারা নিয়েছিলেন। ইজারা নেয়ার পর থেকেই প্রভাবশালীরা এককভাবে জলাশয়টির ভোগদখল শুরু করে এবং মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণের জন্য জলাশয়ে প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দেন। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকৃত মৎস্যজীবী ও স্থানীয় লোকজন প্রভাবশালীদের বাধা দেয়ায় দুপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং অনেক দরিদ্র মৎস্যজীবীকে জেলেও যেতে হয়। একদিকে আন্দোলন-সংগ্রাম এখনো চলমান; অন্যদিকে আগের মতোই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ছেওগাঙ জলাশয়টি ইজারা নিয়ে প্রভাবশালী রেন্টসিকাররাও তাদের মৎস্য চাষ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আম্বাড়িয়া গ্রামের আম্বাড়িয়া মৌজার ১৯১৭-১৮ সালের সি.এস মূলে[৪৭] আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ জলাশয়টির মালিকানা ছিল হেমচন্দ্র চৌধুরীর। ওই সময়ে খতিয়ান নং-১১, দাগ নং-৪৯৫, মৌজা-আম্বাড়িয়া, জমির শ্রেণি– নদী শ্রেণির জলাশয়, জমির পরিমাণ- ১৮.৭৫ একর। অত:পর, ১৯৬২-৬৩ সালে Record of Rights বা খতিয়ানমূলে[৪৮] ওই জলাশয়টি সরকারি সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। যে কারণে আবহমানকাল থেকেই বংশানুক্রমে ওই উন্মুক্ত জলাশয়ে আম্বাড়িয়া গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত এবং আশেপাশের গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও সেখান থেকে মাছ ধরতেন। সেইসাথে ওই জলাশয়ের চারপাশের ভূমিহীন দরিদ্র ও সাধারণ লোকজন গোসল করা, পাট পচাঁনো, গরু-ছাগল গোসল করানো, শুষ্ক মৌসুমে জলাশয়ের চারপাশে বোরো ধানের চারা রোপণ ও কৃষি আবাদের ক্ষেত্রে সেচ হিসেবে জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ছেওগাঙ জলাশয়কে কেন্দ্র করে প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাজার ও গুচ্ছগ্রাম গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে (১৯৭২-৭৫ সালে) জেলে সম্প্রদায় নামমাত্র মূল্যে জলাশয়টি ইজারা নিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ ছাড়াও গ্রামবাসীসহ অন্যরাও বিভিন্ন কাজে উন্মুক্ত হিসেবে জলাশয়টিকে ব্যবহার করতেন। ২০০০ সালের প্রথম দিকে আম্বাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক আব্দুল

---

[৪৭] সিএস খতিয়ান হলো—ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার জরিপ করে যে খতিয়ান তৈরি করে তাকে সিএস খতিয়ান বলা হয়। আমাদের দেশে এটিই প্রাথমিক খতিয়ান হিসেবে বিবেচিত।

[৪৮] রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান: এক বা একাধিক দাগের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূমি নিয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির নামে সরকার বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক যে ভূমিস্বত্ব প্রস্তুত করা হয়, তাকে খতিয়ান বলে। প্রতি খতিয়ানের একটি পৃথক পরিচিতি নম্বর থাকে। খতিয়ানকে ‘রেকর্ড অব রাইটস’ বা ‘স্বত্বলিপি’ বলা হয়।

হামিদ (বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি) এর প্ররোচনায় তার ছোট ভাই আব্দুল হাকিম, মোতালেব ও মজিদ গংরা কৌশলে জেলে সম্প্রদায়ের নেতা মঙ্গল চন্দ্র দাসকে হাত করে আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ জলাশয়ে আধিপত্য বিস্তারের কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে আব্দুল হাই, গোলাম মোস্তফা ও নজরুল ইসলামসহ ২০ জনকে ছেওগাঙ জলাশয় সমিতিতে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গল চন্দ্র দাসকে সভাপতি ও আব্দুল হাকিমকে সম্পাদক করে কিশায়ী মৎস্যজীবী সমিতি গঠন করলেও, মূলত ওই জলাশয়ের এবং সমিতির একক নিয়ন্ত্রণ ছিল আব্দুল হাকিম গংদের হাতে।

পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে সমিতির সাধারণ সভায় সম্পাদক আব্দুল হাকিম ছেওগাঙ জলাশয়ে মাছ চাষ করে ১৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা লোকসানের হিসাব দিলে নাম মাত্র সভাপতি মঙ্গল চন্দ্র দাস ভয়ে কথা না বললেও আব্দুল হাই, গোলাম মোস্তফা ও নজরুল গংরা হিসাবের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে ঝগড়ার মধ্য দিয়ে আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে একটি অংশ মৎস্যজীবী সমিতি ও ছেওগাঙ জলাশয় থেকে বের হয়ে আসেন। ওই সময়ে মির্জাবাড়ী, জাগীরা চালা ও উখারিয়া বাড়ি এলাকায় ভূমিহীন সমিতির শক্তিশালী অবস্থান এবং আল্লা বিল, খাগছড়া বিলের ভূমিহীনরা আন্দোলনের মাধ্যমে ছেওগাঙ জলাশয়টি উন্মুক্ত করতে পেরেছিল। এ কারণে আব্দুল হাই, মির্জাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমিহীন সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নানের সহযোগিতায় আম্বাড়িয়া নামে ভূমিহীন সংগঠন গড়ে তুলে। একপর্যায়ে আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে মির্জাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমিহীন সমিতি একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে।

এরই ধারাবাহিকতায় আম্বাড়িয়া, মির্জাবাড়ী এলাকায় ভূমিহীন সমিতি আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ছেওগাঙ উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে আব্দুল হাকিম গংদের উচ্ছেদ করে জলাশয়ে ভূমিহীন মৎস্যজীবীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ছেওগাঙ জলাশয়টি ভূমিহীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে ওই সময়ে আব্দুল হাকিম গংরা থেমে থাকেনি। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে ছেওগাঙ জলাশয় দখল করতে চাইলে ভূমিহীনদের সাথে একাধিকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। উভয় পক্ষেই আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নেয় এবং পক্ষে-বিপক্ষে দুই বছরে মোট ১৩টি মামলা হয়। এর মধ্যে ভূমিহীন সংগঠন ও ভূমিহীনদের নিয়ে কর্মরত জাতীয়পর্যায়ের সংগঠন 'নিজেরা করি' বাদী হয়ে ৫টি এবং বিরোধী পক্ষ বাদী হয়ে ৮টি মামলা দায়ের করে। মোট ১৩টি মামলার মধ্যে ১২টি মামলাই ফৌজদারী বা অপরাধবিষয়ক মামলা এবং ১টি দেওয়ানি মোকদ্দমা। ভূমিহীন সংগঠন ও 'নিজেরা করি' বাদী হয়ে মোকদ্দমা নং– ২৬/২০০৮ মামলাটি দেওয়ানি জমিসংক্রান্ত। ইতিমধ্যে পক্ষে-বিপক্ষের ১২টি ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ওই রায়গুলোতে কোনো পক্ষেরই জেল-জরিমানা হয়নি। তবে, ভূমিহীন সংগঠন–বিবাদী ফৌজদারী মামলাতে non-bailable (অজামিনযোগ্য) ধারা থাকাতে জামিন না হওয়ায় সংগঠনের সদস্যদের একাধিকবার জেল-হাজতে যেতে হয়েছে। তার মধ্যে ভূমিহীন সংগঠন—বিবাদী জিআর নং ৩০০(২)/২০০৮ মামলাতে আব্দুল মান্নানসহ ১৫ জন সদস্যকে ১৫ দিন জেলে

থাকতে হয়েছিল। ওই সময় বোরো ধান কাটার মৌসুম থাকাতে ধনবাড়ী-মধুপুরের তিন শতাধিক ভূমিহীন সদস্য ও কর্মীরা মিলে জেলে থাকা ১৫ জন সদস্যদের প্রায় ৭০ বিঘা জমির ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

রাষ্ট্র প্রণীত খাস জলাশয় নীতিমালায় কোনো উন্মুক্ত জলাশয় ইজারা দেয়ার বিধান নেই। কারণ ছেওগাঙ জলাশয়ে ইসলামপুর, উখারিয়াবাড়ী ও আম্বাড়িয়া গ্রামে বর্ষার সময় সমগ্র পানি ছেওগাঙ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে (সিএস খতিয়ান মূলে শ্রেণি-খাল, দাগ নং- ৫১৪ ছোট পাকা ব্রিজসংলগ্ন) বংশাই নদীতে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, ভূমি অফিসের (উপজেলা ভূমি অফিস, মধুপুর) কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ও সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতাদের ব্যবহার করে আব্দুল হাকিম গংরা ঘুষ দিয়ে ভূমি শ্রেণি-নদী ছেওগাঙ খাল বা জলাশয়কে বদ্ধ জলাশয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে তিন বছর করে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ইজারা পেয়ে আসছে। এছাড়া, খাস জলাশয় বিষয়ে প্রণীত আইন/নীতিমালা/পরিপত্রে জেলা প্রশাসকের ২০ একরের নিচে কোনো জলমহাল ইজারা দেয়ার বিধান নেই। তাই, ভূমিদস্যু আব্দুল হাকিম গংরা ছেওগাঙ এর পার্শ্ববর্তী তিনটি দাগের যথা: ৪৯, ৫১২, ও ৩৮৯-শ্রেণি হলো– কান্দা, যেখানে বসতবাড়ি ও আবাদী জমি এবং ব্যক্তি সম্পত্তিকে ছেওগাঙ এর যুক্ত করে ২০ একরের ঊর্ধ্বে বলে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ইজারা পেয়ে আসছে। কিন্তু, সিএস খতিয়ান মূলে ছেওগাঙ উন্মুক্ত খাল বা জলাশয়টির শ্রেণি– নদী, দাগ নং-৪৯৫ এবং জমির পরিমাণ ১৮.৭৫ একর এবং খতিয়ান নং-০১।

২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ছেওগাঙ জলাশয়টি ভূমিহীন সমিতির নেতৃত্বে জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও আব্দুল হাকিম গং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করে। ভূমিহীন সমিতি মির্জাবাড়ী হাটে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিরোধী মিছিল করেছে, এ রকম মিথ্যা অভিযোগ তুলে মির্জাবাড়ী ইউনিয়ন তথা ছেওগাঙ জলাশয়কেন্দ্রিক ভূমিহীন সংগঠন ও কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা দিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে হাকিম গং ওই জলাশয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আগের মতো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ছেওগাঙ জলাশয়টি ইজারা নিয়ে আজো মাছ চাষ করছে।

টাঙ্গাইলের মধুপুরের ছেওগাঙ জলাশয় মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ রকম—সরকারি বিধি অনুযায়ী ভূমিহীন সংগঠনের ২৬/২০০৮ (ইজমেন্ট বা বর্তস্বত্ত্ব মামলা) দেওয়ানি মোকদ্দমাটি মধুপুরের দায়িত্বরত সহকারী জজ আদালতের বিচারক ওই জলাশয়টি ৬০ বছরের অধিক সময় সরকারি সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হওয়াতে তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ২৬ (২) ধারার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ২০১৯ সালের শেষের দিকে মোকদ্দমাটি খারিজ করে দেন।

পরবর্তীকালে ভূমিহীন সংগঠন নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ২৯ (৪) ধারা [৪৯] অনুযায়ী উন্মুক্তকরণের দাবিতে বিজ্ঞ আইনজীবী নিহার কুমার সরকারের মাধ্যমে মাননীয় জেলা আদালতে আপিল করা হয়; আপিল নং– ৯/২০২০ (ইজমেন্ট রাইট বা বর্তস্বত্ব অধিকার)। এই আপিল করার ক্ষেত্রে যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তা হলোঃ (১) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী খাস জলাশয়ের পরিমাণ ২০ একর বা তার বেশি হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ৩ বছর মেয়াদে ইজারা দেবেন। সিএস খতিয়ান মূলে ছেওগাঙ জলাশয়টির শ্রেণি– নদী, দাগ নং-৪৯৫, খতিয়ান নং-১ এবং জমির পরিমাণ ১৮.৭৫ একর। সে কারণে ভূমিদস্যু আব্দুল হাকিম গংরা ছেওগাঙ এর পার্শ্ববর্তী ৩টি দাগের যথা– ৪৯৬, ৫১২, ও ৩৮৯ যা শ্রেণি– কান্দা, যেখানে বসত-ভিটা ও আবাদি জমি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ছেওগাঙ এর সাথে যুক্ত করে ২০ একরের ঊর্ধ্বে জলাশয় মর্মে মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে মৎস্য চাষ করছে, যা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর পরিপন্থী। (২) উল্লেখ্য ছেওগাঙ জলাশয়টির (খাল) একপাশে পাকা ব্রিজ আছে। ব্রিজের নিচে ছেওগাঙ জলাশয়টি সিএস খতিয়ান মূলে বংশাই নদীতে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ছেওগাঙ জলাশয়টি প্রকৃতপক্ষে বংশাই নদীরই অংশ। কিন্তু, আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ মংস্যজীবী সমিতি নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করছে। ছেওগাঙ জলাশয়ের তীরবর্তী দরিদ্র প্রান্তিক ভূমিহীন পরিবারগুলো তাদের পারিবারিক ও কৃষিকাজের প্রয়োজনে জলাশয়ের পানি ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯-এর পরিপন্থী। এবং (৩) ৮৩ সদস্যবিশিষ্ট আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ মৎস্যজীবী সমিতিতে মাত্র ৮ জন সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী। তাদের সমিতির সামনে দেখিয়ে জলাশয়টি ইজারা নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ৮ জন প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৫ জনকে ভয় দেখিয়ে সমিতি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সমিতির বাকি সদস্যরা কেউ চাকরিজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক, আবার কেউ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী। এরা কেউই প্রকৃত মৎস্যজীবী নন। বর্তমানে আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে মৎস্যজীবী সমিতির নামে ইজারা নেয়া জলাশয়টি ১২/১৪ জন জোরপূর্বক ভোগদখল করছে; যা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯-এর পরিপন্থী।

ছেওগাঙ জলাশয়কে ঘিরে ভূমিহীন দরিদ্র প্রান্তিক ও সাধারণ জনতার যেসব ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) একাধিকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। ভূমিহীন সংগঠন ও কর্মীদের ওপর জলাগ্রাসী প্রভাবশালী দল একাধিকবার হামলা করেছে। ভূমিহীন সমিতির সদস্য ও নিজেরা করি-এর কর্মীরা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। সবসময় হামলার আশংকার মধ্যে সদস্যরা বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। (২) জলাশয়ের পাড়ে বসবাসরত প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকাংশকেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। (৩) পক্ষে-বিপক্ষে ২০০৯/২০১০ সালে মোট ১৩টি মামলা

---

[৪৯] তামাদি আইন-১৯০৮-এর ২৯ (৪) ধারা (সংরক্ষণ) হলো— 'যেসব এলাকায় ১৮৮২ সালের সুখাধিকার আইনের আওতা আপাতত সম্প্রসারিত করা হবে, সেসব এলাকা থেকে উদ্ভূত মামলার ক্ষেত্রে আইনের ২৬ ও ২৭ ধারা এবং ২ ধারায় বর্ণিত 'সুখাধিকার' এবং সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না'।

হয়েছে; এবং অনেকের জেল-জরিমানা হয়েছে। (৪) প্রান্তিক ও ভূমিহীনদের পারিবারিক ও কৃষিকাজের জন্য পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নেই। (৫) প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ওই জলাশয়টিতে মাছ ধরতে পারছে না। এবং (৬) সর্বোপরি, জলাশয়টির কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর ২ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রি করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন; আর তারাই একমাত্র খাস জলাশয় ইজারা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু, এই নীতি লঙ্ঘন করে আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ মৎস্যজীবী সমিতিকে অবৈধভাবে জলাশয়টি ইজারা দেয়া হয়।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির ২ (গ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জলমহাল এমন জলাশয়কে বোঝাবে যা বছরের একটি সময় বা সারাবছর জলমগ্ন থাকে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না। অর্থাৎ ছেওগাঙ খাল একটি উন্মুক্ত জলাশয়, এটি কোনো বদ্ধ জলাশয় নয়, কারণ এটি বংশাই নদীর সাথে সংযুক্ত। কিন্তু, এটিকে বদ্ধ জলমহাল হিসেবে প্রভাবশালী রেন্টসিকাররা সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিচ্ছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ২০ একরের ঊর্ধ্বে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি জলমহাল জেলা প্রশাসক প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেবেন। কিন্তু, এই ছেওগাঙ জলাশয় উন্মুক্ত জলাশয় হলেও একে বদ্ধ জলমহাল বানানো হয়েছে; আবার ২০ একরের নিচে (১৮.৭৫ একর) জলমহালটি ইজারা দিচ্ছেন জেলা প্রশাসক; এটি জলমহাল নীতির পরিপন্থী।

নীতির ৫ (ঙ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আবেদনকারী কোনো মৎস্যজীবী সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন, যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন; তাহলে ওই সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। অথচ, মৎস্যজীবী সমিতির নামে প্রতিবারই যাদের ছেওগাঙ উন্মুক্ত জলায়শটি ইজারা দেয়া হচ্ছে, তাদের সমিতির বেশির ভাগ সদস্যই প্রকৃত মৎস্যজীবী নন।

জলমহাল নীতির ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যে সব জলমহাল থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ দেবার সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে ইজারা নিয়ে ওই ছেওগাঙ জলাশয়টির পানি আটকিয়ে প্রভাবশালীরা মাছ চাষ করছে এবং কৃষকেরা নদী তীরবর্তী জমিতে ওই নদীর পানি ব্যবহার করতে পারছেন না। এই ছেওগাঙ জলাশয়ের ক্ষেত্রে ওই অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন হয়নি।

অর্থাৎ, এটি দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে, ছেওগাঙ জলাশয়ে সরকারি জলমহাল নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তারপরও ভূমিহীন সমিতির পক্ষে আব্দুল মান্নান গংরা আশাবাদী, ছেওগাঙ জলাশয় নিয়ে জেলা জজ আদালতে আপিলকৃত মামলার রায় তাদের সংগঠনের পক্ষেই আসবে এবং ওই ভূমিহীন সংগঠনের নেতৃত্বে ছেওগাঙ জলাশয়কে উন্মুক্ত করে ভূমিহীন দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার পুনরায় নিশ্চিত হবে।

৪.৭ নীতি এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-কে ৪টি নির্দেশকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্কোরিং করা হয়েছে। এই ৪টি নির্দেশক হলো: (১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব। প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই '০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে: যেখানে '০' নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, অন্যদিকে '৫' স্কোর মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। সবশেষে, এই ৪ টি নির্দেশকের প্রতিটি স্কোরের একটি গড়ও করা হয়েছে।

এই ৪টি নির্দেশকের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য'— এই নির্দেশকে (স্কোর: ৩.১)। তারপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'– এই নির্দেশক (স্কোর: ৩.৩)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) ও 'অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা' (স্কোর: ৩.৮)—এই দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ১৪-এ বিষয়টি একনজরে দেখা হলো। এই নীতিটির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.৫।

লেখচিত্র ১৪: স্কোরিং — 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.৫

অন্যদিকে, এই নীতির বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশকের মাধ্যমে: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। আগের মতোই '০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে, এবং সবশেষে করা হয়েছে একটি গড়। '০' অর্থ সবশেষে মন্দ অবস্থা, '৫' নির্দেশ করেছে সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে– 'রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' (স্কোর: ০.৬) ও 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর: ০.৭)– এই দুটি নির্দেশক। এর পরের অবস্থানে রয়েছে 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি' নির্দেশকদ্বয় (উভয়েরই স্কোর ০.৮)। কাছাকাছি খারাপ অবস্থানে রয়েছে 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' ও 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব'–এই দুইটি স্কোর এবং এদের প্রত্যেকের স্কোর ০.৯। বাকি দুটি নির্দেশক 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি' ও 'সমন্বয়হীনতা'-এর অবস্থাও ভালো নয় মোটেই, স্কোর ১.১। নীতিটির বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৯, অর্থাৎ, অত্যন্ত মন্দ অবস্থা, যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতিগুলোর বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়েও কম। লেখচিত্র ১৫-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১৫: স্কোরিং —'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৯

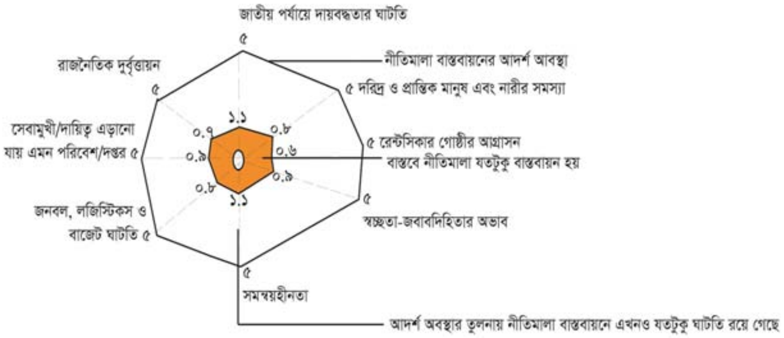

নীতি এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নীতির তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেকগুণ বেশি (নীতির সমস্যার গড় স্কোর: ৩.৫, এবং নীতি

বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ০.৯)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতির সমস্যার স্কোর ৩.৫ (৭০% অর্জন) আর নীতির বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ০.৯ (মাত্র ১৮% অর্জন) (লেখচিত্র-১৬)।

লেখচিত্র ১৬: 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯': নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা
('০' এর '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫= সবচেয়ে ভালো)

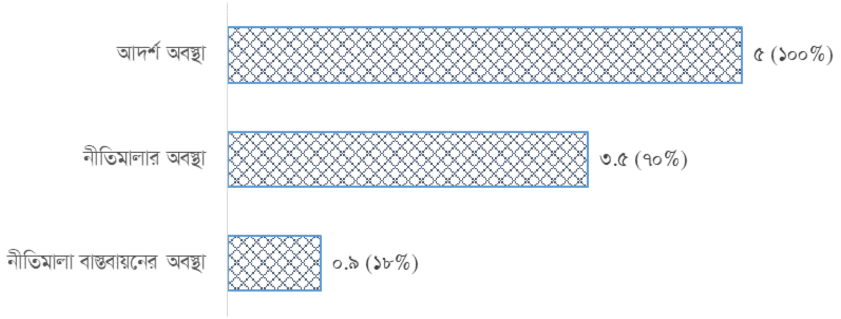

৪.৮ সুপারিশমালা

আইনসংশ্লিষ্ট [৫০]

১) 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'- অনুসারেই এ দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। সংশোধন প্রয়োজন এই নীতিমালায়। জরুরি প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ একটি আইন। নীতিমালা বাস্তবায়নে চাই পূর্ণাঙ্গ একটি আইন এবং কার্যকর বিধিমালা।

২) দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সামর্থ্য বিবেচনায় ইজারামূল্য পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ইজারার টাকা কিস্তিতে ও আংশিক প্রদানের সুযোগও করা প্রয়োজন।

৩) জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য জলমহালের যথেচ্ছা ব্যবহার রোধে ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

---

[৫০] সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯-এর ওপর পরিচালিত নিবিড়-গবেষণালব্ধ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো পাওয়া যাবে এখানে: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (ষষ্ঠ খণ্ড: জলমহাল)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। পরিশিষ্ট ২-এ প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোসহ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাটি সংযুক্ত করা হলো।

৪) এইনীতির সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) বিধানটি জলমহাল ব্যবস্থাপনার মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এটির বিলুপ্তি প্রয়োজন।

৫) সাব-লিজ রোধে সাব-লিজপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত এবং ভবিষ্যতে আরো ইজারা নেয়ার অনুমতি পাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করার বিধান থাকা প্রয়োজন।

৬) জলমহাল ইজারাসংক্রান্ত প্রচারণার মাধ্যম এবং পদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তা দরিদ্র-নিরক্ষর মৎস্যজীবী মানুষের কাছে পৌছায়, পৌছায় দুর্গম অঞ্চলে; এ বিষয়ে চাই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।

৭) জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিধান রাখা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট

১) জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা নিশ্চিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরি কমন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করতে হবে অতিসত্বর।

২) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যেন জলমহাল ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার পান সে লক্ষ্যে প্রয়োজন সংগঠিত সামাজিক তদারকি ও প্রতিরোধ। 'জাল যার জলা তার' এই মৌলিক নীতির পরিপন্থী সব চর্চা রোধ করতে হবে, প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি নয় এমন সমিতির তালিকা করে তা অতিসত্বর বাতিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩) সাব-লিজ বাতিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা চাই; এজন্য প্রয়োজন সংগঠিত সামাজিক তদারকি ও প্রতিরোধ।

৪) প্রকৃতি-পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়মিত তদারকিতে রাখতে হবে।

৫) জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় এবং সংবেদনশীল ভূমিকা দেখতে চাই, যা প্রকৃত মৎস্যজীবীর অধিকার নিশ্চিতে নীতি-সহায়তা দেবে; এমন কোনো নীতি যেন প্রণীত না হয় যা দরিদ্র-প্রান্তিক জলাজীবীর জীবিকার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

৬) জলমহালের পানির প্রবাহমানতাকে যেন কেউ অবৈধভাবে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সে জন্য চাই কঠোর নজরদারি।

৭) জলমহালের পারে সামাজিক বনায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৮) মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে, এজন্য পাইলট প্রকল্পও পরিচালিত করা যেতে পারে।

৯) জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমকে বেগবান করবার লক্ষ্যে একে নাগরিক জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

অধ্যায় ৫

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল

সারকথা: 'অধিগ্রহণ' অর্থ, ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। আর 'হুকুমদখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ। জনবহুল একটি দেশে– যেখানে কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত— সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি অধিগ্রহণের বর্তমান মূল আইনটি হলো 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭'।

আইনে উল্লিখিত 'জন উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'-এর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের কোনো সংজ্ঞা এখানে নেই। 'পুনঃবন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থসামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদি বিষয় আইনে অন্তর্ভুক্তই হয়নি। ব্যাখ্যা নেই 'সরল বিশ্বাস' শব্দটির। বলা হয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা, কোনো সুযোগই নেই অআর্থিক ক্ষতিপূরণের। প্রান্তিক জনমানুষ, নারীপ্রধান খানা, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য রাখা হয়নি বাড়তি কোনো সুযোগ। বলা হয়েছে, ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদন না করা হলে তা বিবেচনা করা হবে না, কিন্তু সংশোধন বিষয়ে সিদ্ধান্তটি কত কর্মদিবসের মধ্যে সমাধা করতে হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই।

আইনটির বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট। প্রায়শই স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর কোনো আলোচনা না করেই জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করেন। আদিবাসীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনো নোটিশই পায়নি, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে হুকুমদখলসংক্রান্ত কোনো আদেশ সংশোধন করতে পারেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আবাসস্থল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয় না। জমির শ্রেণি, জমি থেকে প্রাপ্ত আয়, জমির বিপরীতে দেয়া কর ইত্যাদিও নেয়া হয় না বিবেচনায়। অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তি স্থানান্তরে বাধ্য হলে যুক্তিসংগত ব্যয় বহনের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও প্রায় সবক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটছে। পুরো প্রক্রিয়ার সময়কালে জমির মূল্য বাড়লেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সেই মূল্য পান না। কোন উপজেলায় কী পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ হচ্ছে তার সঠিক কোনো হিসাব না থাকায় দুর্নীতি বেড়েই চলছে। চরাঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে দরিদ্র পরিবার হয়ে পড়ছেন বাস্তুহারা। আইনে আছে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ করতে হবে, কিন্তু এই বিধানের বাস্তবায়ন চোখে পড়ে না। অধিগ্রহণপ্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারসাজিতে—'রেন্টসিকার' দুর্বৃত্তের সাথে প্রশাসনের অবৈধ আঁতাতে—ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে ভীষণ গড়িমসি করা হয়: দরিদ্রদের ঘুরতে হয়, ধনীরা পান দ্রুত। প্রশাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থনেই গড়ে উঠেছে একদল দালাল-

প্রতারক চক্র। যে উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার কোনো লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ এবং তা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে খাস খতিয়ানভুক্ত করবার কথা; কিন্তু, বাস্তবে এর ব্যত্যয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অধিগ্রহণকৃত জমির বিশাল অংশ থেকে যায় অব্যবহৃত। সমগ্র কার্যধারা সরকার বাতিল করলেও সাধারণত জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ করা হয় না। হুকুমদখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হলেও, বাস্তবে তা খেয়াল-খুশিমতো করা হয়। জমির মালিক প্রান্তিক মানুষ-দরিদ্র মানুষ-আদিবাসী মানুষ-নারীপ্রধান খানা হলে, তাদের কণ্ঠস্বর থাকে অশ্রুত। হুকুমদখলের সময়ে যে ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই।

আইনের নিজস্ব সমস্যা তীব্র, আর তার তুলনায় বাস্তবায়ন সমস্যা তীব্রতর। আদর্শ স্কোর '৫'-এর মধ্যে আইনের সমস্যার স্কোর ২.৮ (অর্থাৎ, ৫৬% অর্জন), অন্যদিকে আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর মাত্র ০.৮, অর্থাৎ আদর্শের তুলনায় মাত্র ১৬% অর্জন।

আইনে ব্যবহৃত বেশকিছু শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা প্রয়োজন। 'পুনর্বন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব'—এই শব্দগুচ্ছের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারীপ্রধান খানা, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন বিশেষ নির্দেশনা। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াটির সংস্কার প্রয়োজন। হুকুমদখলসংক্রান্ত বিষয়ে সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নোটিশ দেয়ার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন করতে পারেন; এরপরে আবেদন করা হলে তা বিবেচিত হবে না—এটি ন্যায়বিচার নীতির লঙ্ঘন। অন্যদিকে, সংশোধনবিষয়ক সিদ্ধান্তটি কত কার্যদিবসের মধ্যে সমাধা করতে হবে সে বিষয়ে নেই কোনো নির্দেশনা। এটি নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। আইনের পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন জরুরি। হুকুমদখলের সময়ে যেটুকু ক্ষতিসাধন হয়েছে তার বিপরীতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট বিধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ২০১৭ সালের আগে অধিগ্রহণকৃত কিংবা হুকুমদখলকৃত জমির মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনাসহ নির্দেশনা প্রয়োজন। নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজন আইনি নির্দেশনা। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি রোধে চাই ভূমি-অধিকার সংগঠন এবং স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠনের সমন্বিত নিয়মিত তদারকি, প্রতিবাদ। কৃষিজমিকে নষ্ট করে অধিগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। কৃষিজমির বিনষ্ট রোধে রাখতে হবে স্পষ্ট বিধান ।

৫.১ ভূমিকা

প্রথমেই জানা প্রয়োজন 'অধিগ্রহণ' এবং 'হুকুমদখল'—এই দুটি শব্দের অর্থ ও পার্থক্য। দুটি বিষয়ের মধ্যে বেশকিছু অন্তর্গত সাদৃশ্য রয়েছে। পার্থক্য শুধু কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব পুরোপুরি গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখল গ্রহণ। 'অধিগ্রহণ' অর্থ, এই আইন অনুসারে, ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী বক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। আর অন্যদিকে, এই একই আইন অনুযায়ী 'হুকুম দখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে—যেখানে কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত—সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের বিষয়টি বহুমাত্রিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার তার নানান কাজেই জমি অধিগ্রহণ করে—ব্রিজ, কালভার্ট, সড়ক, সেতু-উড়ালসেতু, বন্দর, রপ্তানি উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিদ্যুৎ স্থাপনা, নানান অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্যও জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যেই 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়; রহিত করা হয় পূর্বতন 'অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিকুইজিশন অব ইমমুভেবল্ প্রপার্টি অর্ডিন্যান্স- ১৯৮২' শীর্ষক আইনটি। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭'—আইনটি বিশ্লেষণ করেছি।

৫.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

এই সংক্রান্ত আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে জেনে নেয়া প্রয়োজন। এই অঞ্চলে এ ধরনের আদি আইনটি হলো '১৮২৪ সালের ১ নং প্রবিধান' (বেঙ্গল রেগুলেশন অ্যাক্ট ১, ১৮২৪) । তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে লবণ উৎপাদনের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় আইনটি প্রণীত হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৮৫০ সালে ১ নং আইনের মাধ্যমে আগের আইনটি রহিত হয়। মূলত, কলকাতা শহরের জমিকেও অধিগ্রহণের আওতায় আনার জন্য আইনটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই বছরে, অর্থাৎ ১৮৫০ সালের ৮২ নং আইনের মাধ্যমে রেলপথকে জনকল্যাণমুখী বলে ঘোষণা করা হয় এবং ওই কাজে জমি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল শুরু হয় (হক, প্রকাশনার সন-তারিখ উল্লেখ নেই)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনগুলো একত্রিত ও সুসংহত করে প্রণীত হয় ১৮৫৭ সালের ৬ নং আইন, যা সমগ্র বৃটিশ ভারতেই প্রযোজ্য ছিল। নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৭০ সালের ১০ নং আইনটি পাস করা হয়। ১৮৭০ সালের আগের আইনগুলোর সাথে ১৮৭০-এর ওই আইনটির মৌলিক পার্থক্য হলো এতে আগের 'সালিসি'র ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়। বিধান হলো, যে কালেক্টর এবং জমির মালিকের মধ্যে জমির মূল্য নিয়ে বিরোধ হলে তা যাবে দেওয়ানি আদালতে। ১৮৯৪ সালের নতুন আইনে জমির মূল্য বা ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কালেক্টরের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। ১৮৯৪ সালের ১নং আইন অনুযায়ী কালেক্টরের কাজ হবে জমির মূল্য নির্ধারণ—যা মূলত আইনি নয় বরং প্রশাসনিক বিষয়, এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জমির মালিকেরও আদালতের দারস্থ হবার বিধান ছিল (হক, প্রকাশনার সন-তারিখ উল্লেখ নেই)।

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পূর্ব বাংলার সরকারি দপ্তর এবং সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য 'পূর্ববঙ্গীয় জরুরি সম্পত্তি দখল অধ্যাদেশ ১৯৪৭' জারি হয়। এতেও জমির চাহিদা পূরণ হয়নি। ফলে, জমির দখল ত্বরান্বিত করতে '(জরুরি) সম্পত্তি অধিযাচিত দখল আইন ১৯৪৮' (দ্য ইমার্জেন্সি রিকুইজিশন অব প্রপার্টি অ্যাক্ট-১৯৪৮) পাস করা হয়। এটি ছিল ওই বছরের ত্রয়োদশ আইন। তবে, এই আইনের পাশাপাশি ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনটিও বহাল

থাকে, যদিও ১৮৯৪ এর আইনের প্রয়োগ ওই সময়ে কদাচিৎ-ই করা হয়েছে (হক, প্রকাশনার সন-তারিখ উল্লেখ নেই)।

৫.৩ অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন

১৯৮২ সালে প্রণীত হয় 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২' (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিকুইজিশন অব ইম্‌মুভেবল্ প্রপার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২)। এটিই ছিল তিন পার্বত্য জেলা (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, এবং রাঙ্গামাটি) ছাড়া জমির অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখলসংক্রান্ত চূড়ান্ত আইনি দলিল (Barkat et al., 2014)। সহায়ক আইনি দলিল হিসেবে ছিল 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২' (দ্য অ্যাকুইজিশন অব ইম্‌মুভেবল্ প্রপার্টি রুলস, ১৯৮২) এবং 'স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা-১৯৮২' (দ্য রিকুইজিশন অব ইম্‌মুভেবল্ প্রপার্টি রুলস-১৯৮২)। এছাড়াও ছিল 'অধিগ্রহণসংক্রান্ত নির্দেশাবলী, ১৯৯৭' (ইন্সট্রাক্‌শন রিগার্ডিং অ্যাকুইজিশন, ১৯৯৭), 'যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন-১৯৯৫', 'পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ)-১৯৯৫', এবং 'ইলেভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ), ২০১১'। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮২-এর এই আইন পার্বত্য তিন জেলার জন্য প্রযোজ্য নয়। ওই অঞ্চলের আইনি এবং সামাজিক কাঠামো যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন তার সমস্যা এবং সমস্যার মাত্রা।[৫১]

১৯৮২-এর আইনটি করা হয়েছিল সময়ের বাস্তবতা অনুসারে। কিন্তু ক্ষমতাহীন মানুষের পক্ষে ওই আইন কার্যকরভাবে দাঁড়াতে পারেনি।[৫২] উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের আইনের বলে সম্পত্তির ওপরকার সব স্থাপনাও অধিগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ওই আইনের ৩(১) ধারা অনুযায়ী 'জনস্বার্থে' ভূমি অধিগ্রহণের কথা, কিন্তু, 'জনস্বার্থের' কোনো সংজ্ঞা সেখানে ছিল না। নোটিশ দেয়ার পদ্ধতিতেও ছিল ত্রুটি, প্রায় সময়ই দেখা যেত যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নোটিশ পায়নি। ওই আইনের আওতায় সম্পাদিত সব কাজ 'সরল বিশ্বাসে' করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়, অথচ 'সরল বিশ্বাস'-এর কোনো সংজ্ঞা ছিল না। এমন নানান অসঙ্গতি ছিল ওই আইনে। সর্বোপরি,

---

৫১ উল্লেখ্য, 'চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন-১৯৫৮'-এর সংশোধনকল্পে ২০১৯ সালে ৩নং আইনটি প্রণীত হয়, যা অভিহিত হয় 'চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৯'-এর ফলে ২০১৮ সালের ৩নং আইন, অর্থাৎ, 'চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০১৮' রহিত হয়। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০১৯ সালের ৩নং আইনের মাধ্যমে ১৯৫৮-এর রেগুলেশনের মূলত চতুর্থ ধারাতেই কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়, যেখানে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি রয়েছে।

৫২ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর আইনি সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এবং তার পরিপেক্ষিতে সংশোধনী-প্রস্তাবগুলোর জন্য দেখুন: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (দ্বিতীয় খণ্ড: পরিত্যাক্ত সম্পত্তি এবং অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। এই গ্রন্থে অধিগ্রহণ বিষয়ে ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ বিশ্লেষিত হলেও, ২০১৭ সালের বর্তমান আইনের ক্ষেত্রে তা এখনো প্রাসঙ্গিক।

আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ছিল প্রকট সমস্যা, বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়টি ছিল নৈমিত্তিক; সংশ্লিষ্ট ঘাটতি ছিল অপরিমেয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু পরিবর্তনসাপেক্ষে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২' আইনটি বাতিল করে নতুন আইন 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭' পাস ও কার্যকর হয়। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে সর্বমোট ধারা ছিল ৪৮টি; কিন্তু, বর্তমান ২০১৭ সালের আইনটিতে সর্বমোট ধারা আছে ৫১টি, এর মধ্যে ৩টি ধারা সম্পূর্ণ নতুন, সেগুলো হলো ধারা ৩ (আইনের প্রাধান্য), ৫০ (রহিতকরণ ও হেফাজত) ও ৫১ (ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ)।

২০১৭ সালের আইনের ২ ধারায় নতুন ৭টি বিষয়ে সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা হলো অধিগ্রহণ, কমিশনার, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, দেওয়ানি কার্যবিধি, যৌথ তালিকা, স্থাবর সম্পত্তি এবং হুকুম দখল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা আগের ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ছিল না; ধারা ৩-এ (আইনের প্রাধান্য) বলা হয়েছে, বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানগুলোই প্রাধান্য পাবে। ২০১৭ সালের আইনের ৪ ধারায় (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), ও (১২) নতুন উপধারা। এসব উপধারায় বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অধিগ্রহণ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ছিল না।

বর্তমান আইনে বলা হয়েছে যে, "জেলা প্রশাসক যে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন তা সঠিকভাবে বিবেচনার পর, ক্ষেত্রমতো, (ক) সরকার ওই প্রতিবেদন দাখিলের অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে, এবং (খ) কমিশনার ওই প্রতিবেদন দাখিলের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।" (ধারা-৬) কিন্তু ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে সরকার ওই প্রতিবেদন দাখিলের অনূর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আগের চেয়ে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস কমিয়ে ফেলা হয়েছে। নতুন ৮ ধারায় (জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত) বলা হয়েছে যে, "ক্ষতিপূরণের মঞ্জুরি প্রস্তুত হওয়ার পর জেলা প্রশাসক ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে তার কাছে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ প্রদান করতে বলবেন।" উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের কথা বলা হয়েছিল।

২০১৭ সালের ধারা ৮-এর (৫) উপধারা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, "ধারা ৭-এর অধীন নোটিশ জারির পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুতির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।" কিন্তু, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে এই উপধারা ছিল না।

২০১৭ সালের আইনের ৯ ধারার (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলী) উপধারা (২)-এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে; তা হলো, "সরকারি কোনো প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপধারা (১)-এর দফা (ক) তে বর্ণিত বাজারদরের ওপর অতিরিক্ত শতকরা ২০০ (দুইশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে: তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ওই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে বাজারদরের ওপর অতিরিক্ত শতকরা ৩০০ (তিনশত) ভাগ"। কিন্তু, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে স্পষ্ট বলা ছিল যে, উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত বাজারমূল্য ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের উপর আরও শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারবেন। এছাড়াও, ২০১৭ সালের আইনের ধারা ৯-এর (৩) ও (৪) উপধারা নতুন সংযোজন করা হয়েছে, যা পূর্বের অধ্যাদেশে ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে, (৩) "উপধারা (১)-এর দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ)-তে বর্ণিত ক্ষতির ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের ওপর অতিরিক্ত শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।" (৪) "এই ধারায় উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।" ২০১৭ সালের আইনের ১১ নং ধারার (ক্ষতিপূরণ প্রদান) (৩) উপধারা নতুন সংযোজন করা হয়েছে, যা আগের ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ছিল না। নতুন উপধারায় বলা হয়েছে যে, "ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদারকে ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে এবং জেলা প্রশাসক তার কাছ থেকে উক্ত অর্থ আদায় করে বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।"

২০১৭ সালের আইনের ২৬ ধারার (হুকুমদখল অবমুক্তকরণ) উপধারা (৪) নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এটি ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ছিল না। এখানে বলা হয়েছে, যার অনুকূলে হুকুমদখলমুক্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তরিত হবে তাকে পাওয়া না গেলে অথবা তার কোনো প্রতিনিধি বা তার পক্ষে দখল নেয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে, জেলা প্রশাসক ওই সম্পত্তির প্রকাশ্য কোনো স্থানে 'স্থাবর সম্পত্তিটি হুকুমদখল মুক্ত হয়েছে' মর্মে বিজ্ঞপ্তি লটকাবেন এবং, ওই বিজ্ঞপ্তির ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে, সেই মর্মে একটি নোটিশ দেবেন।

২০১৭ সালের আইনের ৩১ ধারার (শুনানির নোটিশ) উপ-ধারা (২) নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যা ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ছিল না। ওই উপধারায় আরবিট্রেটর অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনের ওপর শুনানি গ্রহণ করে তার আদেশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে এরকম শুনানির কোনো সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ২০১৭ সালের আইনের ৩৬ ধারার (আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল)

উপধারা (৬) নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যেখানে আরবিট্রেশন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালকে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করে তা জেলা প্রশাসককে করতে বলা হয়েছে। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে এ রকম কোনো সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির কথা বলা হয়নি। ২০১৭ সালের আইনের ৩৭ ধারার (অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান) উপধারা (২) ও (৩) নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে আরবিট্রেটর বা ক্ষেত্রমতো, আরবিট্রেশন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদের ফলে প্রদেয় অতিরিক্ত টাকা প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক জমা প্রদানের পরেই জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট দাবিদারকে ওই অতিরিক্ত টাকা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, প্রদত্ত রোয়েদাদ অনুসারে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধের জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ওই বিষয়ে কোনো কিছু বলা ছিল না।

১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের ধারায় পরিবর্তন করে ২০১৭ সালের আইনের ধারা ৩৮ নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১নং আইন)-এর কোনো কিছুই এই আইনের অধীন আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের আইনের ৪০ ধারার (প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা) উপ-ধারা (৩) নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। ওই উপধারায় জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকাপ্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ঘটনাস্থলে অথবা সুবিধাজনক কাছাকাছি দ্রুততম সময়ে আদায় করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে এ ধরনের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়নি।

২০১৭ সালের ৪৩ ধারা (শাস্তি বা দণ্ড) "কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ অমান্য করলে বা বিরোধিতা করলে অথবা অমান্য বা বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে অথবা বিরোধিতা বা অমান্য করার জন্য প্ররোচনা দিলে অথবা এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধির মাধ্যমে অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিলে, তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু, ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

২০১৭ সালের ৪৬ ধারায় ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে 'দায়মুক্তি' শব্দটির পরিবর্তে 'সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ' কথাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এটুকু স্পষ্ট যে, 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২' আইনটি থেকে ২০১৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনটিতে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু, ২০১৭ সালের ওই আইনে যা-ই বলা হোক না কেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এই আইনের সঠিক প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন এখনো অনেক দূরের পথ।

৫.৪ একনজরে বিদ্যমান আইন: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভূমি অধিগ্রহণের বর্তমান মূল আইনটি হলো 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭'। এই আইনের সর্বমোট ধারা ৫১টি। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি ধারার বিষয় উল্লেখ করা হলো।

- 'জনপ্রয়োজনে' বা 'জনস্বার্থে' স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক প্রাথমিকভাবে নোটিশ জারি করবেন। অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হতে পারে এমন ভূমির ওপর জনস্বার্থবিরোধী উদ্দেশ্যে কোনো ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে কি না বা নির্মাণাধীন কি না তা জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় উল্লেখ করবেন। তবে, জেলা প্রশাসকের নোটিশ জারির পূর্বে যদি কেউ অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হতে পারে এমন ভূমির শ্রেণির পরিবর্তন করে বা অসদুদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করে, তাহলে ওই পরিবর্তন জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন না। 'জনস্বার্থবিরোধী উদ্দেশ্য' বলতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে কোনো কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যকে বোঝাবে (ধারা ৪)।

- কোনো ব্যক্তির অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে নোটিশ জারির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে আপত্তি দাখিল করতে পারবেন (ধারা ৫)।

- আইনে ভূমি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের কারণে যে ক্ষতি হয় তার জন্য সরকার শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে এবং সেই জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন- নোটিশ জারির সময় সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির বাজারমূল্য। তবে বাজারমূল্য নির্ধারণের সময় ওই স্থাবর সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার ১২ (বার) মাসের গড় মূল্য (নোটিশ জারির পূর্বে) নির্ধারিত নিয়মে হিসাব করতে হবে (ধারা ৯ ও ২২)।

- এই আইন অনুযায়ী 'বর্গাদার' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে, যিনি আধি, বর্গা বা ভাগ বলে সাধারণভাবে পরিচিত কোনো পদ্ধতিতে অন্য কোনো ব্যক্তির জমি চাষ করেন এবং শর্তানুযায়ী উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ ওই ব্যক্তিকে প্রদান করেন (ধারা ১৪)।

- অধিগ্রহণকৃত বা হুকুমদখলকৃত জমির সব কার্যক্রম সরকার যেকোনো সময় প্রত্যাহার বা বাতিল করতে পারেন (ধারা ১৪)।

- কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে অথবা প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিলে ওই অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে (ধারা ১৮)।

- যে উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়া, ওই উদ্দেশ্য বাদে অন্য কোনোভাবে ওই সম্পত্তি ব্যবহার অথবা বিক্রি, লিজ, এওয়াজ[৫৩] বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না এবং প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে ওই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে (ধারা ১৯)।

- বর্তমান আইনে খাস খতিয়ানের অধীনে অব্যবহৃত জমি নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পর প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর বিপুল পরিমাণে জমি অব্যবহৃত থেকে যায় (ধারা ১৯)।

- জেলা প্রশাসক ধারা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ এর দাবিদারকে প্রদান করবেন (ধারা ২৩)। জেলা প্রশাসক কোনো ব্যক্তির অনুকূলে হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দ দেয়া ও দখল হস্তান্তরের পর ধার্যকৃত অর্থ তার কাছ থেকে আদায় করবেন এবং হুকুমদখলকালীন সময়ে জেলা প্রশাসক হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন (ধারা ২৪ ও ২৫)।

- সরকার বিচার বিভাগীয় একজন কর্মচারীকে আরবিট্রেটর হিসেবে নিয়োগ দেবে। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলও করা যায় (ধারা ২৯, ৩১ ও ৩৬)।

---

[৫৩] এওয়াজ হলো— হেবা-বিল-এওয়াজ, যার শাব্দিক অর্থ হলো প্রতিদানের জন্য দান। অর্থাৎ এই প্রকারের দানের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিদান থাকতে হবে। হেবা বা সাধারণ দানের সাথে হেবা-বিল-এওয়াজের পার্থক্য এই যে, হেবা-বিল-এওয়াজ হলো প্রতিদানের জন্য প্রদত্ত একটি দানবিশেষ। বস্তুত এটি এক প্রকারের বিক্রয় এবং এতে বিক্রয়চুক্তির যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকে।

- আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণবাবদ অতিরিক্ত অর্থ দেয়ার প্রয়োজন হলে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট রোয়েদাদের এক মাসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে ওই অতিরিক্ত অর্থ জমা দেয়ার জন্য নোটিশ দেবেন এবং প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা ওই নোটিশ পাওয়ার অথবা রোয়েদাদের এক মাসের মধ্যে ওই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবেন (ধারা ৩৭)। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সালিসি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক ও আরবিট্রেটরকে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (ধারা ৩৯)।

- কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা হুকুমদখলের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেকোন স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ, তল্লাশী, জরিপ, সীমানা ও গর্ত খুড়ে লেভেল করা এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করতে পারবেন (ধারা ৪০)।

- এই আইনের অধীনে নোটিশ জারি করার জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করে জারি করলে, শুধু পরিবারের সাবালক পুরুষ বা যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে, তারা যদি না থাকে, নোটিশ অপ্রাপ্তির ভিত্তিতে পুরো প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হয় বা ফেরত যায় (ধারা ৪২)।

- কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ অমান্য বা বিরোধিতা করলে বা প্ররোচণা দিলে অথবা অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেয়া হলে, তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা ৪৩)।

- এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল দিতে কেউ অসম্মতি জ্ঞাপন করলে অথবা কোনোরূপ বাধা দিলে জেলা প্রশাসক ওই ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য করতে পারবেন এবং ওই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বল (ফোর্স) প্রয়োগ করতে পারবেন (ধারা ৪৪)।

- এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধির আওতায় সরল বিশ্বাসে কোনো কৃতকর্মের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনি কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না (ধারা ৪৬)।

- উল্লেখ যে, 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭' বাংলাদেশ গেজেটে ২১.০৯.২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই আইনের বিধানগুলোর

কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে বিধি প্রণয়নের কাজটি এখনো হয়নি। তবে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের ৪ থেকে ১১ ধারা প্রয়োগের জন্য সরকার ১০.১২.২০১৭ তারিখে একগুচ্ছ নির্দেশাবলী ঘোষণা করে, যেখানে সর্বমোট ২৫টি নির্দেশ এবং ৬টি সংশ্লিষ্ট ফরম বিবৃত হয়েছে।

- উল্লেখ্য, পূর্বের আইন, অর্থাৎ 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২', এর অধীনে রজ্জু করা যেসব মামলা এখনো চলমান আছে, সেগুলো ১৯৮২-এর ওই আইন দ্বারাই পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, ২০১৭- এর আগে অধিগ্রহণকৃত জমির বিষয়ে কোনো মামলা ওই সময়কালে হয়ে থাকলে, তা ২০১৭-এর আইন নয়, বরং ১৯৮২-এর অধ্যাদেশের বিধিবিধান অনুযায়ীই সমাধা হবে। এটি স্পষ্ট যে, যেহেতু ২০১৭-এর আইনটি নতুন, তাই এর আগের অধিগ্রহণসংক্রান্ত মামলা 'পূর্বতন আইনের দুর্ভোগ'সহ চলছে।

৫.৫ আইন বাস্তবায়ন সমস্যা

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল-২০১৭' আইনটির বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট। আইনে নির্দেশনা আছে; কিন্তু, বহুক্ষেত্রেই নেই বাস্তবায়ন। আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে। এছাড়াও, আইনের দুর্বলতা ও ঘাটতির কারণেও মাঠপর্যায়ে তথা জনমানুষের জীবনেও এ-সংক্রান্ত প্রচুর অন্যায় ও ভোগান্তির ঘটনা ঘটে। এটি লক্ষ্যণীয় যে, বাস্তবায়ন সমস্যা কিন্তু আইনের সমস্যাও বটে। আইনি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত না করতে পারলে—এটি বোঝা মোটেও দুরূহ নয় যে আইনের ফাঁকফোকর, নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা, অন্য আইন কিংবা একই আইনের অন্য ধারা, উপধারার সাথে সাংঘর্ষিকতা, সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বা নির্দেশনার অভাবও আইনের অপ্রয়োগ, অপ-প্রয়োগ, আংশিক প্রয়োগ কিংবা না-প্রয়োগের পথ সুগম করে।

এই আইনের সূচনাতেই সমস্যার শুরু। এর ২ নং ধারায় মোট ১৩টি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: (১) অধিগ্রহণ, (২) আরবিট্রেটর, (৩) কমিশনার, (৪) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, (৫) জেলা প্রশাসক, (৬) দেওয়ানি কার্যবিধি, (৭) নির্ধারিত, (৮) প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা, (৯) মালিক, (১০) যৌথ তালিকা, (১১) স্থাবর সম্পত্তি, (১২) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (১৩) হুকুমদখল। অথচ, এই আইনে উল্লিখিত 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'-এর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। এ ছাড়াও এই আইনে খুবই প্রয়োজন ছিল কয়েকটি বিষয়; যেমন: 'পুনর্বন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থসামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদি। অথচ এই বিষয়গুলো আইনে অন্তর্ভুক্তই হয়নি, স্বভাবতই বিষয়গুলোর যথাযথ সংজ্ঞা এবং সঠিক ব্যাখ্যা এই আইনে অনুপস্থিত। ব্যাখ্যা নেই 'সরল বিশ্বাস' শব্দটির।

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর ৪ থেকে ৯ ধারা অধিগ্রহণ বিষয়ে আইনি নির্দেশনাগুলো বিবৃত করেছে। এসব ধারায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ জারি, অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি, রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ, ক্ষতিপূরণ, দখলগ্রহণ, অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল বা প্রত্যাহার, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিকে জমি হস্তান্তর, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৪ এবং ৭ নং ধারা অনুযায়ী অধিগ্রহণের প্রয়োজনে যৌক্তিক, কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে নোটিশ জারির কথা বলা হয়েছে। অথচ, এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ মাঠপর্যায়ে; রয়েছে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হবার অসংখ্য উদাহরণ। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর কোনো আলোচনা না করেই জেলা প্রশাসক নোটিশ জারি করেন। ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলে এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তারা লোকমুখে নানান কথা শোনেন; কিন্তু, সঠিক পদ্ধতিতে তারা কোনো নোটিশ পাননি। স্থানীয় কিংবা জাতীয় সংবাদপত্রে অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ-সংক্রান্ত কোনো নোটিশ প্রকাশিত হয় না। 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭ বাস্তবায়নসংক্রান্ত নির্দেশাবলী'-এর ৭ নং নির্দেশ অনুযায়ী ডাকযোগে নোটিশ দেয়ার সাথে সাথে সেটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার কথা। অথচ, চিঠি দেয়া হলেও ওয়েবসাইটে 'সহজে দেখবার উপযোগী' করে নোটিশ প্রদর্শনের বিষয়টি বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় না। আইনের ৭ (১)-ধারা অনুযায়ী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাধারণ নোটিশ জারি করবার কথা, কিন্তু, আদতে প্রায়ই এমনটি হয় না—বিশেষত আদিবাসীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকেই কোনো নোটিশই পাননি, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।

আইনের ধারা ৮-এ জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ[৫৪] প্রস্তুত এবং ৯ নং ধারায় ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আইনি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আবাসস্থল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয় না। ফলে, বঞ্চিত হয় ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশী মানুষ। অনেক সময়ই ওই জমির বাজারদর নির্ধারিত হয় স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রক্ষিত গত একবছরের ওই এলাকার জমির বিক্রয়মূল্য থেকে। এর ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় যথেষ্ট পরিমাণে অবমূল্যায়িত (আন্ডারভ্যালুড) দাম। যে সময়সীমার মধ্যে এসব কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের কথা, তা অনুসরণ করা হয় না প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই। অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার আবাসস্থল বা ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তরে বাধ্য করা হলে সেজন্য যুক্তিসংগত ব্যয় বহনের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও প্রায় সবক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটছে। পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক সময়সাপেক্ষ, কিন্তু জমির মূল্য নির্ধারিত হয় নোটিশ দেয়ার তারিখ থেকে। ফলে, এই

---

[৫৪] 'রোয়েদাদ' বলতে অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল বা হুকুমদখলের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণবাবদ প্রদেয় অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাকে বোঝানো হয়েছে।

সময়কালে জমির মূল্য বাড়লেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সেই মূল্য পান না। জমির শ্রেণি, জমি থেকে প্রাপ্ত আয়, জমির বিপরীতে দেয়া কর ইত্যাদিও নেয়া হয় না বিবেচনায়। প্রান্তিক জনমানুষ, নারীপ্রধান খানা, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বাড়তি কোনো সুবিধার (পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন) সুযোগ রাখা হয়নি। ভূমি রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, দলিল হস্তান্তরের বিষয়টি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেকর্ডে যার ভূমি ছিল, তার নামই থেকে যায় দীর্ঘ সময় ধরে। ফলে, ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা হয় দীর্ঘসূত্রী। সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর জমির মূল্য নির্ধারণে অহেতুক সময়ক্ষেপণ করে, গড়িমসি করে জমির ওপরকার কোনো সম্পদের তালিকা তৈরিতে। এর ফলে সুগম হয় দুর্নীতির পথ, ভোগান্তিতে পড়ে জনসাধারণ। আইনের ১০নং ধারা (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যেসব বিষয় বিবেচ্য নয়) সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয় বলে সাধারণের জন্য এর প্রায়োগিক সমস্যা তেমন নেই।

আইনের ১১ (ক্ষতিপূরণ দেয়া) এবং ১৩ (অধিগ্রহণ এবং দখলগ্রহণ)—এই দুটি ধারা বাস্তবায়নে সমস্যা অনুসন্ধানে প্রথমেই ধরা পড়ে যে, আইনে শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাই বলা হয়েছে। এমনিতেই আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ন্যায্য দাবির তুলনায় থাকে অনেক কম; আর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং চরম ভোগান্তি অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। অন্যদিকে, অআর্থিক ক্ষতিপূরণ—যেমন: পুনর্বন্দোবস্ত, পুনর্বহাল প্রকল্প এবং পরিবেশগত সুরক্ষা বজায় রাখার কোনো সুযোগই নেই। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ বিস্তর। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে বিলম্ব হয় অনেক; দরিদ্রদের ঘুরতে হয়, ধনীরা পান দ্রুত। এছাড়া, প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনেই, বলা ভালো— নিরব সমর্থনেই গড়ে উঠেছে একদল দালাল-প্রতারক চক্র। এরা নানা রকম ভুল তথ্য ও মিথ্যে কাগজপত্র দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত তো করেই, এমনকি জাল কাগজ তৈরি করে ক্ষতিপূরণের অর্থ পর্যন্ত তুলে নেয়।

অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল অথবা প্রত্যাহার বিষয়ে আইনি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আইনের ১৪ নং ধারায়; এমনকি আইনে এও বলা হয়েছে যে, "কোনো অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল হলে অথবা প্রত্যাহার করা হলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ বাবদ তার যুক্তিসঙ্গত খরচসহ উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করে তা প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে আদায় করে যথাযথভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।" কিন্তু, বাস্তবে অধিগ্রহণকৃত জমির সমগ্র কার্যধারা সরকার বাতিল করলেও সাধারণত জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ করা হয় না। এতে জনগণকে অসুবিধায় পড়তে হয়। অধিগ্রহণ বাতিলের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে জানতে না পারার ফলে, অর্থাৎ কবে জেলা প্রশাসকের এ-সংক্রান্ত ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে তা জানতে না পারার কারণে জমির মালিক প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরও করতে পারেন না।

আইনের ১৫ নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ কি না সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হলে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।" সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের প্রশ্ন প্রায় কোনো সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর কাছে পৌঁছায় না, পৌঁছাতে দেয়া হয় না, কিংবা পৌঁছালেও কোনো কাজ হয় না।

আইনের ১৬ নং এবং ১৭ নং ধারায় বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হস্তান্তর বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। আইনে 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ' এমন গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছের স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই বলে অনেক সময়ই যথার্থ যুক্তি ছাড়াই বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, অধিগ্রহণ প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারসাজিতে অনেক সময়ই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে ভীষণ গড়িমসি করা হয়। সমাজের উপর স্তরের কিছু 'রেন্টসিকার' দুর্বৃত্তের সাথে প্রশাসনের অবৈধ আঁতাতেই এমনটি ঘটে থাকে।

এই আইনটির ১৯ নং ধারায় অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহার বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। ৩ নং উপধারা অনুযায়ী, যে উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার কোনো লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ এবং তা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে খাস খতিয়ানভুক্ত করবার কথা। কিন্তু, বাস্তবে এর ব্যত্যয় যেন অতি সাধারণ এক ঘটনা। এ ছাড়াও, জেলা প্রশাসনের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি শেষ হবার পরও বিপুল পরিমাণ জমি অব্যবহৃত থেকে যায় প্রায়ই।

আইনের ২০ নং থেকে ২৮ নং ধারা 'হুকুমদখল' বিষয়ে আইনি নির্দেশনা দেয়। ২০ (১)-নং উপধারা অনুযায়ী "জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, জন-উদ্দেশ্যে ও জনস্বার্থে, যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে হুকুমদখল করিতে পারিবেন" শুনতে নিরীহ শোনালেও অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ 'জন-উদ্দেশ্য' ও 'জনস্বার্থ'-এর কোনো সংজ্ঞা কিংবা কোনো ব্যাখ্যা নেই বলে এই আইন বাস্তবায়নে সমস্যা; মানুষের, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয় প্রায়শই। 'জনস্বার্থে' শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা ছাড়া (যা আইনের ২ নং ধারায় সংযুক্ত হতে পারে) এ সমস্যাটি প্রকট থেকে প্রকটতর হবে। এ ছাড়াও, এই ধারা অনুযায়ী "কেবল পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত মালিক বা তার পরিবারের প্রকৃত আবাসস্থল, ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, গণগ্রন্থাগার, কবরস্থান বা শ্মশানের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা যাবে না।" এই তালিকায় 'জাদুঘর/ঐতিহ্যগত-ঐতিহাসিক প্রদর্শনশালা', 'ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও যুক্ত করা প্রয়োজন।

আইনের ২১ নং ধারা অনুযায়ী সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমদখলসংক্রান্ত কোনো আদেশ সংশোধন করতে পারেন। বলা হয়েছে, ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদন না করা হলে তা বিবেচনা করা হবে না, কিন্তু সংশোধন বিষয়ে সিদ্ধান্তটি কত কর্মদিবসের মধ্যে সমাধা করতে হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। এই সুযোগে হুকুমদখলের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে ঘোরানো হয়, ভোগান্তি বাড়ানো হয়, দুর্নীতির পথ সুগম করা হয়।

এই আইনের ২২ নং ধারায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু, অধিগ্রহণের মতোই হুকুমদখলের ক্ষেত্রেও রোয়েদাদ প্রস্তুতে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হলেও, বাস্তবে তা খেয়াল-খুশিমতো করা হয়। ফলে, জমির মালিককে ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর জমির মালিক প্রান্তিক মানুষ-দরিদ্র মানুষ-আদিবাসী মানুষ-নারীপ্রধান খানা হলে তো কথাই নেই; তার দাবি সমাজের আর সব ক্ষেত্রের মতো এখানেও উপেক্ষিত, তার কণ্ঠস্বর থাকে অশ্রুত। এ ছাড়াও, ২৩ নং ধারা অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা তা নিয়েও ভোগান্তি বিস্তর। দেখা গেছে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ দাবিদারকে দেয়ার ক্ষেত্রে সবসময় বিলম্ব হয়। ২৪ নং ধারা অনুযায়ী হুকমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়। জেলা প্রশাসক এই দায়িত্বটি পালন করেন। কিন্তু জেলা প্রশাসকের, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দ দেয়া ও দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, কোনো নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নেই। ফলে, ক্ষতিপূরণ আদায়ে দীর্ঘ সময় লাগে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আইনে নেই কোনো নির্দেশনা। শেষ পর্যন্ত, যার জমি হুকুমদখল করা হলো, সেই ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পেতে ভীষণ বিলম্ব হয়। ২৫ নং ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, হুকুমদখলকালীন সময়ে, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। তবে, এই নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থের অনূর্ধ্ব এক-ষষ্ঠাংশ অর্থ ব্যয় করে এই সংস্কার করা সম্ভব; তবে, ব্যয় এক-ষষ্ঠাংশের বেশি হলে সেই বরাদ্দের কোনো উপায় নেই। সেক্ষেত্রে উপায় নেই কোনো নিরীক্ষণেরও। আইনি নির্দেশনা থাকলে এই বিষয়টির কিছুটা হলেও সুরাহা হতে পারতো।

হুকুমদখল অবমুক্তকরণের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে এই আইনের ২৬ নং ধারায়। বাস্তবে, কোনো স্থাবর সম্পত্তির হুকুমদখল মুক্ত করা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রকৃত মালিকের তার সম্পত্তি ফিরে পেতে অনেক সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও, হুকুমদখলকৃত জমিতে হুকুমদখলের সময়ে যে ক্ষতি হয় তার বিপরীতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধানও নেই।

উচ্ছেদের বিষয়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি নির্দেশনা রয়েছে আইনের ২৭ নং ধারায়। আইনি নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে যিনি দখলে রয়েছেন তিনি নানান অজুহাতে দেরি করেন। কেউ

কেউ আদালতের শরণাপন্ন হন। এছাড়াও, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-পেশী-অর্থশক্তির কোনো একটি কিংবা একাধিক ব্যবহার করে উচ্ছেদপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার নিদর্শন রয়েছে অনেক।

আইনের ২৯ থেকে ৩৭ নং ধারায় আরবিট্রেশন[৫৫] সম্বন্ধে নির্দেশনা রয়েছে। ২৯ নং ধারা অনুযায়ী এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার নিচে নন এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য আরবিট্রেটর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। ৩০ নং ধারায় রয়েছে আরবিট্রেটরের কাছে আবেদনের নির্দেশাবলী। শুনানির নোটিশ জারির আইনি বিধিবিধান রয়েছে ৩১ নং ধারায়। ৩২ নং ধারা অনুযায়ী আরবিট্রেটরের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ৩৩ এবং ৩৪ নং ধারায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আরবিট্রেটরের কর্মপদ্ধতি এবং আরবিট্রেটর কর্তৃক রোয়েদাদ ধার্যের বিষয়ে বলা হয়েছে। কার্যধারায় ব্যয় কোনপক্ষ কী পরিমাণে বহন করবেন তা নিয়ে বলা হয়েছে ৩৫ নং ধারায়। ৩৬ নং ধারা আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল বিষয়ে আইনি নির্দেশনা দেয়। এই ধারাগুলোর বাস্তবায়ন বিষয়টি পর্যালোচনা করে নানান সমস্যা খুঁজে পাওয়া গেছে। দেখা যায়, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ভোগান্তি এতে দিন দিন বাড়তে থাকে। এছাড়াও, এই সালিসি কার্যক্রম এতটাই দীর্ঘসূত্রী যে তা প্রকারান্তরে ন্যায়বিচারকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তদুপরি, সময়সীমা নিয়ে আইনি নির্দেশনা দেয়ার বিধান থাকলেও, বাস্তবে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালে করা আপিল নিষ্পত্তিতে অনেক বিলম্ব হয়। এছাড়াও, ভূমির প্রকৃত মূল্য এবং আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত জমির ক্ষতিপূরণের পরিমাণও উপেক্ষিত হয়। ৩৭ নং ধারায় আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা নির্বিশেষে, বাস্তবে এই ক্ষতিপূরণ আদায় করা অতি দুরূহ বিষয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সময়মতো টাকা জমা দেন না, মালিককে যথাসময়ে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদানে অনেক বিলম্ব ঘটে।

এই আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে 'বিবিধ' আইনি নির্দেশনা। ৩৯ নং থেকে ৫১ নং এই কয়েকটি ধারা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানি আদালতে ক্ষমতার আইনি নির্দেশাবলী রয়েছে ৩৯ নং ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরকে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ফলে, পুরো সালিসিপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়, ভোগান্তিতে পরেন জমির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ। কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কিংবা হুকুমদখল করবার অভিপ্রায়ে বা হুকুমদখলের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সহকারী ওই সম্পত্তিতে প্রবেশ ও পরিদর্শন করতে পারবেন—যা প্রায়শই হয়ে ওঠে চূড়ান্ত ভোগান্তিমূলক এবং লঙ্ঘিত হয় মৌলিক মানবাধিকার। এ-সংক্রান্ত

---

[৫৫] 'আরবিট্রেশন' বলতে এখানে কাঠামোগত-পদ্ধতিমাফিক সালিসি ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

নোটিশ ও আদেশ কীভাবে জারি করা হবে, ৪২ নং ধারায় সে সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। এই ধারার দুটি উপধারায় নোটিশ যেন ঠিকমতো উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেয়ার কথাই বলা হয়েছে। ওই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে তার পক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দেয়ার কথা। এটিও সম্ভব না হলে তার বাসস্থান বা কর্মস্থলে ওই নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়ার কথা। তবে, বাস্তবে এই নোটিশ ও আদেশ জারির কাজটি এমন পদ্ধতিগতভাবে সমাধা করা হয় না প্রায়শই। ফলে অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে অনেকসময়ই নোটিশ কিংবা আদেশ ঠিকমতো-ঠিকসময়ে পৌঁছায় না—মানুষকে পড়তে হয় ভোগান্তিতে।

কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো আদেশ অমান্য বা বিরোধিতা করলে অথবা অমান্য বা বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে বা অমান্যে প্ররোচিত করলে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হবার বিধান রয়েছে আইনের ৪৩ নং ধারায়। অর্থদণ্ডের পরিমাণ, যার জন্য জমি হুকুমদখল করা হচ্ছে (স্বভাবতই, তিনি ক্ষমতাকাঠামোর ওপর দিককার মানুষ), তার জন্য অতি নগণ্য—ফলে তার আইন মেনে চলার আগ্রহ কম।

এই আইনের ৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে "এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেনো দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনি কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।" এই ধারায় 'সরল বিশ্বাস' শব্দগুচ্ছের অপপ্রয়োগ খুবই সম্ভব, কেননা 'সরল বিশ্বাস' কথাটির কোনো সংজ্ঞা বা মানদণ্ড এই আইনে একেবারেই নেই। 'সরল বিশ্বাসে' কৃত কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনি কার্যধারা গ্রহণ না করায় বাস্তবে তা প্রশস্ত করে দিয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখার কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ক্ষেত্র।

মাঠগবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রদানকালে ভূমি অধিকার কর্মীরা 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭'-এর বাস্তবায়নসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। ভূমি অধিকার কর্মীরা বলেন, চরাঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অনেক দরিদ্র পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পড়ছে। আইনে আছে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে এরপর উচ্ছেদ করতে হবে, কিন্তু আইনের এই বিধানের বাস্তবায়ন তেমন একটা চোখে পড়ে না। কোন উপজেলায় কী পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ হচ্ছে তার সঠিক কোনো হিসাব না থাকায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দিন দিন বেড়েই চলছে। বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও এই সুযোগে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ভূমি অধিকার কর্মীরা বলেন, সরকার দেশের কল্যাণার্থে ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এই অধিগ্রহণ যেন কখনোই জবরদস্তিমূলক না হয় এবং এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়। রাষ্ট্র যদি সরকারি কাজে কোনো ব্যক্তির ভূমি অধিগ্রহণ করে তবে আইনের বিধান অনুযায়ী তাকে তিনগুণ বেশি দাম দিতে হবে, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি খুব কমই দেখা যায়। কৃষিজমিকে নষ্ট করে অধিগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। সরকারের

গ্রিন ইকোনমিক জোনের কারণে অনেক কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে। কৃষিজমির বিনষ্ট রোধে স্পষ্ট বিধান রাখতে হবে। উন্নয়ন যেন কৃষিজমি বিনষ্ট করে না হয় সেদিকে সরকারকে আরো অধিক সচেতনতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কৃষিজমি নষ্ট করে শিল্প তৈরির অনুমতি দেয়া যাবে না এবং এক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো কঠোর হতে হবে। কারণ, বর্তমানে দেশের অনেক জায়গায় কৃষিজমিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অধিগ্রহণ করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এভাবে চলতে থাকলে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই, ভূমি অধিগ্রহণের অনুমতি প্রদানের পূর্বে আরো বেশি যাচাই-বাছাই প্রয়োজন, যাচ্ছেতাইভাবে অধিগ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

> *"আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ কম, আর কৃষিজমির পরিমাণ তো অপ্রতুল। এসত্ত্বেও, অপরিকল্পিত অধিগ্রহণের ফলে এই সীমিত পরিমাণ কৃষিজমিও অধিগৃহীত হয়ে যাচ্ছে। সরকারের গ্রিণ ইকোনমিক জোনের কারণে অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমি হারিয়ে ফেলছেন। ফোর লেন সড়ক করার ফলে অনেক কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; অথচ সরকার বারবারই বলছে, কৃষিজমি নষ্ট করা যাবে না। তাহলে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? মূলত, বাস্তবতা ও আইনের বিধানের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক ফারাক।"*
>
> *—একজন ভূমি অধিকার কর্মী, ঢাকা*

অন্যদিকে, জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনাকালে বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, নীতিমালায় উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ভূমি অধিগ্রহণ করলে তাকে বাজারদরের চেয়ে তিনগুণ বেশি দাম দেয়ার কথা তারা জানেন না। যার ফলে, আইনের এই বিধানের ব্যত্যয় ঘটার পরও এ বিষয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি। আসলে উক্ত আইনের বিধানগুলো সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে স্বার্থান্বেষী মহল। আলোচনায় অংশগহণকারীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, অন্যান্য ভূমিসংক্রান্ত আইন ও নীতিমালার মতো এই আইন সম্পর্কেও আরো বেশি প্রচার-প্রচারণা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো যেতে পারে; এছাড়াও নাটক, গান, সভা-সমাবেশের মাধ্যমেও এই আইনের বিধানগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা যায়। যখন আইন সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা থাকবে, তখন এর বাস্তবায়নের সমস্যাও একদিকে যেমন কমবে, তেমনি আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের পথও প্রশস্ত হবে বলে তারা মনে করেন।

> *"ভূমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সরকার যে রাস্তা নিয়েছে আমাদের জমির উপর দিয়ে সেটা আর পরবর্তীতে ঠিক করে দেয়নি। এর ফলে আমাদের কৃষিজমির মাটি নষ্ট হয়েছে। ওই রাস্তার জমি ঠিক করতে আমাদের প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। আমাদের এলাকার সবারই প্রায় একইরকম ক্ষতি হয়েছে।"*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ*

৫.৬ আইনের ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭' বাস্তবায়নের অগুনতি সমস্যার মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটা তুলে ধরা অত্যন্ত দুরূহ কাজ: কেননা, এক একটি ঘটনার প্রেক্ষিত, কার্যকারণ, বিস্তার, মাত্রা এক এক রকম। তারপরও, অধিগ্রহণসংক্রান্ত আইনটি বাস্তবায়ন করতে যে ধরনের সমস্যাগুলো প্রায়শই ঘটে থাকে সেই বিষয়গুলো পরিষ্কার করবার জন্য কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, মুদ্রার দুই পিঠের মতো, আইন বাস্তবায়নে জমি অধিগ্রহণের 'চাহিদা' (এক্ষেত্রে, প্রশাসন) এবং 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)– দুই দিকই সমস্যা তৈরি করে থাকে। নিচের প্রথম দুটি উদাহরণ 'চাহিদা' (এক্ষেত্রে, প্রশাসন)-এর দিক থেকে তৈরি সমস্যা তুলে ধরবে, আর তৃতীয় উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)-এর দিক থেকে তৈরি সমস্যা। যদিও, তৃতীয় উদাহরণে এটিও পরিষ্কার হবে যে 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)-এর দিক থেকে তৈরি সমস্যায়, ইন্ধন থাকে 'চাহিদা' (এক্ষেত্রে, প্রশাসন)-এর দিকেরও– দুই পক্ষের এই আঁতাত ছাড়া শুধু 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)-এর দিকের পক্ষে আইন বাস্তবায়নে সমস্যা হওয়া প্রায় অসম্ভব।

যদিও, 'চাহিদা' (এক্ষেত্রে, প্রশাসন)-এর দিকের সমস্যাই প্রকট, তারপরও 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)-এর দিক থেকেও যে সমস্যা তৈরি হয় না তা নয়। তবে একই সাথে এটিও মনে রাখা চাই যে, 'যোগান' (এখানে, জমির মালিক)-এর দিক থেকে আইনের বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরি করতে পারেন তারাই, যাদের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ়। প্রান্তিক-দরিদ্র মানুষের সমস্যা তৈরি করবার মতো ক্ষমতা কোথায়? ভোগান্তির শিকার হওয়া ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের কিছুই করবার থাকে না।

দুর্ভোগের চার দশক

চার দশকেরও বেশি সময় আগে সরকার গাইবান্ধার দহতখালী থেকে ফুলছড়িঘাট পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করার জন্য স্থানীয়দের কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে ৩০০ (তিনশত) একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে, অধিগ্রহণকৃত জমির ধার্য্য মূল্যের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া হলেও বাকি টাকা পরিশোধ করা নিয়ে শুরু হয় নানা তালবাহানা। এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও জমির মালিকেরা পাওনা টাকা না পেয়ে স্থানীয় ভূমি অফিসে যোগাযোগ করলে ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের বিভিন্ন রকম ভয়ভীতি দেখান ও হয়রানি করেন। পরবর্তীতে, ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের পাওনা টাকা পাইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন প্রতারক জমির দালাল 'ল্যান্ড একুইজিশন' শাখার কতিপয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশ করে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে সই নিয়ে প্রায় ৪৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। ঘটনাটি বুঝতে পেরে ক্ষতিগ্রস্তরা এ বিষয়ে নানা প্রতিবাদ, আন্দোলন করেন। এমনকি পাওনা টাকা পেতে তারা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মামলাও করেন। কিন্তু, এত কিছুর পরও তারা ইতিবাচক

কোনো ফলাফল পাননি। তন্মধ্যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যদিও বা তাদেরকে অধিগ্রহণকৃত জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু, এখনো অবধি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণের অর্থ পাননি। অধিগ্রহণের পূর্বেই পুরো ক্ষতিপূরণের অর্থ জমির মালিকদের দেয়ার বিধান থাকলেও আজ ৪০ বছর পার হয়ে গেলেও ভোগান্তির অবসান ঘটছে না ক্ষতিগ্রস্তদের।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৭৯ সালে, যখন সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য দহতখালী, ফুলছড়িঘাট ও দীঘলকান্দী (বোনারপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা) এলাকায় অস্থায়ীভাবে জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গবেষকদলের মাঠগবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৩০০ (তিনশত) একরের বেশি। অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য, দহতখালী থেকে ফুলছড়িঘাট পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করা, যাতে মালামাল সহজেই আনা-নেয়া সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে অধিগ্রহণকৃত জমির বাজারমূল্য অনুযায়ী বিঘা প্রতি ২০ হাজার থেকে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা করে প্রত্যেক জমির মালিকদের কিছু টাকা দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, বাকি টাকা অধিগ্রহণের পর দেয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীতে অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও অধিগ্রহণকৃত জমির পাওনা বাকি টাকা পাওয়ার কোনো লক্ষণই ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা অফিসে যোগাযোগ করতে থাকে, যাতে তারা পাওনা টাকা পায়। তাদের পাওনা টাকা পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো তাদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকিধমকি দিয়ে হয়রানি করা হয়।

১৯৯৪ সালের দিকে ওই এলাকার একজন জমির দালাল অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অধিগ্রহণের বাকি টাকা পাইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর ওই দালাল 'ল্যান্ড একুইজিশন' (এলএ) শাখার কিছু অফিসারের সাথে যোগসাজশ করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছ থেকে চেকে সই নিয়ে প্রায় ৪৫ লাখ টাকা সরিয়ে নেয়। যখন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা তাদের টাকা আত্মসাতের খবর জানতে পান, তখন তারা একত্রিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাঘাটার প্রায় ৭ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসহ গাইবান্ধার ডিসি অফিস ঘেরাও করেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও ডিসি অফিসে ভাংচুর করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক তাদের ক্ষতিপূরণের বাকি টাকা দেয়ার আশ্বাস দিলে তারা সেখান থেকে চলে যান; পরবর্তীতে, টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এলএ শাখার কয়েকজন কর্মচারীকে বরখাস্তও করা হয়। এরপর কয়েকবছর পার হলেও ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া না হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। কিন্তু, মামলায় তারা হেরে যান। এর ফলে বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পাওনা টাকা আদায়ের আন্দোলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং তারা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও করেননি। এর বড় কারণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা বেশির ভাগই ছিলেন দরিদ্র। তবে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের এখনো কিছু লোক অধিগ্রহণের টাকা পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন এবং বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করছেন। যদিও সরকার ওইসব জমি অস্থায়ী অধিগ্রহণ করেছিল, যা পরবর্তীতে

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ফেরত দেয়। কিন্তু, তাদের পাওনা এখনো ফেরত দেয়া হয়নি। এখনো অনেকে ওই পাওনা টাকা পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন।

ওই অধিগ্রহণে আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা হচ্ছে অধিগ্রহণের পুরো টাকা না পাওয়া বা ক্ষতিপূরণ না পাওয়া। 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২'-এর ৮ ও ১০ নং ধারায় জমি দখলে পাওয়ার আগে জেলা প্রশাসক ওই জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। কিন্তু, ওই অধ্যাদেশে জমি অধিগ্রহণের কতদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা নাই। ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষরা ইচ্ছে করলেই তাদের ক্ষতিপূরণ চাইতে আদালতে যেতে পারছে না বা এর কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই।

তবে নতুন আইন 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭'[৫৬] এর ৯ ও ১১ নং ধারায় কতদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করবেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ওই ধারা দুটিতে বলা হয়েছে, সরকারি কোনো প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাজারদরের ওপর অতিরিক্ত শতকরা ২০০ (দুইশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে, বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ওই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে বাজারদরের অতিরিক্ত শতকরা ৩০০ (তিনশত) ভাগ।

অন্যদিকে, রোয়েদাদ বা ক্ষতিপূরণ প্রস্তুতের পর, দখল গ্রহণের পূর্বে, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলিত অর্থ জমা দেয়ার অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক ওই ক্ষতিপূরণের অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

এই আইনের অধীন ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদার ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এবং জেলা প্রশাসক তার কাছ থেকে ওই অর্থ আদায় করে বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। আইনের এই ধারা পর্যালোচনা করে বলা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষদের টাকা দালাল ও সংশ্লিষ্ট এলএ কর্মকর্তা আত্মসাৎ করেছে সেটি অবৈধ; জেলা প্রশাসককে ওই অর্থ উদ্ধার করে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তা ফেরত দিতে হবে; এবং জমি অধিগ্রহণের ৬০ (ষাট) কার্যদিবসে জেলা প্রশাসককে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু, উল্লিখিত অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করেননি। এখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্তপক্ষদের দাবি—নতুন আইন ২০১৭ বাস্তবায়িত হলে ক্ষতিপূরণের বাকি টাকা সরকারের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হবে।

---

[৫৬] স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২ বাতিল করে নতুন আইন 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭' কার্যকর করা হয়েছে।

ফলপ্রসূ আলোচনা ছাড়াই নোটিশ জারি

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রচলিত আইনের বিধি অনুসারে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি দখলে নিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে, 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-তে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, সরকার কোনো এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় ওই এলাকার ভূমির ১২ (বার) মাসের গড় মূল্য বিবেচনায় নিয়ে জমির মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যের সাথে আরও অতিরিক্ত ২০০ (দুইশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ পাবেন জমির প্রকৃত মালিক। আর, অধিগ্রহণের পূর্বেই ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের সময় সব ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়না। সেরকম একটি ঘটনার প্রমাণ মিলেছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মেট্রোরেল প্রকল্পের ডিপো বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সময়। সেখানকার ক্ষতিগ্রস্তরা দাবি করেছেন, ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কালে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জমির মালিকদের প্রারম্ভিক আলাপচারিতা হলেও জমির চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ না করেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের কাছে অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা এখন শঙ্কায় আছেন যে ন্যায্য পাওনা না দিয়েই হয়তো তাদের উচ্ছেদ করা হবে। যদিও জেলা প্রশাসক থেকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, কারো প্রতি অন্যায় করা হবে না এবং ন্যায্য পাওনা পরিশোধ ব্যতিরেকে কারো ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে না; তথাপি, পূর্ব অভিজ্ঞতায় এ-সংক্রান্ত নানা অনিয়ম ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকেরা দেখেছেন বিধায় নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মেট্রোরেল প্রকল্পের ডিপো বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে সম্প্রতি বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে। সংবাদমাধ্যমে ("রূপগঞ্জে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ", ২০২০) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অধিগ্রহণের নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। জমির মালিকেরা সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছেন, তাদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সমঝোতা ছাড়াই নিয়মবহির্ভূতভাবে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চলছে। মেট্রোরেল প্রকল্পের ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-১ বাস্তবায়নের জন্য রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজার প্রায় ৯৬ একর জমি নির্ধারণ করে নকশা চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রশাসনের সাথে জমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ, সীমানা এবং এ-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা হলেও, জমির মূল্য তথা ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। অথচ, অভিযোগটি এমন যে, জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা ছাড়াই জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণের নোটিশ পাঠিয়েছে, যা প্রকারান্তরে নামমাত্র মূল্যে জমি অধিগ্রহণ করে ওখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের চেষ্টা বলা চলে।

জেলা প্রশাসক যদিও এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেন কোনো জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হন তা নিশ্চিত করা হবে; কিন্তু, এলাকাবাসী পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে শংকায় রয়েছেন। পূর্বাচল নতুন শহর বাস্তবায়নের সময় ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না দিয়েই অধিকাংশ পরিবারকে ভিটেছাড়া করা হয় বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। এলাকাবাসীর কেউ কেউ বর্তমান অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু না হলে প্রয়োজনে আন্দোলনে যাবেন বলেও জানিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি মানববন্ধনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল, যদিও প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় সেটা করা যায়নি।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৮ এবং ৯ ধারা অনুযায়ী রোয়েদাদ প্রস্তুত করা এবং ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচ্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে নির্দেশনা রয়েছে। জমির ওপরকার আবাসস্থল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, এবং অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপার্জনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিপূরণ বা জমির মূল্য নির্ধারণের কথা। কিন্তু, এলাকাবাসীর অভিযোগ এক্ষেত্রে এসব মোটেও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না।

এছাড়াও, আইনের ৯ নং ধারার 'ক' উপধারা অনুযায়ী জমির বাজারমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওই সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাজনক স্থাবর সম্পত্তির নোটিশ জারি পূর্বের ১২ মাসের গড় মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়। অথচ, যত সময় পার হচ্ছে, যত দীর্ঘসূত্রী হচ্ছে প্রক্রিয়া, ততই এই মূল্যের অবমূল্যায়ন ঘটছে। আগেই অভিযোগ ছিল, জমির মূল্য বেশ অবমূল্যায়িত করে দেখানো হয়েছিল, এখন সময়ের সাথে সাথে ওই জমির মূল্য বাড়ছে বটে; কিন্তু, অধিগ্রহণ হয়ে গেলে জমির মালিকেরা ওই মূল্য বৃদ্ধির কোনো সুফলই পাবেন না।

অন্যদিকে, আইনের ১১ এবং ১৩ নং ধারায় শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাই বলা হয়েছে; অন্যান্য অআর্থিক ক্ষতি, যেমন– পুনর্বন্দোবস্ত, পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদির কোনোই উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ওখানকার জমির মালিকদের ক্ষতির বিপরীতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

খুলনা-মোংলা রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণে অনিয়ম

খুলনা-মোংলা নির্মাণাধীন রেললাইন প্রকল্পে নানামুখী দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ইতিমধ্যেই তিন দফা বাড়ানো হয়েছে প্রকল্পের মেয়াদ ও কাজের ব্যয়। একই সাথে, প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি। জমির প্রকৃত মালিকেরা অভিযোগ করেছেন যে, বাস্তবে যারা অধিগ্রহণের টাকা পেয়েছেন তাদের বেশির ভাগই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নন। আবার, অধিগ্রহণকৃত কিছু জমির মালিক ভূমি অফিস ও স্থানীয় প্রশাসনের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে অধিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত জমিতে নতুন করে ভবন নির্মাণ করেছে; কেউ কেউ আবার বিরান জমি রাতারাতি বালু ফেলে ও গাছ রোপণ করে

বাস্তুভিটা তৈরি করেছে। এর ফলে, জমির ক্ষতিপূরণ যা হবার কথা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি তারা আদায় করেছে এবং পরবর্তীতে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করেছে এসব অর্থ। এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয়দের প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত জমি, ঘরবাড়ি ও গাছপালার ক্ষতিপূরণে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে ভূমি অফিসের তিন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। তবে, এই প্রকল্পে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তার জন্য কি শুধু ওই তিনজন কর্মকর্তাই দায়ী ছিলেন, নাকি তারা ছিলেন বড় কোনো অসাধু তৎপরতার একটি অংশ—পরবর্তী অনিয়ম রোধে তা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক।

দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে সরকার ২০১০ সালের ডিসেম্বরে খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন প্রকল্পটি অনুমোদনের পরে, ৬৪.৭৫ কিলোমিটার রেললাইনটি ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটির কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল বলে জানা গেছে। খুলনা-মোংলা নির্মাণাধীন রেললাইন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৮০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রেললাইনে ব্যয় হবে ১ হাজার ১৪৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা, ব্রিজের জন্য ১ হাজার ৭৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ও জমি অধিগ্রহণে ১ হাজার ৮ কোটি টাকা। জমি অধিগ্রহণ এবং ডিজাইনের পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে এখনো জটিলতা রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির বেশ কয়েকটি সময়সীমা পেরিয়েছে এবং প্রকল্প ব্যয় মূল অনুমানের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ওই প্রকল্পে স্পষ্ট। অন্যদিকে, বাংলাদেশ সরকার খুলনা-মোংলা রেলপথ প্রকল্পের জন্য, খুলনায় ৪০০ একর, বাগেরহাটে ২৭৮ একর এবং মোংলায় ৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছে।

রেলপথ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। এখন রেললাইন স্থাপনের আগে একমাত্র যে বিষয়টি অবশিষ্ট ছিল তা হলো অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া। তবে, ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির আশায় অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলগুলোতে ওইসব জমি মালিকেরা নতুন ভবন নির্মাণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও ওইসব নতুন ঘর ও পাকা ভবনে কেউ বাস করে না, তথাপি খুলনার ফুলতলা রেল স্টেশন, দামোদর, মশিয়ালি, আত্রা, শিরোমনি এর কাছাকাছি অধিগৃহীত অঞ্চলে ঘর ও পাকা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে; এছাড়াও, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বিল ডাকাতিয়া, বিল পাবলা, লোটা, খামারবাড়িসহ অন্যান্য অধিগৃহীত স্থানেও ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। খালি জলাশয়গুলোতেও নির্মিত হচ্ছে কংক্রিটের কাঠামো (Dhaka Tribiune, 2015)।

গবেষকদলের মাঠগবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, দুর্নীতিগ্রস্ত স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীদের সহায়তায় রেল প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ আকারে অতিরিক্ত নগদ অর্জনের জন্য ভূমি মালিকেরা ওই কৌশলটি অবলম্বন করেছেন। খুলনা জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক অধিগৃহীত ফুলতলা রেল স্টেশনসহ কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। জেলা

প্রশাসন অফিস জানিয়েছেন যে, প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলগুলোতে অতিরিক্ত বাড়ি বানানো হচ্ছে এমন ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, খুলনা-মোংলা নির্মাণাধীন রেললাইন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত ভূমি, ঘরবাড়ি ও গাছপালার ক্ষতিপূরণে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের এলএ শাখার তিন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের কাছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. মাকছুদুর রহমানের স্বাক্ষরিত পাঠানো চিঠি থেকে এই তথ্য জানা গেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, খুলনা-মোংলা নির্মাণাধীন রেললাইন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ওই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ঘুষ গ্রহণের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেয়া, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দেয়া, অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত নয় এমন ভূমি এবং ভুয়া ভূমি মালিক সাজিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া, একই দাগের ভূমির ক্ষতিপূরণ একাধিকবার দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। তারা এই প্রকল্পে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন, এতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ১২ অনুযায়ী ওই তিন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে (Dhaka Tribiune, 2015)।

উল্লিখিত বিতর্কিত অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদিও অধিগ্রহণে দুর্নীতির ঘটনায় ভূমি মন্ত্রণালয় এলএ শাখার তিন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে এবং জেলা প্রশাসকদের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এখানে কিন্তু ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭’-এর ব্যত্যয় ঘটেছে; এবং এখানে আইনের প্রকৃত বাস্তবায়ন হয়নি। আইনের ১০নং ধারায় বলা হয়েছে যে, (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যেসব বিষয় বিবেচ্য নয়) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণযোগ্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় জেলা প্রশাসক যে বিষয় বিবেচনা করবেন না, তা হলো—নোটিশ জারির পর ব্যবহারের ফলে অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির কোনো ক্ষতি; নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের সুবিধার জন্য মূল্য বৃদ্ধি; অথবা, নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির কোনো রকম পরিবর্তন, উন্নয়ন বা বিক্রয়। ধারা ১৫ (২)-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ কি না সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হলে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ধারা ১৮-তে বলা হয়েছে, এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে অথবা প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলে উক্ত অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে। ধারা ৪১-এ বলা হয়েছে যে, জেলা প্রশাসক, কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের অথবা অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীন

অধিগ্রহণকৃত বা হুকুমদখলকৃত অথবা অধিগ্রহণের বা হুকুমদখলের উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তিসংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নির্দিষ্ট কোনো কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে দেয়ার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারবেন। ধারা ১৪ (২) অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার পূর্বে যেকোনো সময়, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে, যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের সব কার্যক্রম বাতিল করতে পারবেন।

উল্লিখিত ধারাগুলো থেকে এটি স্পষ্ট যে, খুলনা-মোংলা রেলওয়ে প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণে দুর্নীতি হয়েছে। এলএ শাখার কর্মকর্তাদের যোগসাজশে স্থানীয় দালালরা বেশি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় অধিগ্রহণকৃত জমিতে দালানকোঠা তৈরি করে এবং এভাবে কিছু জমির মালিক অবৈধভাবে ঘুষ দিয়ে ক্ষতিপূরণ পায়। এ পরিস্থিতিতে, ২০১৭ সালের আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক চাইলে বিষয়টির তদন্ত করাতে পারেন; কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে অথবা প্রকৃত মালিক ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে ওই অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধার করতে পারেন; অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হলে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার পূর্বে যেকোনো সময় যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করতে পারেন।

৫.৭ আইন এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দঃ স্কোরিং

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-কে ৪টি নির্দেশকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্কোরিং করা হয়েছে। এই ৪টি নির্দেশক হলো—(১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব। প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই '০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছেঃ যেখানে '০' নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, অন্যদিকে '৫' স্কোর মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। সবশেষে, এই ৪টি নির্দেশকের প্রতিটি স্কোরের একটি গড়ও করা হয়েছে।

এই ৪টি নির্দেশকের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশকে (স্কোরঃ ১.৯)। তারপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা/ অসামর্থ্য'– এই নির্দেশকটি (স্কোরঃ ২.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোরঃ ৩.৭) এবং 'অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা' (স্কোরঃ ৩.২)-এ দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ১৭-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই আইনের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৮।

লেখচিত্র ১৭: স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৮

অন্যদিকে, এই আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশকের মাধ্যমে: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। আগের মতোই '০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে, এবং সবশেষে করা হয়েছে একটি গড়। '০' অর্থ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, '৫' নির্দেশ করেছে সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০০৭'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে 'রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' এবং 'সমন্বয়হীনতা' এই দুটি নির্দেশক, দুটির স্কোরই ০.৬। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর ০.৮) এবং 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর ০.৭)-এ দুটি নির্দেশক। বাকি ১২টি নির্দেশকের অবস্থাও মোটেও ভালো নয়: 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন দপ্তর', এবং 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি'- এই তিনটি নির্দেশকেরই স্কোর ১.১। 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব' এই নির্দেশকটির স্কোর ০.৯। আইন বাস্তবায়নের গড় স্কোর মাত্র ০.৮, অর্থাৎ, অতি মন্দ অবস্থা। লেখচিত্র ১৮-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১৮: স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫= সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

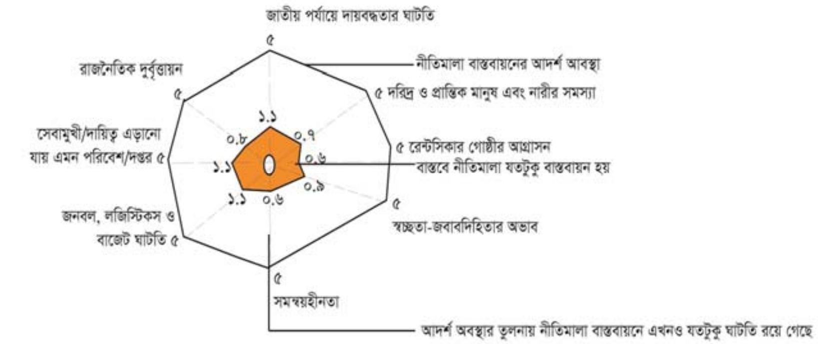

আইন এবং আইন বাস্তবায়নের সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে আইনের তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (আইনের সমস্যার গড় স্কোর: ২.৮, এবং আইন বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ০.৮)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, আইনের সমস্যার স্কোর ২.৮ (৫৬% অর্জন) এবং আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ০.৮ (মাত্র ১৬% অর্জন) (লেখচিত্র-১৯)।

লেখচিত্র ১৯: 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭': আইন এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

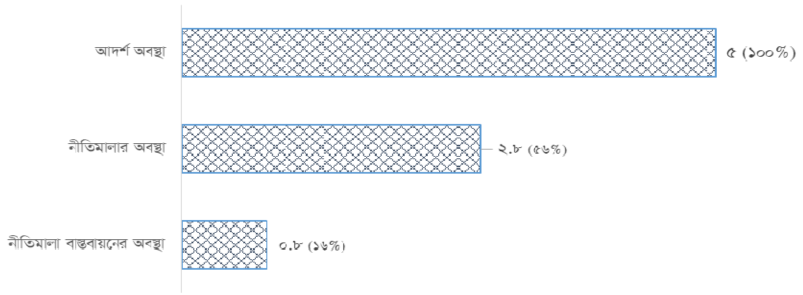

৫.৮ সুপারিশমালা

আইনসংশ্লিষ্ট

আইনে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের কোনো সংজ্ঞা নেই, নেই এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা। ফলে, আইনের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের সুযোগ রয়ে গেছে। এজন্য, কিছু সহজবোধ্য ও দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞায়ন অতি জরুরি। এই শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ', 'সরল বিশ্বাস'। এগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই আইনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

১) অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল বিষয়টির অধিকারভিত্তিক বাস্তবায়ন করতে চাইলে এই আইনে কিছু বিষয় এবং শব্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাসহ ক্ষেত্রবিশেষে ধারা/উপধারা সংযোজন/সংশোধন করা প্রয়োজন। বিশেষত, প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য অংশ নিশ্চিতকল্পে 'পুনর্বন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব'— এই শব্দগুচ্ছের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার দরকার।

২) স্থাবর সম্পত্তি নামে 'স্থাবর' হলেও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে নানান 'অস্থাবর' বিষয়াদিও; বিশেষত, নানান 'অ-আর্থিক' বিষয়াদি (কমপক্ষে, অর্থমূল্য নিরূপণ দুরূহ অর্থে) এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণের শুধু স্থাবর সম্পত্তিই মূল বিবেচনায় আসে। কিন্তু 'আর্থসামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়' ইত্যাদি বিষয়গুলো এই আইনে বলা নেই। এ-সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন– 'পুনর্বন্দোবস্ত', 'পুনর্বাসন প্রকল্প' নিয়ে নেই কোনো আইনি নির্দেশনা, যা বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র মানুষকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অধিকার-ভিত্তিক আইনি নির্দেশনা আইনে সংযুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৩) ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বর্তমান প্রক্রিয়াটির সংস্কার প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, এবং এ-সংক্রান্ত চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় অহরহ। বিশেষ করে, জমির বাজারমূল্য নির্ধারণে অবমূল্যায়ন তো হয়ই, তার ওপর দীর্ঘসূত্রতার কারণে সেই মূল্যের 'প্রকৃত' মান আরও অনেক কমে যায়। জমির শ্রেণি, জমি থেকে প্রাপ্ত আয়, জমির বিপরীতে দেয়া কর ইত্যাদি বিষয় যেন ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, সে জন্য চাই আইনি নির্দেশনা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারীপ্রধান খানা, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন বিশেষ বিবেচনা, নির্দেশনা।

৪) হুকুমদখলসংক্রান্ত বিষয়ে সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নোটিশ দেয়ার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন করতে পারেন—এরপরে আবেদন করা হলেও তা বিবেচিত হবে না। প্রকারান্তরে, এটি ন্যায়বিচার নীতির লঙ্ঘন। অন্যদিকে, সংশোধনবিষয়ক সিদ্ধান্তটি কত কার্যদিবসের মধ্যে সমাধা করতে হবে সে বিষয়ে নেই কোনো নির্দেশনা। এটি নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

৫) ২০১৭ সালের বর্তমান আইনের বিধিমালা এখনো প্রস্তুত হয়নি। বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের শুধু ৪ থেকে ১১ নং ধারা প্রয়োগের জন্য সরকার ২০১৭ সালের শেষ দিকে একগুচ্ছ নির্দেশাবলী ঘোষণা করে। এই খণ্ডিত নির্দেশনাবলী কোনোভাবেই বিধিমালার পরিপূরক নয়। এই আইনের বিধানাবলীর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন অতি জরুরি।

বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট

১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আইনি নির্দেশনা থাকলেও, বাস্তবে এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত নানান অসংগতির কারণে অনেকেই সময়মতো অধিগ্রহণ কিংবা হুকুমদখলসংক্রান্ত নোটিশ পান না; এতে তারা সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হন। বিশেষত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নোটিশ দেয়ার ক্ষেত্রে অনীহা-অনিচ্ছা প্রবল। এ পরিপ্রেক্ষিতে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আইনি নির্দেশনা প্রয়োজন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও ব্যবহার করা চাই নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পেও প্রয়োজন আইনি নির্দেশনা।

২) ক্ষতিপূরণ এবং পুরো প্রক্রিয়াসংশ্লিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ বিস্তর। ভূমি অফিসে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ সীমাহীন। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে বিলম্ব হয়—দরিদ্রদের ঘুরতে হয় অনেক, পড়তে হয় সীমাহীন ভোগান্তিতে। প্রশাসনের একেবারে জ্ঞাতসারেই, অনেক সময়ই সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায়, গড়ে উঠেছে দালাল-প্রতারক চক্র। এ অবস্থা রোধে চাই ভূমি অধিকার বিষয়ে সংগঠন এবং স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠনের সমন্বিত নিয়মিত তদারকি, প্রতিবাদ।

৩) জেলা প্রশাসক, হুকুমদখলকালীন সময়ে, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থের অনূর্ধ্ব এক-ষষ্ঠাংশ অর্থ ব্যয় করে এই সংস্কার করা যাবে; এর বেশি বরাদ্দের সুযোগ নেই।

এক্ষেত্রে নেই কোনো 'অ্যাসেসমেন্ট' বা 'নিরীক্ষণ' এর সুযোগ, যা থাকলে বিষয়টি আরো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারতো। এ ছাড়াও, হুকুমদখলকৃত জমিতে হুকুমদখলের সময়ে যেটুকু ক্ষতিসাধন হয়েছে তার বিপরীতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই; সেটিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪) ২০১৭ সালের আগে অধিগ্রহণ কিংবা হুকুমদখলকৃত জমির বিষয়ে কোনো মামলা ওই সময়কালে হয়ে থাকলে, তা ২০১৭-এর আইন নয়, বরং ১৯৮২-এর আইনের বিধিবিধান অনুযায়ীই সমাধান হবে। অর্থাৎ, পূর্বের আইনের সমস্যাগুলো নিয়েই ওই মামলা চলমান রয়েছে। এ জন্য, ওই মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনাসহ নির্দেশনা প্রয়োজন।

অধ্যায় ৬

ভূমি ব্যবহার

সারকথা: কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষিজমি সুরক্ষার পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন নেই; শুধু আছে একটি ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, যা নির্বাহী কোনো আইন নয়, নেই বাস্তবায়নের বাধ্যতামূলক বিধান। ভূমি ব্যবহারসম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনটি হলো—জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১। ওই নীতিমালার পরিবর্তে সরকার নতুন যে 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি আইন-২০১৬' প্রণয়নের চিন্তাভাবনা করেছে তাও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো আইন নয়, খসড়া মাত্র।

ভূমি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার জন্য একটি জোনিং আইন প্রণয়ন করা উচিত। কিন্তু ২০০১ সালের নীতিতে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। জাতীয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটিতে ভুক্তভোগীদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও নারীদের, নেই কোনো প্রতিনিধিত্ব। কোনো ধরনের আইনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমির অধিকার রক্ষা বা সংরক্ষণ করা হবে, বলা নেই এই নীতিতে। নীতিমালা অনুযায়ী জমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না; অথচ, এই বিধান কেউ লঙ্ঘন করলে সেই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কিংবা সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বলা হয়নি শাস্তির কথা। 'ভূমি ডেটাব্যাংক' এবং 'সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ' কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা বলা হয়নি। অধিগ্রহণকৃত অনেক ভূমি অব্যবহৃত থেকে যায়, ওই জমি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত নীতিতে নেই। নীতিমালায় ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়টি অনুপস্থিত। ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয়, সংস্থা ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জরুরি; কিন্তু, বিদ্যমান নীতিতে এ ধরনের কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির কর্মপরিধি।

এ দেশে যে যার মতো জমি ব্যবহার করছে। কমছে কৃষিজমি, বাড়ছে ভূমিহীন কৃষক। কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে, কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন প্রান্তিক চাষি। জমির শ্রেণিকরণ নেই বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না কৃষি ও শিল্পের জমি। কৃষিজমিতে স্থাপিত শিল্পকারখানা নষ্ট করছে কৃষি পরিবেশ। নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা ভরাট করে কৃষিজমির স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। বিগত দুই যুগে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির বেশির ভাগ উদ্দেশ্যই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হয়নি। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নঘনিষ্ঠ উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে আংশিক অর্জনও ঘটেনি। কৃষিজমি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারিত হচ্ছে, বাজার গ্রাস করছে ফসলী জমি, কলকারখানা বসছে

মালিকের বসতবাটির নিকটবর্তী স্থানে। এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করার সুপারিশ ছিল ভূমি ব্যবহার নীতিতে। কিন্তু, প্রবর্তিত হয়নি এ আইন। নির্দেশনা রয়েছে, 'সুউচ্চ ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অকৃষি খাতের ভূমি ব্যবহার করা', 'অব্যবহৃত অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির জন্য পদক্ষেপ নেয়া', এবং 'উর্বর জমি যেখানে দুই বা তার বেশি ফসল উৎপন্ন হয় সেটি বেসরকারি ভবন নির্মাণ, আবাসন এবং ইটের ভাটা নির্মাণের মতো অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা'। বাস্তবে, এগুলোর লঙ্ঘন খুবই বেশি। গ্রামীণ জনপদগুলোতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে; যা কেবল গালভরা বুলি হয়েই আছে। বনায়ন প্রসারণের কথা থাকলেও বাস্তবায়ন তেমনটি নয়। উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করা হয়নি: যে কারণে উপকূলীয় এলাকার ভূমি যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওই উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র অসহায় মানুষ। চর এলাকায় দিয়ারা জরিপ হচ্ছে না, তাই তা খাসজমি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাচ্ছে না।

নীতি এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নীতিমালার তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতিমালার সমস্যার গড় স্কোর: ২.৩, এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ০.৮)। আদর্শ স্কোর যদি '৫' হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতির সমস্যার স্কোর ২.৩ (৪৬% অর্জন) এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ০.৮ (মাত্র ১৬% অর্জন)।

ভূমি ব্যবহার বিষয়ে চাই পূর্ণাঙ্গ একটি আইন। ভূমি ব্যবহার বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এবং অধিদপ্তর-এর মধ্যকার সুসমন্বয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কাঠামো, পদ্ধতি, এবং কর্মবন্টন। টেকসই উন্নয়নবিরোধী পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের মতো ত্রুটিপূর্ণ চাষাবাদ প্রবণতা রোধে প্রয়োজন শক্ত নজরদারি। যে উদ্দেশে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার সঠিক এবং সময়নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবার জন্য সামাজিক নজরদারি জরুরি। অধিগৃহীত জমির অব্যবহৃত/অবৈধ দখলের/অপব্যবহৃত অংশ পুনুরুদ্ধার করা প্রয়োজন। চর এলাকায় দিয়ারা জরিপ পরিচালিত হওয়া জরুরি। প্রয়োজন উপকূলীয় অঞ্চল চিহ্নিতকরণে। পরিবেশ সুরক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয়পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে দরিদ্র ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট কাঠামো। এছাড়াও, এই কমিটির নিয়মিত ও সক্রিয় কার্যক্রম এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য নাগরিক তদারকির প্রয়োজন।

৬.১ ভূমিকা

ভূমি ব্যবহার (land use) ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত মানবীয় কর্মকাণ্ড। ভূমির সম্পদ ব্যবহার এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া ভূমি ব্যবহারের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভূমি আচ্ছাদন (land cover) ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ কর্তৃক ভূমির ব্যবহার ধরন (pattern) হচ্ছে ভূমি ব্যবহার। মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক ভূমি আচ্ছাদনকে নিজের ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলছে। এর মধ্যে এককভাবে ভূমির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে কৃষি ভূমির ব্যবহার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি; আর কৃষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার।

বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ হেক্টর, এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি মাত্র ৮০ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর (মোট ভূমির প্রায় ৫৫.৩৮%)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পোন্নয়নের ফলে এ দেশের কৃষি ভূমি প্রতিনিয়ত কমছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮১,৭৮,১৩৮ হেক্টর, যা ১৯৯৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০,৮৫,০২০ হেক্টরে। প্রতি বছর নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে প্রায় এক হাজার হেক্টর জমি, এছাড়া, বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাড়ছে আবাসন খাতে কৃষি জমির ব্যবহার। বছরে শুধু নতুন ঘরবাড়ি নির্মিত হচ্ছে প্রায় ৭১২ হেক্টর জমিতে। নির্মাণ কাজে প্রতিবছর ৩ হাজার হেক্টর জমি চিরস্থায়ীভাবে কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন গড়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের ২৬৮ হেক্টর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে এখনো অব্যাহত (Barkat, Suhrawardy & Osman, 2015)। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, বাণিজ্যিক কারণেও প্রতিদিন গড়ে ২৮০ হেক্টর কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাশয় ভরাটের কারণে প্রতিদিন কৃষিজমি কমছে ৯৬ বিঘা। তামাক চাষের কারণে প্রতিদিন ৯ হাজার একর কৃষিজমি উর্বরতা হারাচ্ছে। কৃষিজমির ক্রমহ্রাসমান এ ধারা বর্তমানে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়ায় প্রতিবছর ৪০ হাজারের বেশি প্রান্তিক চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন (Barkat, Suhrawardy & Ghosh, 2011)। এভাবে কৃষিজমি কমতে থাকলে ভবিষ্যতে দেশে একদিকে যেমন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়বে, একই সাথে শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতে গ্রামের মানুষের সংখ্যা বেড়ে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা বাড়বে। ফলে, খাদ্য উৎপাদনসহ জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই আবহমানকালের সুজলা–সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার চিরচেনা সেইরূপ আজ প্রায় বিলুপ্তের পথে (Barkat et al., 2014)।

ভূমি ব্যবহারসম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনটি হলো– জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি জমি সুরক্ষার কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন নেই ভাবতেই অবাক লাগে, আছে শুধু একটি ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, যা পুরোপুরি কার্যকর নয়, কারণ এটি একটি নির্দেশনা মাত্র, পূর্ণাঙ্গ আইন নয়। ফলে, যে যার মতো করে কৃষিজমিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। জমির শ্রেণিকরণ নেই বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না কৃষি ও শিল্পের জমি। জমির সিএস, আরএস এবং বিএস-এ কোথাও উল্লেখ নেই যে জমিটি কৃষিজমি না অন্য কোনো জমি। জমির ধরনে যেটা উল্লেখ থাকে সেটি হলো নামা, বিল, উঁচু বা কান্দা, বাড়ি ইত্যাদি। জমির সর্বশেষ যে মাঠ পর্চাটি বাংলাদেশ সরকার তৈরি করেছে, যেটি বিএস (BS Khatian)[৫৭] নামে পরিচিত, সেখানেও জমিকে 'বন্ধুরতা'[৫৮] অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, 'উপযোগিতা'[৫৯] বিবেচনা করে নয়। এতে কোম্পানির একজন মালিককে কৃষিজমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এসব কোম্পানি কৃষিজমিতে শিল্পকারখানা স্থাপন করে বিশাল অঞ্চল জুড়ে কৃষি পরিবেশ নষ্ট করছে। রাসায়নিক দূষণের ফলে শিল্প-কারখানার আশেপাশের কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা স্থায়ীভাবে কমছে। রাতারাতি নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা ভরাট করে কৃষি জমির স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে।

৬.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

কৃষিজমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার ভূমি ব্যবহারসম্পর্কিত প্রচলিত কয়েকটি আইন ও নীতি বিশ্লেষণ করে ২০০১ সালে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি' প্রণয়ন করে, এ ছিল সরকারের কৃষি ভূমি রক্ষায় একটি যুগান্তকারী প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুগান্তকারী এই অর্থে যে, স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে এ ধরনের নীতি এটিই প্রথম। তবে তার অর্থ এই নয় যে, ২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতির বিষয়গুলো পূর্বতন ভূমি সংক্রান্ত আইন এবং নীতিমালায় উপেক্ষিত ছিল। বরং, বিপরীতটাই সত্য। ভূমি ব্যবহার নীতির বিষয়গুলো

---

[৫৭] বিএস জরিপ হলো মূলত বাংলাদেশ সার্ভে-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী এই জরিপকার্য পরিচালিত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সাল হতে বর্তমানে চলমান জরিপকে বিএস খতিয়ান বলা হয়। যা এখনো সারা দেশে চলমান। আরএস বা রিভিশনাল জরিপের পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সাল থেকে এ জরিপের উদ্যোগ নেয়। এযাবৎকালে এটিই হলো আধুনিক ও সর্বশেষ বিজ্ঞানসম্মত জরিপ।

[৫৮] 'বন্ধুরতা' বলতে এখানে ভূমি বা জমির বন্ধুরতাকে বোঝানো হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ হলো— কোথায় উঁচু কোথায় নিচু জমি, যেখানে ফসল ফলানো প্রায় অসম্ভব। এখানে প্রকৃত বিষয় হলো—কিছু অসাধু প্রভাবশালী লোক জমিকে বন্ধুরতা দেখিয়ে জমির শ্রেণি পরিবর্তনের আবেদন করে এবং তা ভূমি অফিসে কার্যকরও করা হয়, যদিও জমিগুলো উর্বর এবং চাষযোগ্য।

[৫৯] 'উপযোগিতা' বলতে এখানে জমির উপযোগিতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জমির উপযোগিতা বলতে জমির কার্যকারিতাকে বোঝানো হয়েছে। যে জমি যে ধরনের ফসল ফলানোর উপযুক্ত, সেটাই হলো জমির উপযোগিতা। তবে এখানে উপযোগিতার প্রকৃত বিষয়টি হলো—কিছু অসাধু স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী লোকের চাপে হোক বা ঘুষ খেয়ে হোক ভূমি অফিসের লোকজন জমির 'উপযোগিতা' বিবেচনা না করে জমিকে 'বন্ধুরতা' অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে, যা সঠিক নয়।

বিচ্ছিন্নভাবে যেমন পূর্বতন আইন বা নীতিমালায় এসেছে (যেমন: কৃষি ও অকৃষি ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে খাস কৃষি ও অকৃষি জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালায়); তেমনি একাধিক বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নীতি বা আইন প্রণীত হয়েছিল স্বাধীনতাপূর্ব ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে (২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতির ৭নং অনুচ্ছেদে আলোচিত বন নিয়ে সেই ব্রিটিশ আমলে পূর্ণাঙ্গ 'বন আইন, ১৯২৭' প্রণীত হয়েছিল)।

২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতির প্রথম মুখ্য দিক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে কৃষিজমি যতটুকু সম্ভব কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১); বেশি পরিমাণ জমি চাষের আওতায় আনার এই অভিপ্রায় ১৭৯৩ সালে প্রণীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল (এএলআরডি, ২০১৯)। 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫', 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০', 'বেঙ্গল ক্রাউন এস্টেটস ম্যানুয়াল', 'গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল' এবং স্বাধীনতাপূর্ব বিভিন্ন পয়োস্তি ও সিকস্তি জমির আইনগুলোতে ভূমি ব্যবহারের বিভিন্ন অনুষঙ্গ উঠে এসেছে (Barkat, Zaman & Raihan, 2001; বারকাত, জামান এবং রায়হান, ২০০৯)। ইতিমধ্যেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ ভূমি ব্যবহার নিয়ে স্বতন্ত্র ভূমি আইনের উপস্থিতি স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই ছিল। যেমনঃ ওয়াক্ফ ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে 'ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২'; ট্রাস্টের আওতাধীন ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে 'ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২', 'চ্যারিটেবল এন্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট এ্যাক্ট, ১৯২০'; আদিবাসীদের ভূমির ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন প্রভৃতি (Barkat et al., 2014)।

৬.৩ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকল্পিত আবাসন, বাড়িঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং শিল্পকারখানা বা রাস্তাঘাট নির্মাণের কারণে প্রতিনিয়তই ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণিগত ব্যবহারের পরিবর্তন হচ্ছে, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড় ও জলাশয় বিনষ্ট হয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে; অপরিকল্পিত বাড়িঘর, শিল্পকারখানা বা রাস্তাঘাট তৈরি রোধ করে ভূমির শ্রেণি বা প্রকৃতি অপরিবর্তিত রেখে পরিবেশ ও খাদ্যশস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এবং কৃষিজমি ও কৃষিপ্রযুক্তির প্রায়োগিক সুবিধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজন এবং দেশের কৃষিজমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও কৃষিজমি সুরক্ষায় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের চাহিদা অনুযায়ী সরকার, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১ রহিত বা বাতিল করে কৃষিজমি সুরক্ষায় 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৫'-এর খসড়া প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, এর কিছু দিন পর তা কিছুটা পরিবর্তন করে প্রকাশ করে 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৬'-এর খসড়া। বর্তমানে ওই খসড়াটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সবার মতামতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

২০০১ সালের 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি'-তে সর্বমোট অনুচ্ছেদ ২০টি; অন্যদিকে, ২০১৬ সালের খসড়া আইনটিতে সর্বমোট ধারা ১০টি। ২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতিটি কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন নয়, এটি একটি নির্দেশনা। অন্যদিকে, ওই নীতিমালার পরিবর্তে সরকার নতুন যে 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি আইন, ২০১৬' প্রণয়নের চিন্তাভাবনা করেছে তাও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো আইন নয়, খসড়া মাত্র। ২০০১ সালের নীতিটির সাথে তুলনা করে বর্তমান খসড়া আইনের নতুন ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিচে তুলে ধরা হলো:

১) ২০১৬ সালের খসড়া আইনের ৩ নং ধারায় (আইনের প্রাধান্য) বলা হয়েছে যে, এই আইন জারির পর কৃষিজমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি জোনিংসংক্রান্ত ইতিপূর্বে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনার কার্যকারিতা রহিত হবে এবং এই আইন প্রাধান্য পাবে ও কার্যকর হবে। অন্যদিকে, ২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতিমালায় এ ধরনের কোন বিষয় উল্লেখ নেই।

২) খসড়া আইনের ২ নং ধারায় (সংজ্ঞা) ভূমি ব্যবহারসংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমনঃ কৃষিজমি, ভূমি জোনিং, জোত, ভূমিহীন পরিবার, খাসজমি, সায়রাতমহাল, বনভূমি প্রভৃতি। কিন্তু, ২০০১ সালের নীতিতে এ ধরনের কোনো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৩) ২০০১ সালের নীতির ৩ নং অনুচ্ছেদে ভূমি ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে; নতুন খসড়া আইনটিতে ভূমি জোনিং-এর বিস্তারিত তুলে ধরা হয়নি। ২০১৬ সালের খসড়া আইনের ৫ নং ধারায় (ভূমি জোনিং) ভূমির বিদ্যমান বহুমাত্রিক ব্যবহার, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং গুণাগুণ অনুযায়ী কৃষি, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ, বন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চল, আবাসন প্রতিষ্ঠান, পর্যটন, প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে ভূমি জোনিং-এর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে ভূমি জোনিং করা হবে তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) ২০০১ সালের নীতির ১৫ ও ১৬ নং অনুচ্ছেদে 'ভূমি ডেটাব্যাংক'[৬০] ও 'সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ'[৬১] সম্পর্কে বলা হয়েছে; ২০১৬ সালের খসড়া আইনে এ ধরনের কোনো কথা বলা হয়নি।

---

৬০ ভূমি ডেটা ব্যাংক হলো—তথ্যভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ, যা মাঠপর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং যেসব সূত্র থেকে সংগৃহীত ভূমি উপাত্ত সংরক্ষণ করা হবে, তা হলো– অব্যবহৃত সরকারি খাসজমি, পতিতজমি, অধিগৃহীত জমি যা অব্যবহার বা অব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক পুনঃগৃহীত, ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট এমন অধিগৃহীত জমি, পয়োস্তি চর (নদী থেকে জেগে ওঠা চর) এবং সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি।

৫) খসড়া আইনের ৪ নং ধারায় কৃষিজমি সুরক্ষার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যেসব কৃষিজমি রয়েছে, তা এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা করতে হবে এবং কোনোভাবেই তার ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না। তবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এবং উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এই বিধানগুলো পরিবর্তন করা যাবে এবং ওই বিধান বিধিসাপেক্ষে কৃষিজমি ছাড়া অন্যান্য জমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু, ২০০১ সালের নীতিতে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই।

৬) ২০১৬ সালের খসড়া আইনের ৭ নং ধারায় (অপরাধ, বিচার ও দণ্ড) শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেখানে এই খসড়া আইনের ধারা ৪(১), ৪(২) অথবা অন্য কোনো ধারার বর্ণিত বিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য বা লঙ্ঘন করলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে-ই হোক না কেন, তিনি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ কিংবা তার/তাদের সহায়তা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা সর্বনিম্ন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং বর্ণিত কৃষিজমি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এই আইন অমান্য বা লঙ্ঘন-এর বিচার ও বিস্তারিত দণ্ডগুলো বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। কিন্তু, ২০০১ সালের নীতিতে এ ধরনের কোন বিধান নেই।

৭) খসড়া আইনের ৯ নং ধারায় জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার অন্যান্য বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই বিধানের স্পষ্টকরণ বা ব্যাখ্যা দিয়ে ওই বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন। অন্যদিকে, ২০০১ সালের নীতিতে এ ধরনের কোন বিধান উল্লেখ করা হয়নি।

৮) ২০০১ সালের নীতির ১৮ নং অনুচ্ছেদে ভূমি ব্যবহার বিষয়ে গণসচেতনতা বা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ২০১৬ সালের খসড়া আইনে এ ধরনের কোন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নতুন খসড়া কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইনে বেশ কিছুটা ঘাটতি রয়েছে, যদিও আইনটি এখনো পাস ও কার্যকর করা হয়নি। চূড়ান্ত আইনে আরো নতুন কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে কৃষিজমি সুরক্ষায় ও ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ওই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে হয়।

---

[৬১] Certificate of Land Ownership হলো– সর্বত্র গ্রহণযোগ্য একটি একক দলিল প্রদানের মাধ্যমে ভূস্বামীর স্বত্ব নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে খাসজমির ব্যাপক হারে ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়ার বর্তমান প্রবণতা বহুলাংশে কমবে বলে আশা করা যায়।

৬.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান আইনি দলিলটি হলো 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'।[৬২] এই নীতির সর্বমোট অনুচ্ছেদ ২০টি। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি অনুচ্ছেদের বিষয় উল্লেখ করা হলো।

- সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য জমির একটি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করবে। মূলত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসেবে প্রতিটি জোন চিহ্নিত হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয়পর্যায়ে একটি জোনিং আইন প্রণয়ন করা হবে, যার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের কাজটি করবে (অনুচ্ছেদ ৩)।

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অকৃষি খাতে ভূমি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, উর্বর জমি যেখানে দুই বা তার বেশি ফসল উৎপন্ন হয় সেটি বেসরকারি ভবন নির্মাণ, আবাসন এবং ইটের ভাটা নির্মাণের মতো অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৫)।

- ক্রমশ কৃষিজমি সংকুচিত হবার কারণে গৃহায়ণসম্পর্কিত নিয়মকানুন কঠোরতার সাথে প্রতিপালন এবং গ্রামীণ জনপদগুলোতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেজন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও থানা সদরগুলোতে গৃহায়ণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও যাতে উর্বর জমিতে গৃহনির্মাণ কমানো যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ৬)।

- বনায়নের উপযোগী ভূমি ও চরভূমিতে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে দূষণপ্রক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিহত করা সম্ভব। রিজার্ভ ফরেস্ট ও অন্যান্য বনাঞ্চলে ব্যাপক বন সৃষ্টি এবং বর্তমান বনভূমির সঠিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ৭)।

- বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিতব্য কলকারখানার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, প্রধান সড়কগুলোর পাশেই মূলত শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে আনুমানিক ৫শ গজ স্থান ভবিষ্যৎ

---

[৬২] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১- এর আইনি সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় আইনি-পরিমার্জন/সংশোধন প্রস্তাবনা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ- প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (দশম খণ্ড: ভূমি সংস্কার, রেজিস্ট্রেশন, কৃষি ভূমি ব্যবহার)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে এবং বিসিক শিল্প নগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোনো ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হতে পারে (অনুচ্ছেদ ৮)।

- মৎস্য উৎপাদনের চিরাচরিত ক্ষেত্র, যথা: নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ইত্যাদি কোনোভাবেই যেন প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর অনেক জায়গাই গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এলাকাগুলোতে ব্যাপক হারে কৃষিজমিতে রূপান্তর করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু কৃষিজমির আয়তন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না, বরং, এতে নানাবিধ সমস্যা যেমন: প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া, জনগণের কর্তৃক মৎস্য প্রোটিন ঘাটতি ইত্যাদির সৃষ্টি হবে। জাতীয় কৃষিনীতি ও জাতীয় মৎস্যনীতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে একই সাথে ফসল ও মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ৯)।

- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ থেকে বিপুল আয়তনের চর জেগে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো জাগবে। নতুন চরভূমিতে বনায়ন, ভূমিহীনদের জন্য আবাসন সৃষ্টি, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থান/সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণ, পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ উন্নত চাষাবাদ, ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং একটি নীতিমালার মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে এই চর বন্দোবস্ত দেয়া ছাড়াও তাদের জন্য আদর্শ গ্রাম ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণের প্রচেষ্টা করা এবং নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই জন্য জাতীয়পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন আবশ্যক। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব (অনুচ্ছেদ ১০ ও ১১)।

- সীমিত জমির মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান স্থাপনার আয়ত্তাধীন সম্পূর্ণ জমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে এবং তারপরেও যদি বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় তবে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩)।

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ইতিপূর্বে অধিগৃহীত জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বর্তমানে অব্যবহৃত অথবা অবৈধ দখলের অথবা অপব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতায় এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উদ্ধারকৃত জমি সরকার খাসজমি হিসেবে সহজেই পুনঃগ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৪)।

- সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যেসব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি তথ্যভিত্তিক ভূমি ডেটাব্যাংক চালু করা যেতে পারে। মাঠপর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে এটি প্রণীত হবে (অনুচ্ছেদ ১৫)।

- Certificate of Land Ownership (CLO) স্ক্রিমটি সফলভাবে পরিচালিত হলে খাসজমির ব্যাপক হারে ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়ার বর্তমান প্রবণতা কমে যেতে পারে। এছাড়াও জমিসংক্রান্ত বিরোধ ও মামলা বৃদ্ধি পাওয়া, এবং অন্যদিকে, নিরীহ জনগণ মিথ্যা দলিলের মাধ্যমে নামজারিসহ বিভিন্ন হঠকারিতার শিকার হয় তার প্রবণতাও কমতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭)।

৬.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা

ভূমি ব্যবহার নীতি কোনো নির্বাহী আইন নয়, এখানে নেই বাস্তবায়নের বাধ্যতামূলক বিধান। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমি জোনিং মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। ভূমি জোনিং ম্যাপ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও উদ্দেশ্য—প্রয়োজনীয় বিষয়, যা পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারে সহায়ক। বাংলাদেশের ভূমি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার জন্য একটি জোনিং আইন প্রণয়ন করা উচিত, কিন্তু ২০০১ সালের নীতিতে এ জাতীয় ভূমি জোনিংসম্পর্কিত আইন প্রণয়নের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১-এ ভূমি জোনিং বিষয়ে কোনো ধরনের সংজ্ঞাও নেই, আলোচনা করা হয়নি ভূমি ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণের বিস্তারিত পদ্ধতিও।

ভূমি ব্যবহারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় সম্পর্কে নীতিপ্রণেতাদের ভূমিকা কখনোই তেমন বলিষ্ঠ মনে হয়নি। 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এ ১২নং অনুচ্ছেদ হিসেবে কোনো অনুচ্ছেদ নেই; অনুচ্ছেদ ১১ (চরাঞ্চল)-এর পরেই রয়েছে অনুচ্ছেদ ১৩ (ভূমির অন্যান্য ব্যবহার)। ৯ নং অনুচ্ছেদে জলাভূমি প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা শুরু হলেও, শেষটা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিকভাবে (চা-বাগান, রাবার বাগান, মূল্যবান গাছ নির্বিচারে সংহার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে)। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়টি অনুপস্থিত।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটিতে ভুক্তভোগীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, বিশেষ করে, দরিদ্র ও নারীদের। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন ছিল যা করা হয়নি, যেমন—খাদ্যমন্ত্রী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী এবং ভূমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করা জাতীয়পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি। তা ছাড়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির কর্মপরিধি।

নীতিতে বলা আছে যে, বাংলাদেশের সব কৃষিজমি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না। এক বা একাধিক ফসলি যা-ই হোক না কেন তা কৃষিজমি হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে; কৃষিজমি নষ্ট করে ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা, ইটের ভাটা এমনকি সরকারি-বেসরকারি অফিস ভবন, বাসস্থান, কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনো অকৃষি খাতে ব্যবহার করা যাবে না। তবে, এই বিধানের ব্যত্যয় ঘটলে বা কেউ অমান্য বা লঙ্ঘন করলে সেই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ কিংবা সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়নি।

নীতিতে 'ভূমি ডেটা ব্যাংক' এবং 'সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ' শব্দগুচ্ছের কথা বলা আছে। কিন্তু, এ নীতিতে ওই বিষয় দুটি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, কারা করবে বা কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, তার কোনো বিস্তারিত কিছুই বলা হয়নি।

বেসরকারি সংস্থা বা শিল্পকারখানার জন্য অধিগ্রহণকৃত বেশির ভাগ ভূমি অব্যবহৃত থেকে যায়, যা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। পরবর্তীতে, ওই অব্যবহৃত জমি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত নীতিতে বলা নেই। নীতিতে অধিগ্রহণকৃত ভূমি মূল মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার কোনো বিধান নেই।

ভূমিসম্পর্কিত বিষয়টি বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও অধিদপ্তরের সাথে জড়িত। তাই, ভূমি ব্যবহার নীতিতে ভূমি ব্যবহারসম্পর্কিত যে বিষয়গুলো বলা আছে, সেখানে ওই সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা জড়িত। তাই, ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয়, সংস্থা ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু, বিদ্যমান নীতিতে এ ধরনের কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নীতির ২০ নং অনুচ্ছেদে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সেবা/সহায়তা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, নীতিতে ভূমি ব্যবহার ও নীতিমালার বিষয়বস্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জরুরি, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি।

নীতির ১৭ (১৭.২৭ ও ১৭.২৮) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহকে জরিপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে; এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপসম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু, নীতিতে এটি বলা নেই যে, কোন ধরনের বা বিষয়ক আইনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমির অধিকার রক্ষা বা সংরক্ষণ করা হবে।

উপরোল্লিখিত নীতিগত ঘাটতির ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে নীতিটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। দুদশক পুরোনো এই নীতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে একটি আইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা জারি করা জরুরি। আইনের খসড়া হয়েছে ৫ বছর আগে, কিন্তু আইন হয়নি। নীতি বাস্তবায়নের মৌলিক সমস্যা এটি।

২ নং অনুচ্ছেদে ভূমি ব্যবহার নীতির ৯টি উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে। বিগত দুই যুগে এর বেশির ভাগ উদ্দেশ্যই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হয়নি। বিশেষত, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নঘনিষ্ঠ উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে আংশিক অর্জনও ঘটেনি। যেমন—(অনুচ্ছেদ ২-গ) ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদী, হাওর বা সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; বা (অনুচ্ছেদ ২-চ) দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

নীতির ৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য জমির একটি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করবে (অনুচ্ছেদ ৩.৫); জাতীয়পর্যায়ে একটি জোনিং আইন প্রণয়ন করা হবে (অনুচ্ছেদ ৩.৮)। কিন্তু, জোনিং আইনের ক্ষেত্রে পূর্বের মামলাসংক্রান্ত রেফারেন্স পর্যাপ্ত নয় এবং জোনিং আইনের জন্য বিস্তারিত কোনো মানদণ্ডও প্রদান করা হয়নি, যার ফলে এখনো 'ডিজিটাল জোনিং'[৬৩] পুরো দেশের জন্য তৈরি করা যায়নি।

মূল্যবান কৃষিজমি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারিত হচ্ছে, ছোট বাজার স্ফীত হয়ে গ্রাস করছে সংলগ্ন ফসলী জমি, ছোট ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদিত শিল্পনগরী খালি রেখে কলকারখানা বসছে মালিকের বসতবাটির নিকটবর্তী স্থানে। এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে Village Improvement Act নামে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করার সুপারিশ ছিল ২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার নীতিতে (অনুচ্ছেদ ৩.৩)। কিন্তু, প্রবর্তিত হয়নি সম্ভাবনাময় এ আইনটি।

নীতির ৫নং অনুচ্ছেদে নির্দেশনা রয়েছে, 'সুউচ্চ ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অকৃষি খাতের ভূমি ব্যবহার করা', 'অব্যবহৃত অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির জন্য পদক্ষেপ নেয়া, এবং 'উর্বর জমি যেখানে দুই বা তার বেশি ফসল উৎপন্ন হয় সেটি বেসরকারি ভবন নির্মাণ, আবাসন এবং ইটের ভাটা নির্মাণের মতো অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা'। বাস্তবে, এই ধারার লঙ্ঘন খুবই বেশি। এর সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব।

---

[৬৩] বাংলাদেশ সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) শেষ করলেও এখনো 'ডিজিটাল জোনিং' কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। যদিও কৃষিজমি সুরক্ষায় প্রায় ৩৩৭.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প' গত ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক)-এর নির্বাহী সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুমোদিত হয়।

ক্রমশ কৃষিজমি সংকুচিত হবার কারণে গৃহায়ণসম্পর্কিত নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন এবং গ্রামীণ জনপদগুলোতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেজন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে ৬ নং অনুচ্ছেদে। বাস্তবে, এ-সংক্রান্ত পদক্ষেপে রয়েছে সরকারের জবাবদিহিতার অভাব।

নীতিতে বনায়ন প্রসারণের কথা (৭ নং অনুচ্ছেদ) অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও বন নীতি, ১৯৯৪-এর সঠিক বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নেই।

নীতির ১০ নং অনুচ্ছেদে উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করার নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে, সরকার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যথাযথ কাজ করে না। ফলে, উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করা হয়নি। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দরিদ্রদের একটি বড় অংশ বসবাস করে। কিন্তু, ওইসব এলাকার ভূমি এখনো চিহ্নিত করা হয়নি, যে কারণে উপকূলীয় এলাকার ভূমি যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না এবং এ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওই উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র অসহায় মানুষ।

চর এলাকায় দিয়ারা জরিপ পরিচালিত না হওয়ায় চরের জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয় না (১১ নং অনুচ্ছেদ)। জাতীয়পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের অভাবে দিয়ারা-জরিপ হচ্ছে না, তাই তা খাসজমি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত কিংবা বরাদ্দ দেয়া যাচ্ছে না।

প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সহযোগিতায় অধিগৃহীত জমির যে অংশ অব্যবহৃত অথবা অবৈধ দখলে অথবা অপব্যবহৃত রয়েছে তা পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা রয়েছে নীতির ১৪ নং অনুচ্ছেদে। কিন্তু, জেলা প্রশাসকেরা অব্যবহৃত অধিগ্রহণকৃত জমি পুনরায় উদ্ধার করেননি। এক্ষেত্রে, তাদের দায়বদ্ধতার অভাব স্পষ্ট।

সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যেসব জমি আছে সেগুলোর ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তথ্যভিত্তিক ভূমি ডেটাব্যাংক চালু করার কথা থাকলেও (১৫ নং অনুচ্ছেদ) এখনো এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। CLO স্কিম-এর অধীনে সরকার এখনো ভূমি মালিকানার সনদ (১৬ নং অনুচ্ছেদ) তৈরি করেনি। ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কর্মসূচির (১৭ নং অনুচ্ছেদ) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি।

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে ভূমি কর্মকর্তারা সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট নানামুখী সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাদের মতে, ভূমিসংক্রান্ত জালিয়াতি ও হয়রানি রোধে নীতির ১৫ ধারায় উল্লিখিত ভূমি ডেটাব্যাংক অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ হতে পারে, সেজন্য অবশ্যই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন হতে হবে। কারণ, যেকোনো আইন বা নীতিমালা প্রণয়নের তুলনায় বাস্তবায়ন অনেকগুণ বেশি

দুরূহ। নোয়াখালী জেলার একজন ভূমি কর্মকর্তা বলেন, *"চর অঞ্চলে এক জমি বারবার হাতবদল হয়। আবার, ভূমিদস্যুরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে অনেক জমির অবৈধ মালিক হয়ে যাচ্ছে। ভূমি ডেটাব্যাংক থাকলে এসব অনিয়ম রোধ করা সম্ভব হতো। মানুষের ভোগান্তিও অনেক কমে যেত। তবে, এজন্য আমাদের আরো দক্ষ লোকবল প্রয়োজন, আইটি এক্সপার্ট প্রয়োজন। অনলাইন সিস্টেমে যদি সব কিছু আপ-টু-ডেট থাকে তবে আমরাও জমির সঠিক পরিমাণ বুঝতে পারব, জালিয়াতি অনেক কমে যাবে। এক্ষেত্রে, ডেটাবেজে ভূমি গ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর সংযুক্ত করা থাকলে এক ব্যক্তি একাধিকবার নাম পরিবর্তন করে ভূমির মালিক হতে পারবে না, যা ভূমিসংক্রান্ত অনেক সমস্যার অবসান ঘটাবে।"*

একইভাবে, ভূমি অধিকার কর্মীরা নীতিমালাটির বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, চরাঞ্চলে ও উপকূলীয় এলাকায় ভূমির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না এবং ভূমি ব্যবহার নীতির বাস্তবায়নও তেমন একটা চোখে পড়ছে না। দেশের কিছু প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে এসব এলাকাকে ব্যবহার করছে। তারা কৃষকদের চুক্তি চাষে সয়াবিন, বাদাম, তরমুজ ইত্যাদি ফলনে উদ্বুদ্ধ করছে। কৃষকেরাও বেশি মুনাফার লোভে এসব চাষের জন্য জমিতে অধিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছেন। ফলে, কৃষকেরা সাময়িক লাভবান হলেও দীর্ঘ মেয়াদে লোকসানের মুখোমুখি হচ্ছেন। জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে এবং হ্রাস পাচ্ছে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা। কিন্তু, ভূমি ব্যবহার নীতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে কৃষকেরা বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন না এবং সহজেই বিভিন্ন কোম্পানির ফাঁদে পা দিচ্ছেন। অন্যদিকে, বিভিন্ন এলাকায় কৃষিজমি ধ্বংস করে এগ্রো-ফার্মসহ ইটভাটা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই এসবের সাথে যুক্ত, যার ফলে প্রভাবশালীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ভূমির ব্যবহার করতে পারছে। যেখানে সেখানে ইটভাটা নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার ফলে কৃষিজমির পাশেই গড়ে উঠছে এসব ইটভাটা। এর ফলে কৃষিজমির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এসবই ভূমি ব্যবহার নীতির পরিপন্থী। ভূমি ব্যবহার নীতি কখনোই কৃষিজমির ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কিছুকে সমর্থন করে না। কাজেই, স্থানীয় প্রশাসনকেও যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও চরাঞ্চলে নীতিমালাটির বাস্তবায়ন কম হওয়ার প্রধান কারণ: ১) ভূমি ব্যবহার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব; ২) সরকারি উদ্যোগের অভাব; ৩) প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য; এবং ৪) রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে, উপকূলীয় এলাকার ভূমি ব্যবহার নিয়মের সাথে সমতলের অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর, এসব পার্থক্য ও সঠিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতার অভাবে কৃষকেরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এসব কারণে, কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা নিজ উদ্যোগে উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের সঠিক ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, সচেতন করছেন।

> *"আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার নানা ধরনের বিষয় কাজ করে। সেজন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত নীতিমালাটিকে আইনে রূপান্তর করা এবং মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া।"*
>
> *—একজন ভূমি অধিকার কর্মী, ডুমুরিয়া, খুলনা*

এসব প্রসঙ্গে খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার উপজেলার জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনার সময় তারা বলেছেন, ইটভাটা স্থাপনের বিরুদ্ধে তারা একাধিকবার আন্দোলন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হলেও রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে এখনো অনেক জায়গায় ইটভাটা নির্মাণের কাজ চলছে। তারা মনে করেন, প্রশাসনের মানুষ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে এই ইটভাটা উচ্ছেদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। ওই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, *"এই নীতিমালা সম্পর্কে জনসাধারণের তেমন একটা ধারণা নেই। ফলে, নীতিমালার ব্যত্যয় হলেও জনগণ তা বুঝতে পারছে না। কাজেই, সরকারিভাবে এই নীতিমালাসহ ভূমিসংক্রান্ত অন্যান্য সব নীতিমালা ও আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। নাটক, গান, মাইকিং, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালানো যেতে পারে। আর জনগণ যখন এ নীতিমালা সম্পর্কে জানবে, তখন এগুলোর বাস্তবায়নের ত্রুটিও ধরতে পারবে।"*

> *"কৃষিজমির উপর যে হারে বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে তার ফলে এভাবে চললে আগামী ২০ বছর পর আর কোনো কৃষিজমি অবশিষ্ট থাকবে না এ অঞ্চলে। আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে কৃষিজমিকে রক্ষা করতে হবেই এবং এ দায়িত্ব আমাদের সবারই। এ কারণে, ভূমি ব্যবহার নীতির বাস্তবায়নে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেন কৃষিজমি সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া, এ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে জনগণকেও কাজ করতে হবে।*
>
> *—দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ*

৬.৬ নীতির ব্যত্যয়: দু'টি বাস্তব উদাহরণ

পত্তনি চাষ, চুক্তিবদ্ধ চাষ এবং ভূমির দূষণ বা অনুর্বরতা বৃদ্ধি

কৃষিজমি সুরক্ষা, ভূমি দূষণ রোধ ও ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণীত হলেও নীতিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রতিনিয়তই নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে যেমন ক্রমান্বয়ে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তেমনি অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতাও নষ্ট হচ্ছে। পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের মতো ত্রুটিপূর্ণ চাষাবাদ পদ্ধতি মাটির উর্বরতা বিনষ্ট করছে। কৃষকেরা এসব চাষাবাদ পদ্ধতিতে অধিক ফলনের আশায় জমিতে অপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। এতে জমির জৈব পদার্থ কমে গিয়ে মাটি তার স্বাভাবিক উর্বরতা

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মূলত, স্বল্প মেয়াদে এসব কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থ বেশি ফলন দিলেও দীর্ঘ মেয়াদে এগুলো মাটিকে ফসল উৎপাদনের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে। আবার, অনেক কৃষকই বেশি ল্যাভের আশায় একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করেন। কিন্তু জমির উর্বরতা শক্তি ঠিক রাখতে মিশ্র ফসলের আবাদ করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও, দ্রুত ও অধিক ফলনের আশায় চাষ করা উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ফসলও জমির উর্বরতা ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলছে। এসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ দেশের কৃষিজমির উৎপাদনক্ষমতা কমে যাচ্ছে, মাটির জৈবিক গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাটিতে অম্লতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিনির্ভর এই দেশের জন্য জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়া মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১-এর অন্যতম প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল: (২-ঙ) ভূমির ব্যবহার যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা; এবং (২-জ) ভূমি দূষণ প্রতিরোধ করা। বিগত দু দশক ধরে ভূমি ব্যবহার নীতিটি বাস্তবায়নাধীন থাকলেও, নীতির অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর মতো উল্লিখিত উদ্দেশ্য দুটিও বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অসংগতিপূর্ণ ভূমির ব্যবহার দিন দিন ভূমিদূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রচুর কৃষিভূমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি যে দুটি বিষয় এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হলো: পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ। পত্তনি বা ঠিকা প্রথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বা শস্যের বিনিময়ে জমির মালিক চাষিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (এক বছর বা এক মৌসুমের জন্য) তার জমি চাষ করার সুযোগ দেন। অন্যদিকে চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির (অথবা এনজিও, অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা পাইকারের) 'ইনপুট' সহায়তায় চাষ করে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল পূর্বনির্ধারিত শর্তে ও দরে কোম্পানির (অথবা, উল্লিখিতদের) কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকে।

পত্তনি চাষ প্রথায়, জমির মালিককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়ার পর, কৃষক তার জমি নিজের ইচ্ছেমতো চাষ করতে এবং উচ্চমাত্রার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে পারে। উৎপাদনশীলতা ও চাষ-স্বাধীনতার ওপর ভর করে দ্রুত প্রসারিত হলেও পত্তনি চাষ কৃষকের জন্য বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অবিমিশ্র আশীর্বাদ বয়ে আনেনি; বরং, দিন দিন এটি তাদের নানান দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্তনি চাষের ওপর গ্রামাঞ্চলের আধিপত্যশীল সম্পত্তি-সম্পর্ক এবং ক্ষমতাকাঠামোর ব্যাপক প্রভাব কৃষকদের দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে। গরিব কৃষক ক্ষমতাকাঠামোয় তার অধঃস্তন অবস্থানের জন্য জমির মালিকের সাথে দর কষাকষির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকৃত অর্থেই দুর্বল ভাবে। তার ওপর পদ্ধতিটি সুপরিচালিত নয়, যে কারণে কৃষকেরা প্রায়শই বঞ্চিত হয়। পত্তনি চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও চাষির মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগির কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই কখনো লোকসান হলে এর পুরোটাই বইতে হয় কৃষককে। লোকসান বইতে না পেরে এ চাষের প্রক্রিয়ায় বহু কৃষক চাষবাস ছেড়ে চলে যায়।

জমির মালিকের সাথে ফসল ভাগাভাগি করতে হয় না বলেই পত্তনি জমিতে কৃষকেরা অতিরিক্ত শ্রম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন স্তরে পৌঁছাতে চায়। এছাড়া, সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে কৃষকেরা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বালাইনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং শস্য-নিবিড়তা বাড়িয়ে দেয়। এসব রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ এবং কোনো বিরতি ছাড়াই জমির ব্যবহারের ফলে জমি তিলে তিলে তার উর্বরতা হারায়। পরবর্তী মৌসুমে জমি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই বলে কৃষকেরা পত্তনি জমিতে গোবর, জৈব সার বা এমন কোনো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে না; অথচ, এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে জমির উর্বরতা শক্তি বজায়ে সহায়ক। ফলে পত্তনি জমি দিনের পর দিন অনুর্বর থেকে অনুর্বরতর এবং একপর্যায়ে অনুর্বরতম তথা চরম দূষিত হয়ে পড়ে। অনুর্বর জমি যেমন ফলন কমিয়ে দেয়, তেমনি কোনো কোনো কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন চিরতরে বন্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন—কলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বেলে দো-আঁশ মাটির গুণাগুণ এখন আর তেমন অক্ষুণ্ণ নেই। অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে মাটি শক্ত হয়ে গেছে। এতে দেশি জাতের সাগর কলার চাষ করা যাচ্ছে না। দেশি সাগর কলাগাছের চারা রোপণ করলে গাছ বড় হয় না। আবার গাছ হলেও, কলার ছড়িতে বেশি কাঁদি জন্মাতে দেখা যায় না। কলার আকারও অনেক ছোট হয়ে এসেছে। মাটির কারণে এখন কলার ছড়িতেও রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। এ কারণে অনেক চাষি দেশি সাগর কলার চাষাবাদ বন্ধ করে চম্পা, সবরি ও অন্যান্য জাতের কলা আবাদ শুরু করেছেন (শাহীন, ২০১৮)।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিগত ১০ বছরে পত্তনি চাষের ফলে বাংলাদেশের মোট কৃষিজমির (২২২ লক্ষ একর) ১.৪ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রায় অনুর্বর হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার একর বা ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বিঘা; বাংলাদেশের ১৪টি জেলার একক আয়তন এই পরিমাণের চেয়ে কম (বারকাত এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী, ২০১৯)।

অনেক চুক্তিবদ্ধ চাষি-খানা মনে করে, এ ধরনের চাষের ফলে তারা ইতিমধ্যেই ভূমিসহ কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিকার হারিয়েছেন। চুক্তিবদ্ধ কৃষক এবং কোম্পানি বা চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে অসম সম্পর্ক কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের মূল কারণ। দ্বিতীয় পক্ষ প্রায়শই ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতাবিরুদ্ধ চর্চা করে বিনিময় শর্ত কৃষকের প্রতিকূলে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ কৃষিখানাই চুক্তিপত্র পড়ে না, যারা পড়ে তারাও চুক্তির বেশির ভাগ শর্তই বোঝে না। শস্য নির্বাচন, উপকরণ চয়ন ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর/পর্যায় চুক্তির শর্তাধীন হয়। যত স্তর/পর্যায় চুক্তির শর্তাধীন হয়, তত বেশি হারে উৎপাদনের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ কমে। কৃষকেরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফসল বপন করতে ও কাটতে পারেন না। চুক্তিবদ্ধ চাষে কৃষকদের প্রায়শই বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি উপকরণ বাজারের চেয়ে বেশি দামে কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে বাধ্য করা হয়। জমিতে কৃষি উপকরণ প্রয়োগের পরিমাণ, সময় প্রভৃতির ওপর কৃষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফসল কী পরিমাণ রোদে শুকোবে তাও কোম্পানি নির্ধারণ করে দেয়। গ্রেডিং ও

নানা গুণগত মানের দোহাই দিয়ে কৃষকের কষ্টার্জিত উৎপাদনের একটি অংশ প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হয়; সেই পণ্য কম দামে চাষিদের বাজারে বিক্রি করতে হয়। আবার বাজারে ফসলের বেশি দাম থাকলেও, নির্দিষ্ট দামে কোম্পানির কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে একই শস্য চাষ করে। এতে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হয়, মাটিতে ক্ষতিকর উপকরণের পরিমাণ বাড়ায়, অধিক হারে মাটির পুষ্টি উপাদান বিনষ্ট করে। শস্যাবর্তনের অনুপস্থিতি অর্থাৎ একই শস্যের বারবার চাষ, উর্বরতার স্বাভাবিক অর্জনকে ব্যাহত করে। চুক্তিবদ্ধ চাষিরা জমির উৎপাদিকা শক্তি ধরে রাখতে উত্তরোত্তর রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে চুক্তিবদ্ধ চাষের জমিটিকে আরো অনুর্বরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে জৈবসার, যেমন ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার ব্যবহারের প্রবণতা নেই বললেই চলে। উর্বর মাটিতে ৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকার কথা। এতে মাটিতে পানির ধারণক্ষমতা ও বায়ু চলাচলের সুযোগ বাড়ে। কিন্তু, দেশের বেশির ভাগ এলাকায় মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। তাই মাটিতে জৈবসারের ব্যবহার বাড়ালে মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা বাড়বে। জৈবসার মাটিকে নরম করে, এতে বিভিন্ন অণুজীবের বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে ক্রমেই ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা কমে যেতে থাকে (মৃধা, ২০১৯)। দিনের পর দিন চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর হয়ে যাওয়া জমিতে পরবর্তীকালে খাদ্যশস্য চাষ করলে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় না। ফলে, খাদ্য নিরাপত্তার প্রাথমিক শর্ত অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই কৃষিখানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের মোট কৃষিজমির (২২২ লক্ষ একর) ০.৭৩ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রায় অনুর্বর হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর বা ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার বিঘা; যা বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জের মোট আয়তনের (১,৬৯,১১৮ একর) প্রায় সমান (বারকাত এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী, ২০১৯)।

রিজার্ভ ফরেস্ট কি আদৌ সংরক্ষিত?

ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরবর্তন, পরিবেশদূষণ, প্রাকৃতিক বন উজার করে লাভজনক বৃক্ষ রোপণ, রিজার্ভ ফরেস্টে ফলের আবাদ, নির্বিচারে গাছ কেটে বন উজার করা ইত্যাদি কারণে দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। শালবনের জন্য বিখ্যাত এই বনে এখন শালবনের পরিমাণ নগণ্য। ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা মিলে বনের গাছ কেটে কলা, আনারস, লেবুসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করছে। ফলে, বনে কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ছে এবং প্রাকৃতিক বন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, সামাজিক বনায়নের নামে শালগাছ কেটে দ্রুত বর্ধনশীল বিদেশি প্রজাতির আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ লাগানো হচ্ছে, যা বনের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট

করছে। কারণ, এসব গাছ দ্রুত বর্ধনশীল হলেও জীববৈচিত্র্যবান্ধব নয়। আবার, বন কেটে রাবারচাষের ঘটনাও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এভাবে, নানাবিধ উপায়ে ধ্বংসের ফলে মধুপুর বন যেন আজ একটু নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই বাঁচাতে হবে বন ও বনজসম্পদকে, আগ্রাসী এসব কর্মকাণ্ড বন্ধে নিতে হবে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ। কারণ, বন ও বনজসম্পদ টিকে না থাকলে আমাদের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। দেশের মোট বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চল, মধুপুর অঞ্চল, সুন্দরবন ইত্যাদি কিছু এলাকায় বিস্তৃত। এর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চল অন্যতম। কিন্তু, সবুজ-সৌন্দর্যে অতুলনীয় এ দেশটির বনসম্পদের অবস্থা নাজুক, বিশেষভাবে সরকারি বনভূমিতে। সরকারি বনভূমির বেহাল অবস্থায় বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় ও মানুষের জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণে একমাত্র ভরসা এ বসতভিটার বন ও ঝোপঝাড় (গাইন, ২০০৪ক)।

বাংলাদেশের সুন্দরবন বাদে বাকি সব বন এখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বাংলাদেশের বন-নির্ভর জীববৈচিত্র্য ইতিমধ্যে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায়। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে অল্পদিনের মধ্যে তাও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে এখন মধুপুর গড় অঞ্চল, যা টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা রসুলপুরে রয়েছে। মধুপুর বনের টাঙ্গাইল অংশের ৪৬ হাজার একরের মধ্যে রাবার বাগান হয়েছে ৭ হাজার ৮শ একরে, বিমান বাহিনী নিয়েছে এক হাজার একর, জবরদখল হয়েছে ২৫ হাজার একর এবং বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণে আছে মাত্র ৯ হাজার একর। মুক্তাগাছার রসুলপুর অংশে রয়েছে ৫শ একর, সেখানে বনের উপস্থিতি নেই বললেই চলে (গাইন, ২০০৪খ)। সাম্প্রতিক সময়ে মধুপুর শালবনে নজীরবিহীন বন ধ্বংসের ঘটনা ঘটছে। ঐতিহ্যবাহী শালবনে অনেক দিন ধরেই নির্বিচারে আনারস ও কলা চাষ করা হচ্ছে। এ কারণে একসময় শালবনের অবশিষ্ট গাছগুলোকে রক্ষার জন্য বন বিভাগ পাকা দেয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা করছিল। আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের চাপের মুখে পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মধুপুর বনে গিয়ে দেখা যায় যে, বনকর্মীদের চোখের সামনে এলাকার প্রভাবশালীরা অনেক জায়গায় তাজা শাল কপিস[৬৪]কেটে তৈরি করছে কলা বা আনারসের বাগান। সারা মধুপুরজুড়েই আনারস চাষের পাশাপাশি মহা ধুমধামের সাথে চলছে কলাচাষ। বনের আমলিতলার এ কলা বাগানের পাশে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে আনারস বাগান। এখানেই চলেছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থে ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় আবর্তের 'সামাজিক বনায়ন'। সামাজিক বনায়নের মাঝে অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে চাষ হচ্ছে আনারস। তবে সামাজিক বনায়ন থেকে আনারস

---

৬৪ 'শাল কপিস' হলো– শাল গাছের ছোট চারা গাছ, যা প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে এবং বেড়ে ওঠে।

চাষকেই মনে হচ্ছে মুখ্য। এডিবির অর্থে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়নের নামে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে বিদেশি প্রজাতি দিয়ে কৃত্রিম বনায়ন। আর তখন থেকেই নির্বিচারে কাটা শুরু হয়েছে শাল কপিস। শাল বাড়ে ধীরে, এর উৎপাদন ক্ষমতা কম– এরকম মূল্যায়ন শাল কপিস কাটায় উৎসাহ জুগিয়েছে। শাল কপিসের জায়গায় লাগানো হয়েছে বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতির গাছ (যেমন– আকাশমণি, গামার, বকাইন, উডলট প্রভৃতি বিদেশি আগ্রাসী গাছ যা বনের ভূমির উর্বরতা নষ্ট করছে)। আর এভাবেই শাল ও অন্যান্য শত রকমের দেশিয় প্রজাতির জায়গায় তৈরি হয়েছে আগ্রাসী প্রজাতির কৃত্রিম বন। এখন শালবনের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শালগাছের চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। বনবিভাগ সব সময় অভিযোগ করে এলাকার দরিদ্ররা এবং বনদস্যুরা গাছ কাটে। কিন্তু, এলাকার আদিবাসী ও সাধারণ বাঙালিদের সাথে কথা বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যারা আনারস-কলাবাগানের মালিক তারা দরিদ্র নন। এদের অধিকাংশই বিত্তশালী, বনবিভাগের সাথে একটি সুসম্পর্ক রেখেই এরা অবাধে সরকারি বনভূমিতে আনারস, কলা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করেন।

মধুপুরের আরেক সর্বনাশা ঘটনা রাবার চাষ। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ৭ হাজার ৮শ একর জমিতে তৈরি হয়েছে রাবার বাগান। মধুপুরে রাবার চাষ করে কাঙ্ক্ষিত ফল যে পাওয়া যায়নি, তা প্রমাণিত। রাবার বাগানও করা হয়েছিল শালবনের জায়গায়, অনেক জায়গায় তাজা শাল কপিস কেটে। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কয়েক দশকের মাঝামাঝি আগে যেখানে ছিল শালবন সেখানে রাবার চাষ করে জাতীয় স্বার্থের নামে ঘটেছে প্রকৃতি ধ্বংস (গাইন, ২০০৪গ)। মধুপুর বনের সর্বত্র এই যে পরিবেশ বিপর্যয় এবং ভূমির অপব্যবহার সেজন্য বনের আদিবাসী ও সাধারণ দরিদ্র বাঙালি কৃষক বন বিভাগকে সামনে রেখে সরকারি নীতিহীনতা এবং বিদেশি প্রভাবকেই দায়ী করেন। এমনকি একসময় বাংলাদেশ সরকারের একজন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বলেছিলেন, যারা বনের মধ্যে বসবাস করে তাদের অধিকার বেশি এবং আরেকজন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, বন বিনাশের জন্য বন বিভাগই দায়ী। মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী বন বিভাগের কর্মকর্তারা মধুপুর শালবন ধ্বংসের জন্য দায়ী হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা বা তদন্ত করা হয়নি।

বনবাসীদের দাবিদাওয়া: (১) বন ও বনের আশে পাশে বসবাসকারী জনগণের অধিকার রক্ষা এবং পরিবেশগত, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত ও শিল্প চাহিদায় ভারসাম্য রক্ষার্থে ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান, জাতীয় বন নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও নীতিগুলো একটি গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সংশোধন করতে হবে; (২) প্রাকৃতিক বনভূমি বিশেষ করে মধুপুর শালবন বাণিজ্যিক বনবাগানে পরিণত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে; (৩) উজাড়কৃত বনভূমিতে বনায়নের চেয়ে প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে, অর্থাৎ বনের ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; (৪) প্রাকৃতিক বনে লগিং (বৃক্ষ কর্তন) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে; (৫) সরকারনিয়ন্ত্রিত সবধরনের বন ও আবাদভূমির আয় থেকে একটি উপযুক্ত অংশ স্থানীয় সরকার পরিষদকে দিতে হবে; (৬) অর্পিত, অধিগ্রহণকৃত, সংরক্ষিত ও অন্যান্য সরকার নিয়ন্ত্রিত

বনাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও আইনি নিশ্চয়তা দিতে হবে; (৭) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মৌলিক চাহিদা মিটানোর জন্য চাষাবাদের অধিকার প্রদান এবং আবাদকৃত ও আবাদযোগ্য ভূমিসমূহ ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে; (৮) বনাঞ্চলের ভূমির প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, সেখানে এমন কিছু চাষ করা বা গাছ লাগানো যাবে না, যার দরুণ ভূমির উর্বরতা নষ্ট হয়। বনাঞ্চলের ভূমিকে প্রাকৃতিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই বনের পরিবেশ অনেকাংশে সুন্দর ও জীববৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে; এবং (৯) সর্বোপরি, বনাঞ্চলের ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে (ঢাকা বন ঘোষণা, ২০০১)।

বাংলাদেশের 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর ১৭-(২৭) (২৮) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহকে জরিপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে; এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপ-সম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু, নীতিতে এটি বলা নেই যে, কোন ধরনের বা বিষয়ের আইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমির অধিকার রক্ষা বা সংরক্ষণ করা হবে। এমনকি এ নীতিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে সম্বোধনও করা হয়নি।

বাংলাদেশে বন ও বনবাসীর বর্তমান যে অবস্থা তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বনবাসীর বিশেষভাবে আদিবাসী মানুষের ঐতিহ্যগত অধিকারগুলো ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হচ্ছে। তাদের ঐতিহ্যগত আবাসন অরণ্যে তারা ক্রমাগত কোণঠাসা। এ পরিস্থিতির জন্য আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নানা অবস্থা, নীতি এবং সংস্থা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী বাইরের অনেক চাপ, নীতি এবং প্রতিষ্ঠান। কাজেই প্রথমত মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বনকে ঘিরে ভুল নীতি, সিদ্ধান্ত এবং কাজ কী কী হয়েছে এবং সেসব সংশোধনের সম্ভাব্য উপায় কী হতে পারে।

৬.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং

'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-কে ৪টি নির্দেশকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্কোরিং করা হয়েছে। এই ৪টি নির্দেশক হলো: (১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব। প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই '০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে: যেখানে '০' নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, অন্যদিকে '৫' স্কোর মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। সবশেষে, এই ৪টি নির্দেশকের প্রতিটি স্কোরের একটি গড়ও করা হয়েছে।

এই ৪ টি নির্দেশকের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব' নির্দেশকে (স্কোর: ০.৯)। এরপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের

অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য’ নির্দেশকটি (স্কোর: ১.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে ‘সাংঘর্ষিকতা ও ‘অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা’– এই দু’টি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৫)। লেখচিত্র ২০-এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হয়েছে। এই নীতির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৩।

লেখচিত্র ২০: স্কোরিং—‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১’-এর আইনি সমস্যা
(‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৩

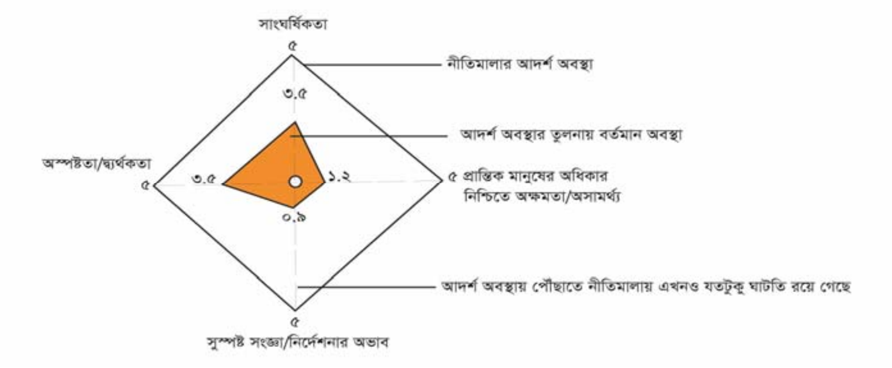

অন্যদিকে, ৮টি নির্দেশকের মাধ্যমে এই নীতির বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং করা হয়েছে: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। আগের মতোই ‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং করা হয়েছে প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে, এবং সবশেষে করা হয়েছে একটি গড়। ‘০’ অর্থ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা, ‘৫’ নির্দেশ করেছে সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১’-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে— ‘সমন্বয়হীনতা’– এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৩। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ‘রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন’ ও ‘রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন’ নির্দেশক দু’টি (উভয়ের স্কোর ০.৭)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় থাকা পরবর্তী দু’টি নির্দেশক হলো: ‘দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা’ (স্কোর, ০.৮) এবং ‘স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব’ (স্কোর, ০.৮)। বাকি ৩ টি নির্দেশক যথাক্রমে ‘জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি’, ‘সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর’ এবং ‘জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি’-এর অবস্থাও বেশ মন্দের দিকেই, যাদের প্রত্যেকটির স্কোর ১-এর কম (০.৯)। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৮, অর্থাৎ, অত্যন্ত মন্দ যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতিগুলোর বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়েও কম। লেখচিত্র ২১-এ স্কোরিংটি এক নজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ২১: স্কোরিং—‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১’-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
(‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নীতির তুলনায় বাস্তবায়নের সমস্যা অনেক বেশি (নীতির সমস্যার গড় স্কোর: ২.৩, এবং নীতি বাস্তবায়নে সমস্যার গড় স্কোর: ০.৮)। আদর্শ স্কোর যদি ‘৫’ হয় (অর্থাৎ, অর্জন ১০০%) তাহলে, নীতির সমস্যার স্কোর ২.৩ (৪৬% অর্জন) এবং নীতির বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোর ০.৮ (মাত্র ১৬% অর্জন) (লেখচিত্র ২২)।

লেখচিত্র ২২: ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১’ নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা (‘০’ এর ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

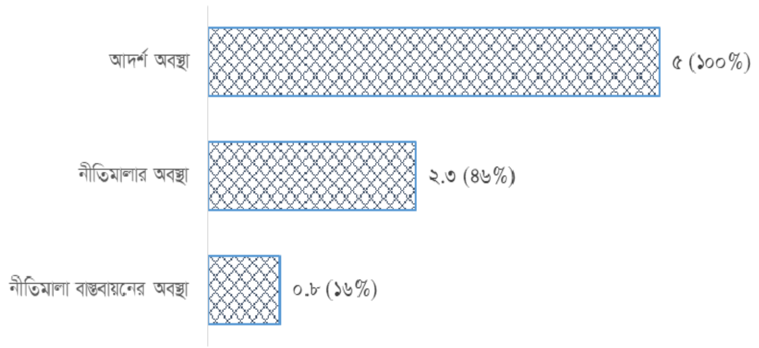

৬.৮ সুপারিশমালা

আইনসংশ্লিষ্ট

১) ভূমি ব্যবহার বিষয়ে চাই পূর্ণাঙ্গ একটি আইন। খসড়া 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি আইন, ২০১৬'-তে প্রয়োজন অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণনির্ভর সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন। এক্ষেত্রে, নিবিড় গবেষণালব্ধ প্রস্তাবিত 'কৃষিভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০২০' অনুসরণ করা যেতে পারে[৬৫]।

১) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে দরিদ্র ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট কাঠামো। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী, ভূমি অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির কার্যপরিধিও নির্দিষ্ট করা জরুরি। এছাড়াও, এই কমিটির নিয়মিত ও সক্রিয় কার্যক্রম এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য নাগরিক তদারকির প্রয়োজন।

২) 'ভূমি ডেটাব্যাংক'[৬৬], এবং 'সার্টিফিকেট অফ ল্যান্ড ওনারশিপ' এর কাঠামোবদ্ধ এবং সময়নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা চাই।

৩) যে উদ্দেশে জমি অধিগ্রহণ করা হলো তা না করা হলে, ওই অব্যবহৃত জমির ব্যবহার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে অব্যবহৃত জমি মূল মালিকের প্রয়োজনানুসারে ফেরত দেয়ার বিধান রাখা দরকার।

৪) ভূমি ব্যবহার বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এবং অধিদপ্তর-এর মধ্যকার সুসমন্বয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কাঠামো, পদ্ধতি, এবং কর্মবন্টন।

---

[৬৫] 'কৃষিভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০২০' শীর্ষক প্রস্তাবিত আইনটি পাওয়া যাবে এখানে: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ-প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩) (দশম খণ্ড: ভূমি সংস্কার, রেজিস্ট্রেশন, কৃষিভূমি ব্যবহার)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। পরিশিষ্ট ২-এ প্রস্তাবিত আইনটি সংযুক্ত করা হলো।

[৬৬] যে ব্যাংকে ভূমি-জলাসংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাসজমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সব অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত অন্যান্য; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা ইত্যাদি; চিংড়ি ঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবরদখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সমস্ত ভূমি-মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধের কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা; সব বর্গাদারের বর্গাস্বত্বসংশ্লিষ্ট তথ্যের হালনাগাদ অবস্থা ইত্যাদি।

৫) ব্যবহারের বিধানের ব্যত্যয় ঘটালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ এবং সহায়তাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, তার সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা দরকার।

বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট

১) নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অকৃষি খাতে কৃষিজমির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এছাড়াও, পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের মতো ত্রুটিপূর্ণ চাষাবাদ পদ্ধতি মাটির উর্বরতা বিনষ্ট করছে। প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ, প্রতিবেশ। টেকসই উন্নয়নবিরোধী এই প্রবণতা রোধে প্রয়োজন শক্ত নজরদারি।

২) বিস্তারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পুরো দেশের ডিজিটাল জোনিং ম্যাপ করা প্রয়োজন, যার তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৩) অধিগৃহীত জমির অব্যবহৃত/অবৈধ দখলের/অপব্যবহৃত অংশ পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।

৪) যে উদ্দেশে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার সঠিক এবং সময়নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবার জন্য সামাজিক নজরদারি জরুরি।

৫) সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের মাধ্যমে চর এলাকায় দিয়ারা জরিপ পরিচালিত হওয়া জরুরি।

৬) জরুরি ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চল চিহ্নিতকরণের কাজটি করা প্রয়োজন।

৭) পরিবেশ সুরক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয়পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

অধ্যায় ৭

উপসংহার[৬৭]

সারকথা: আদর্শ অবস্থান থেকে গবেষণার আওতাধীন সবকটি আইনের অবস্থানই অনেক দূরে, আবার সেই অবস্থান থেকেও বাস্তবায়ন অবস্থার দূরত্ব অনেক– রেন্টসিকার পরিবেষ্টিত, দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমনটাই স্বাভাবিক।

প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ভূমির ওপর জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা নিশ্চিত করা। অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জীবনে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনই স্থায়ী হবে না। কৃষিভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া ভূমি-সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন—বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌলিক সংস্কার।

ভূমি প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় চাই জনমানুষের কাঠামোবদ্ধ-সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ: এজন্য স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ভূমি-অধিকারবিষয়ক সংগঠন-কে পুরো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে, বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরোমাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি। আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব।

আদর্শ অবস্থান থেকে প্রকৃত আইনের দূরত্ব অনেক। আর প্রকৃত আইন থেকে তা বাস্তবায়নের দূরত্ব আরো অনেক বেশি। আমরা আইন এবং নীতিমালাগুলোর আইনি এবং নীতিগত সীমাবদ্ধতা বা সমস্যার যে স্কোরিং করেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রগুলো হলো প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা-অসামর্থ্য এবং সুস্পষ্ট সংজ্ঞা-নীতি-নির্দেশনার অভাব। রেন্টসিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা খুবই স্বাভাবিক। আইনি সমস্যার ক্ষেত্রে ৫টি আইনের গড় স্কোর ২.৯, যেখানে আদর্শ অবস্থা অর্জনে পেতে হবে ৫ (সারণি ৪)।

---

[৬৭] এই অধ্যায়ে "বারকাত, আবুল (২০২০) রচিত, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা" গ্রন্থের ব্যাপক সহায়তা নেয়া হয়েছে।

সারণি ৪: স্কোরিং—আদর্শ আইন থেকে প্রকৃত আইনের দূরত্ব
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

আইন/নীতি	সাংঘর্ষিকতা	অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা	প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষম/ অসামর্থ্য	সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নীতি-নির্দেশনার অভাব	**গড় স্কোর**
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭	৩.৮	৩.৪	২.৩	৩.৪	**৩.২**
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫	৩.৪	৩.৪	২.২	৩.৩	**৩.১**
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯	৩.৭	৩.৮	৩.১	৩.৩	**৩.৫**
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭	৩.৭	৩.৪	২.২	১.৯	**২.৮**
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১	৩.৩	৩.২	১.২	০.৯	**২.১**
গড় স্কোর	**৩.৬**	**৩.৪**	**২.২**	**২.৬**	**২.৯**

অন্যদিকে, স্কোরিং অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি সমস্যার ক্ষেত্রগুলো হলো রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং সমন্বয়হীনতা। আইন বাস্তবায়নের সমস্যার ক্ষেত্রে ৫টি আইনের গড় স্কোর মাত্র ০.৯, যেখানে আদর্শ অবস্থায় পৌছাতে হলে পেতে হবে ৫ (সারণি ৫)।

সারণি ৫: স্কোরিং—আইন বাস্তবায়নের আদর্শ অবস্থা থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের দূরত্ব
(‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

আইন/নীতি	জাতীয় পর্যায়ে দায়ব দ্ধতার ঘাটতি	দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা	রাজ-নৈতিক দুর্বৃত্তায়ন	রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন	সেবা-বিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ / দপ্তর	স্বচ্ছতা-জবাব-দিহিতার অভাব	জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি	সমন্বয়-হীনতা	গড় স্কোর
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭	১.৫	১.৭	১.৬	১.১	১.২	০.৯	০.৮	১.২	১.২
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫	১.১	১.৭	০.৮	০.৮	০.৯	১.১	১.১	১.১	১.১
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	০.৯	০.৯	০.৮	১.১	০.৯
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	১.১	০.৬	০.৮
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১	০.৯	০.৮	০.৬	০.৬	০.৯	০.৮	০.৯	০.১	০.৭
গড় স্কোর	১.১	১.২	০.৯	০.৭	১.০	০.৯	০.৯	০.৮	০.৯

এখানে গবেষণাধীন ৫টি আইন/নীতিতেই যেমন রয়েছে সমস্যা, তেমনি প্রতিটিতেই বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট। তুলনামূলক বিচারে আইন/নীতিতে সমস্যা এবং বাস্তবায়ন সমস্যা, এই দুই বিচারেই, সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত হলো “জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১”। সমস্যাগ্রস্ততার বিচারে দ্বিতীয় আইনটি হলো ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭’। লেখচিত্র

২৩-এ এই ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখচিত্র ২৩: গবেষণাকৃত ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং বাস্তবায়ন সমস্যার তুলনামূলক চিত্র ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

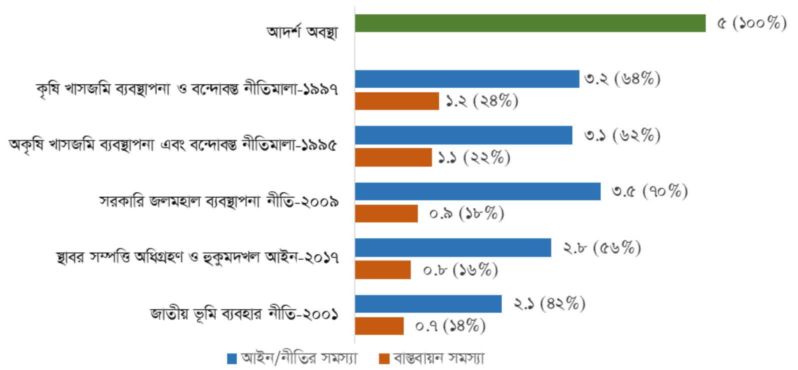

নোট: আদর্শ স্কোর ৫, অর্থাৎ ১০০%; আইনি সমস্যা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনীর ভিতরের অংকটি আদর্শ অবস্থা, অর্থাৎ ১০০% এর মধ্যে শত করা কত ভাগ অর্জিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূমি আইনসংশ্লিষ্ট আইনি সংস্কার (পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন) সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে' বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া দরকার। আইনে অনেক মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। আর তাও রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তয়িত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতে।

অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া ভূমির ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করা অতি দুরূহ, বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জন্য বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং এর সঠিক প্রয়োগ ছাড়া তাদের জীবনে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনই স্থায়ী হবে না। এজন্য নীতিমালা যথেষ্ঠ নয়: নীতিমালা আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে পারে না; চাই আইন এবং তা প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা। ভূমি বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা এবং দড়ি-টানাটানি মানুষের দুর্ভোগকেই বাড়ায়, প্রশস্ত করে দুর্নীতির পথ: পুরো ভূমি প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনাকে নিয়মনিষ্ঠ এবং সামর্থ্যবান একছাতার নিচে না আনতে পারলে, এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ মিলবে না। এর জন্য প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদি-মধ্যমেয়াদি-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, খাতওয়ারি প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং এর সঠিক বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষণ। এসবও শেষ বিচারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ, কারণ এখানে বাংলা বর্ণমালার '৪ জ' আছে: ১ম 'জ' = জমি, ২য় 'জ' = জলা, ৩য় 'জ' = জঙ্গল (বন), ৪র্থ 'জ' = জনমানুষ। প্রতিটি 'জ'-ই প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু, আমাদের দেশে জমি-জলা-জঙ্গল-এর সাথে জনমানুষ-এর সম্পর্কের সমীকরণে একটা বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। *আর তা হলো– যে জনমানুষ জমি চাষ করেন (কৃষক) সম্পদ সৃষ্টি করেন (ফসল উৎপাদন করেন), তিনি ওই জমির মালিক নন; যে জনমানুষ জলায় শ্রম দিয়ে (জেলে) সম্পদ সৃষ্টি করেন (মাছ উৎপাদন করেন), তিনি ওই জলার মালিক নন; আর যে জনমানুষ জঙ্গলে-বনে শ্রম দিয়ে (প্রধানত আদিবাসী মানুষ) সম্পদ সৃষ্টি করেন (বন সৃষ্টি ও সুরক্ষা করেন), তিনি ওই বনের মালিক নন–* এসবই বাংলাদেশের অনুন্নয়নের গোড়ার কথা।

মনে রাখা চাই, ভূমির ওপর কৃষিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা নিশ্চিত করা হলো প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রকৃত কৃষক, প্রকৃত জেলে, প্রকৃত বনবাসী মানুষ এরা সবাই প্রকৃত অর্থেই দরিদ্র, বঞ্চিত, বৈষম্য-অসমতার শিকার। একইসাথে, ভূমিহীন মানুষের জন্য খাসজমির বরাদ্দ নিশ্চিত করা চাই, এবং তা ধরে রাখবার জন্য চাই প্রয়োজনীয় রক্ষা-ব্যবস্থা।[৬৮] আমরা ভুলতেই বসেছি (বলা ভালো, ভোলানো হয়েছে) এ দেশের টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসে কৃষি-সংস্কারের[৬৯] কোনো বিকল্প নেই; যার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভূমিসংস্কার। ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি মালিকানার খাস জলা-জমির বণ্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ সংরক্ষণসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

কৃষি-কৃষক ভাবনাসহ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সামগ্রিক বিষয়, দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার– রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ, বিষয়টি আসলে

---

[৬৮] ভূমিহীন গরিব জনগণের যে ক্ষুদ্র অংশটি খাসজমি পেয়েছে তাদেরও প্রতি ২ জনে একজন খাসজমি বণ্টনের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও পায়নি। ভূমি অফিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সাথে দখলকারীদের যোগসাজশ৩২৪শ জমি রক্ষা করতে না পারার প্রধান কারণ। সর্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের আওতায় বাজার অর্থনীতির মারপ্যাঁচে দরিদ্র মানুষ রক্ষা করতে পারছেন না বণ্টিত খাসজমি-জলা; মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে 'বৈরী অন্তর্ভুক্তকরণ'-এর শিকার হচ্ছেন; জোরদখলকারী জমি-জলাদস্যুরা সংগঠিত, কিন্তু দরিদ্ররা অসংগঠিত; ঘুষসহ অন্য অনেক বিধিবহির্ভূত ব্যয় করতেও দরিদ্ররা খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না (করেন কি?)– এসব কারণে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে খাসজলা-জমির বিষয়টি দরিদ্রদের জন্য এক ধরনের অভিশাপের বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। আবার বর্তমান কাঠামোতে যখন দেখি যে খাসজমির সুফলভোগীদের ৪৬ শতাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে– সেটা কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর হতাশার মধ্যেও কিছুটা আশার লক্ষণ। পুনর্বণ্টনযোগ্য বা বণ্টনযোগ্য কৃষিজমি ও জলা গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন করাটাই যেকোনো বিচারে যুক্তিসঙ্গত।

[৬৯] *কৃষি সংস্কার*-এর প্রকৃত অর্থ হলো কৃষিতে এমন ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদনসম্পর্ক (যার নির্ধারক জমি ও জলার মালিকানাসহ অভিগম্যতা কাঠামোর পরিবর্তন) পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষিতে শ্রেণিসম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তিকেন্দ্রিক। দরিদ্রদের মধ্যে খাসজমি-জলা বণ্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়, জমি-জলায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায্য ভোগদখল স্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক দুর্নীতি, ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ– এসবই এ দেশে কৃষি সংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়। আর, এ কথা বোধগম্য যে, আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া ভূমি-সংস্কার সম্ভব নয়। *'ভূমি আইন'* কেন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ? এ প্রসঙ্গে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জনক স্যার উইলিয়াম পেটির (১৬২৩-১৬৮৭) বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "ভূমি হলো সম্পদের জনক, আর শ্রম হলো তার জননী"।

ভূমি-সংস্কারের ফলাফল দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে ভূমি প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় চাই জন-মানুষের কাঠামোবদ্ধ-সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ: এজন্য স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ভূমি-অধিকারবিষয়ক সংগঠনকে পুরো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

এ দেশে একটি আশংকা থেকেই যায় যে, কোনো 'কমিশন' গঠন করা মানেই বিষয়টির 'অমিশন' ('বিলোপ' হয়ে যাওয়া অর্থে); তারপরও, আমাদের দাবি সরকারের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১'-এ 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার পূর্ণ বাস্তবায়ন।

গত চার দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ; ঘটেছে ভূমি মালিকানার পুঞ্জীভবন।[৭০] আবির্ভূত হয়েছে এক ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যুগোষ্ঠী। আর এসব দস্যু 'রেন্ট-সিকার'রাই আবার দুর্বৃত্তায়িত আর্থরাজনৈতিক রাষ্ট্রিক কাঠামোতে প্রবল প্রতিপত্তিশালীই শুধু নয়, তারা এখন ওই কাঠামোর নিয়ন্ত্রক। আর বড় পর্দায় দেখলে এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে এসব রেন্টসিকার দেশের বড় রেন্টসিকারদেরই প্রতিনিধি যারা আবার বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীনস্থ সত্তা। আমাদের দেশের চলমান দারিদ্র্য, আর ভূমিহীন, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা এবং অভিগম্যতাসংশ্লিষ্ট

[৭০] বিগত ৫০ বছরে এ দেশে যেমন ভূমিহীনতা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে ভূমির পুঞ্জীভবন। ১৯৬০ সালে এ দেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল মোট খানার ১৯ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে মোট খানার প্রায় ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে ১ শতাংশ ধনী ভূ-স্বামীর মালিকানায় ছিল মোট কৃষিজমির ৪.৭ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে হয়েছে ১২ শতাংশ (অবশ্য এসবই সরকারি হিসেব)। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ; অথচ তাদের হাতে আছে মোট জমির মাত্র ৪.২ শতাংশ। আর অন্যদিকে ভূমি মালিকানার মানদণ্ডে উপর তলায় অর্থাৎ ভূমি-ধনী হচ্ছে দেশের মোট পরিবারের ৬.২ শতাংশ পরিবার, যাদের মালিকানায় আছে দেশের কমপক্ষে ৪০-৪৫ শতাংশ জমি।

বাধাসমূহ তথা কৃষি-কৃষক ভাবনাসহ কৃষি-সংস্কার চলমান আর্থরাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। কাঠামোটিই এমন, যা কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন করে।

তবে, আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সবকিছুকে ছোট ক্যানভাসে—এক মাত্রায় দেখতে চাওয়া। আসলে, বর্তমানের 'অশোভন' সমাজ-বাস্তবতায় এটাই আমাদের আপাত আরাম-আয়েশ, এবং উন্নয়নের নামে যা কিছু দেখছি– তাকে নিশ্চিত করে। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে, বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরো মাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে।

এ বিষয়ে আমাদের শেষ কথা অনেকটা এ রকম:

> *"... সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দেখতে হবে বড় পর্দায়। মানুষকে দেখতে হবে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, উল্টোটা নয়। কিন্তু উল্টোটাই এতকাল আমাদের ভাবনাজগৎ ও কর্মকাণ্ড জগতে নিয়ামক-নির্ধারক ছিল। সে কারণেই 'শোভন' কোনো সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মিত হয়নি... একবিংশ শতকের এই সময়ে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের শিকার: আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতার নিরন্তর উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, যা অর্থনীতিতে অবশ্যম্ভাবী করেছে গভীর মহামন্দা (প্রথম ও প্রধান বিপর্যয়), রাজনীতি-সরকার থেকে ক্ষমতা অভিবাসিত হয়েছে (দ্বিতীয় বিপর্যয়), আর একই সময়ে ভাইরাসের (আপাতত কভিড-১৯) কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ হয়েছে গৃহবন্দী (তৃতীয় বিপর্যয়)। এসবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন অবস্থা যখন বড় পর্দার প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-আস্থা-সম্মানভিত্তিক নতুন এক জীবনব্যবস্থা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার চাহিদা অনিবার্য। এ পথে হাঁটা ছাড়া অশোভন পৃথিবী থেকে শোভন পৃথিবীতে উত্তরণ সম্ভব নয়। পথটা দেখাবে শোভন রাজনীতি।"*
>
> *—বারকাত (২০২০)*

তথ্যপঞ্জি

ইসলাম, সিরাজুল (তারিখ নেই), *লক্ষিরাজ বা লাখেরাজ*। বাংলাপিডিয়া। Retrieved from https://en.banglapedia.org/index.php?title=Lakhiraj

ইসলাম, সিরাজুল (২০১৪), *তালুকদার*। বাংলাপিডিয়া। Retrieved from https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0

ইসলাম, সিরাজুল ও আখতার, শিরীন (২০১৪), *জমিদার*। বাংলাপিডিয়া। Retrieved from https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0

এএলআরডি (২০১৯), *জমি-জমার কথা*। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৬৮), *রাজনৈতিক অর্থনীতি: পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা* (মূল গ্রন্থ রুশ ভাষায়)। মস্কো: মিস্‌ল প্রকাশনা।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৮০), *অর্থশাস্ত্র: পুঁজিবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

কেল্লে, ভ., ও কোভালসন, ম. (১৯৭৫), *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা— ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫), *অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়। Retrieved from https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/0112cd7e_3b7f_4959_b096_10d3312eb784/NonAgriculturalKhasLandManagement.pdf

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭), *কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। Retrieved from http://khas.khulnalsm.com/assets/nitimala/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF%20%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B8%20%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%20%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%A8

%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,%20%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AD.pdf

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০১), *জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়। Retrieved from https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/675e1ca9_df70_466b_8f48_5448c5195ac8/NationalLandUsePolicy2001.pdf

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৯), *সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়। Retrieved from https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/675e1ca9_df70_466b_8f48_5448c5195ac8/JalMohalNiti.pdf

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭), *স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়। Retrieved from https://minland.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/law/ceec39a3_2862_4653_9584_cb9c59b6beb2/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%20%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%20%E0%A6%93%20%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%96%E0%A6%B2%20%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8,%20%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD.pdf

গাইন, ফিলিপ (২০০৪ক), বন, বনবিনাশ এবং বনভূমিতে বিদেশী প্রজাতির আগ্রাসন। ফিলিপ গাইন (সম্পা.), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম।* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)।

গাইন, ফিলিপ (২০০৪খ), দেশীয় প্রজাতির নির্বিচার বিনাশ মধুপুর শালবন বিলীন হবার পথে। ফিলিপ গাইন (সম্পা.), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম।* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)।

গাইন, ফিলিপ (২০০৪গ), মধুপুর শালবনে আগ্রাসী প্রজাতি, অনারস ও কলার আক্রমণ থেকে পাকা দেয়াল তুলে বন রক্ষার উদ্ভট চেষ্টা করছে বনবিভাগ। ফিলিপ গাইন (সম্পা.), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম।* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)।

দেবনাথ, এন. সি. (২০০০), *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা।* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

দৈনিক সমকাল (২০২১, ফেব্রুয়ারি ০৭) চিম্বুকে হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদে ম্রোদের লংমার্চ। *দৈনিক সমকাল।* Retrieved from https://www.samakal.com/chittagong/article/210252041/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%82-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A

দ্য ডেইলি স্টার, (২০২১, মার্চ ০২)। চিম্বুক পাহাড়ে হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদে ম্রোদের সংহতি সমাবেশ। *দ্য ডেইলি স্টার।* Retrieved from https://www.thedailystar.net/bangla/node/208345

ঢাকা বন ঘোষণা (২০০১), *'বাংলাদেশে বন ব্যবস্থাপনা এবং ভূমির অধিকার' শীর্ষক কর্মশালা।* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)।

পার্থ, পাভেল (২০২১, জানুয়ারি ০৪), বিলাসবহুল হোটেল নয়, চিম্বুক পাহাড়ে স্কুল ও হাসপাতাল চাই। *দৈনিক সারাবাংলা।* Retrieved from https://sarabangla.net/post/sb-503043/

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, (২০২১, সেপ্টেম্বর), ভূমি অফিস। জলমহাল ইজারার প্রসেস ম্যাপ, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। Retrieved from http://acl.kalapara.patuakhali.gov.bd/site/office_process_map/3489c066-9067-405e-9b95-f8349a711060/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B2-

%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA

বারকাত, আবুল (১৯৮৪), "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান"। সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ঢাকা: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র।

বারকাত, আবুল (২০০৪), "বাংলাদেশের রাজনৈতিক– অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী-২০০৪*, পৃ. ৩-৩৮, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল (২০০৫), *দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গ: বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি*। বাংলাদেশ কনজুমার সোসাইটি। ঢাকা: আগস্ট ২, ২০০৫।

বারকাত, আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: *বঙ্গবন্ধু "বেঁচে থাকলে" কোথায় পৌঁছাতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাবতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৫খ), *বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (জাতীয় সেমিনার, ১১ এপ্রিল ২০১৫)।

বারকাত, আবুল (২০১৬ক), *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৬খ), বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। *অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা*। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগের আঞ্চলিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা। রাজশাহী: জুলাই ১৬, ২০১৬।

বারকাত, আবুল (২০১৭), *বাংলাদেশে, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক-অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৮), *অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৯), *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০২১), *নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ট সুযোগ-২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত—২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা*। ঢাকা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল, ও সোহ্‌রাওয়ার্দী, গা. মো. (২০১৯), *বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., জামান, শফিক উজ., এবং রায়হান, সেলিম (২০০৯), *বাংলাদেশে খাসজমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার।* ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল., সেনগুপ্ত, সুভাস. কুমার., এবং রহমান, ওবায়দুর (বাংলা অনুবাদ, ২০০৯), *বাংলাদেশে খাসজমির রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল, হক, কাজী এবাদুল, আহমেদ, এ. কে. এম. জহির., উল্লাহ, মো. রহমত, হেলাল-উজ-জামান, এ. কে. এম., চৌধুরী, টি. আই. এম. নুরুননবী, আহমেদ, কাওসার., সেনগুপ্ত, সুভাস. কুমার., এবং ওসমান, আসমার (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকার ভিত্তিক বিশ্লেষণ– প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খন্ড ১-১৩)।* ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

বেগম, সাহিদা (২০১৫), *সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল*, বাংলাপিডিয়া (অনলাইন সংস্করণ-বাংলা), ঢাকা।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় (১৯৭৪), *জলমহল ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য উন্নয়ন কমিটির বিবরণী*। Retrieved from https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/files/b83bb933_8c76_4769_b12d_1af51ebe8a36/Jalmahal-1974.pdf

ভূমি মন্ত্রণালয় (২০১৮-১৯), *বার্ষিক প্রতিবেদন (খসড়া)।* Retrieved from https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/annual_reports/d36babab_a938_4f0d_9591_4312ea143c93/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A7%A7%E0%A7%AF%20%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%20%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%20-%20%E0%A6%96%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%BE%20-%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0

%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87.pdf

মার্কস, কার্ল (১৯৮৩), *অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

মারমা, উসিথোয়াই (২০২০, নভেম্বর ৮), বান্দরবানে হোটেল নির্মাণ প্রকল্পে 'উচ্ছেদ শঙ্কায়' ম্রো জনগোষ্ঠী। *বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*। Retrieved from https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1824692.bdnews

মৃধা, সা. (২০১৯, জানুয়ারি ২৬), কেঁচো সার উৎপাদনে নারীরা। *প্রথম আলো।*

রঞ্জনা, শাহানা হুদা (২০২০, নভেম্বর ১৩), বাঙালির আনন্দের জন্য আর কতো পাহাড়ি উচ্ছেদ?। *দ্যা ডেইলি স্টার*। Retrieved from https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A6-185677

রঞ্জু, আহমদ মুসা (২০২০, মার্চ ১৪), খুলনা পাউবোর জমিতে দখলদার দুই হাজার। *দৈনিক যুগান্তর*। Retrieved from https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/288732/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0

রহমান, মোঃ. আনিসুর (২০০৮), বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার। হুদা, শামসুল (সম্পা.), *দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি, কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য* (পৃ. ৯-১৬)। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

শাহীন, সাইদ (২০১৮, এপ্রিল ০৩), ফল আবাদে শীর্ষে কলা। *বণিক বার্তা (বদ্বীপ)।*

হক, আমিনুল (এন.ডি), *ভূমি অধিগ্রহণ*, *বাংলাপিডিয়া* (অনলাইন সংস্করণ-বাংলা), ঢাকা। Retrieved from https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF_%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3

খুলনায় পাউবো'র জমিতে ২০৯৬ দখলদার (২০২০, সেপ্টেম্বর ০১), *বাংলা ট্রিবিউন*। Retrieved from https://www.banglatribune.com/640163/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%AF%E0%A7%AC-%E0%A6%A6%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0

ডুমুরিয়ায় পাউবোর জমি দখল করে মার্কেট নির্মাণ (২০১৫, ফেব্রুয়ারি ১০), *দৈনিক সমকাল*। Retrieved from https://samakal.com/print/1502117767/print

রূপগঞ্জে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ (২০২০, আগস্ট ৩১), *প্রথম আলো।* Retrieved from https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF

Abdullah, A. (1976). "Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh". *The Bangladesh Development Studies,* Vol. 4, No-1, January.

Capra, Fridjof (1988). *The Turning Point: Science, Society, and the Raising Culture.* Toronto/ Nework/ London/Sydney/Auckland: Bantam Books.

Laws of Bangladesh (n.d.). *The Trust Act, 1882.* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-47.html

Laws of Bangladesh (n.d.). *The Chittagong Hill-tracts Regulation, 1900.* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1313.html

Laws of Bangladesh (n.d.). *The Charitable and Religious Trusts Act, 1920.* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-119.html

Laws of Bangladesh (n.d.). *The State Acquisition and Tenancy Act (East Bengal Act), 1950.* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-241.html

Laws of Bangladesh (n.d.). *The Waqf Ordinance, 1962 (East Pakistan Ordinance).* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-326.html

Laws of Bangladesh (n.d.). *Acquisition and Requisition of Immoveable Property Ordinance, 1982.* Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-619.html

Barkat, A., Zaman, S., & Raihan, S. (2001). *Political Economy of KHAS Land in Banglad*esh, Dhaka: Association for Land Reform and Development.

Barkat, A., & ROY, P. K. (2004). *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage.* Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Ghosh, P. S. (2011). *Commercialization of Agricultural Land and Water Bodies and Disempowerment of Poor in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A., Hoq, K. E., Ahmed, A. K. M. J., Ullah. M. R., et.al. (2014). *Land Laws in Bangladesh: A Right-based Analysis and Suggested Changes*

(in 22 vol.). Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) & Manusher Jonno Foundation (MJF).

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Osman, A. (2015). *Increasing Commercialisation of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., Osman, A., Sarker, N. U., & Sobhan, A. (2016). *Capacity Assessment of Land Administration and Management in Bangladesh: Critical Reflections on Institutional Processes, Capabilities and Gaps.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) & Manusher Jonno Foundation (MJF).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). Khas Land: The Denial of Access. In A. Barkat (Ed.), *Bangladesh Land Status Report 2017: Land grabbing in a rent-seeking society*. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.

Blaug, M. (1997). *Economic theory in retrospect* (5th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Chang, Ha-Joon. (2014). *Economics: The User's Guide*. London: Pelican *an imprint of* Penguin Books.

Charles, G. and Rist, C. (1948). *A History of Economic Doctrine (2nd ed.)*. London: George G. Harrap & Co Ltd.

Chowdhury, A. M., Hakim, A., and Rashid, S.A. (1997). "Historical Overview of the Land System in Bangladesh". *Land.* vol. 3, no. 3. Philippines, Manila: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development.

Dale, P., Mahoney, R., and McLaren, R. (2007). Land Markets and the Modern Economy.UK: RICS.

Deane, P. (1989). *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University.

Herrera, A. (2016). *Access to Khas Land in Bangladesh: Discussion on the Opportunities and Challenges for Landless People, And*

Recommendations for Development Practitioners. Essay on Development Policy, NADEL MAS-Cycle 2014-16.

Hossain, T. (1995). *Land Rights in Bangladesh: Problems of Management*. Dhaka: The University Press Limited.

Kozlov, G. A., (Ed.). (1977). *Political economy: Socialism*. Moscow: Progress Publishers.

New buildings on acquired land (2015, March 20). *Dhaka Tribune.* Retrieved from https://www.dhakatribune.com/uncategorized/2015/03/20/new-buildings-on-acquired-land-for-added-compensation

Nikitin, P. I. (1983). *The fundamentals of political economy*, (J. Sayer, trans.). Moscow: Progress Publishers.

Raihan, S., Fatehin, S., and Haque, I. (2009). Access to Land and Other Natural Resources by the Rural poor: The Case of Bangladesh. Dhaka: SANEM.

Roll, E. (1992). *A history of economic thought.* London: Faber and Faber Limited.

Ryndina, M. N., Chernikov, G. P., & Khudokormov, G. N. (1980). *Fundamentals of political economy.* Moscow: Progress Publishers.

Ryndina, E. A. (1978). *Political economy of capitalism.* Moscow: Progress Publishers.

Siddique, K. (1997). *Land Management in South Asia: A Comparative Study*. Dhaka: The University Press Limited.

Sobhan, R. (1993). *Agrarian reform and social transformation: Preconditions for development.* Dhaka: The University Press Limited.

UKEssays. (2015). *Different Jolmohals and There Locations Environmental Sciences Essay*. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/different-jolmohals-and-there-locations-environmental-sciences-essay.php?vref=1

Yusuf, A. (Eds.) (2011). *Agriculture of Bangladesh−Capitalistic or Semi-Feudalistic (In Bangla)*. Dhaka: Pathok Shamabesh.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: গবেষণাধীন ভূমি আইন ও নীতিমালাসমূহ

পরিশিষ্ট ২: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত পূর্বের গবেষণানির্ভর সংশ্লিষ্ট আইনি প্রস্তাবনাসমূহ

পরিশিষ্ট ৩: তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

পরিশিষ্ট ৪: এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষণাদল

পরিশিষ্ট ১

গবেষণাধীন ভূমি আইন ও নীতিমালাসমূহ

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭

রেজিস্টার্ড নং-ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

[অতিরিক্ত সংখ্যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৮
বিজ্ঞপ্তি

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬১-কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকার নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন । এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ
সচিব।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬০, তারিখ, ৩-১-১৪১৪ বাং/১৬-৪- ১৯৯৭ খ্রী

বিষয়: কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা।

১.০ ভূমিকা:

১.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের সরকারী খাসজমি আছে। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা বিগত ৮ই মার্চ ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট-এর মাধ্যমে জারী করা হইয়াছে। বর্তমানে এই নীতিমালা অনুযায়ী অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতেছে। অপরদিকে দেশের প্রতিটি জেলায়ই কম-বেশি কৃষি খাসজমি রহিয়াছে। ১৯৭২ সাল হইতেই সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া আসিতেছিল। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়ে সর্বশেষ ১৯৮৭ সালের ০১লা জুলাই তারিখে একটি নীতিমালা জারী করা হইয়াছিল। এই নীতিমালায় কৃষি খাসজমি কেবলমাত্র ভূমিহীনদের মধ্যেই বিতরণের কার্যক্রম বহুপূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু ইহা একটি ব্যাপক ও জটিল কার্যক্রম বিধায় সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উহার সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

১.২ এইদিকে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অনিয়ম সংগঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া বিভিন্ন সময়ে কৃষি খাসজমি বণ্টনের ফলে সর্বত্রই বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহার ফলে কৃষি খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জটিলতার উদ্ভব হইতেছে বলিয়া সারাদেশ হইতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া যায়। তাই প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি সুষমভাবে বণ্টনের লক্ষ্যে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি/পরিবারকে জমি প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সেই কারণে বর্তমান সরকার বিগত ১৩-৮-১৯৯৬ খ্রীঃ তারিখে জারীকৃত এক আদেশের মাধ্যমে কৃষি খাসজমি বণ্টন স্থগিত রাখেন।

১.৩ সময়ের বিবর্তনে এবং জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই নীতিমালার আওতায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত বাকী ৬১টি জেলার বন্দোবস্তযোগ্য সকল কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

২.০ (ক) এই নীতিমালা জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(খ) এই নীতিমালা জারীর পর হইতে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, পরিপত্র, স্মারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

[(গ) "এই নীতিমালা জারীর পূর্বে প্রচলিত নিয়মনীতি মোতবেক খাস কৃষি জমির যে সকল বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকিবে। তাছাড়া পূর্বের নীতিমালার আওতায় যে সকল বন্দোবস্ত কেস জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৩-৮-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইয়াছে কিন্তু কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করা হয় নাই, সেই সকল কেসও বহাল থাকিবে এবং কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। এমন কেসসমূহ বর্তমান নীতিমালা ও উহার সংশোধনী মেতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে। তবে ১৯৭২ইং সালের পর বিধিবহির্ভূতভাবে যদি কোন কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া থাকে, সেই বন্দোবস্ত কেস সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উহার প্রমাণাদির ভিত্তিতে থানা কমিটি, জেলা কমিটির নিকট বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে এবং জেলা কমিটি উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে"।][৭১]

৩.০ ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে তদারকির জন্য একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলা পর্যায়ে একটি জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থানা পর্যায়ে কৃষি খাসজমি

---

[৭১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-২৮১এর১ অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করা হইল। এই সকল কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি/দায়িত্ব নিম্নরূপ:

(ক) [জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির গঠন:

সভাপতি

(১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি

(২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(৩) ঢাকা বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ

(৪) চট্টগ্রাম বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট হারুন-আল-রশিদ

(৫) রাজশাহী বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান

(৬) খুলনা বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ মোজাম্মেল হক

(৭) বরিশাল বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল

(৮) সিলেট বিভাগ হতে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব দিলদার হোসেন সেলিম

(৯) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(১০) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

(১১) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

(১২) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

(১৩) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

(১৪) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড

(১৫) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(১৬) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড

(১৭-২২) ৬টি বিভাগের ৬জন বিভাগীয় কমিশনার

(২৩) জাতীয় পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জনাব শামসুজ্জামান দুদু

(২৪) জাতীয় পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে এডভোকেট একলাক হোসেন

সদস্য-সচিব

(২৫) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়][৭২]

(খ) জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) এই কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

---

[৭২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারকনং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-১১০৪এরক অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(২) এই কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

(৩) কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও বরাদ্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হইবেন।

৪.০ **জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটিঃ**

উপদেষ্টা ঃ একজন সংসদ সদস্য

(ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫))	জেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী আফিসার	সদস্য
(৮)	জেলা কৃষক সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৯)	জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১০)	জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব][৭৩]

(খ) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জেলা কৃষি খাসজমির বরাদ্দ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উহার বিধিমালা প্রচার।

(২) থানা কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচী অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের প্রস্তাব অনুমোদন ও থানা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকী।

(৩) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি সংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) কমিটি প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হইবেন এবং জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৫.০ [**উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটিঃ**

উপদেষ্টা ঃ (ক) সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)

(খ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (ভবিষ্যতে নির্বাচিত হইলে)

---

[৭৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারকনং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩এর (ঘ)অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জকর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	চেয়াম্যান, ইউ, সি, সি, এ	সদস্য
(৮)	ইউ, পি, চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)	সদস্য
(৯)	বিত্তহীন সমবায় সমিতির ১ জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১০)	উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় সৎ, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কার্যে উৎসাহী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিবেন)।	সদস্য
(১২)	স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের প্রধান (একজন) (জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিবেন)।	সদস্য
(১৩)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৪)	একজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৫)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব][৭৪]

(খ) থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি:

(১) থানার আওতাধীন এলাকার কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারকরণ।

(২) উদ্ধারকৃত কৃষি খাসজমিকে নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুবিধার্থে প্লটে বিভক্তিকরণ।

(৩) সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) ভূমিহীনদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ।

(৫) প্রাপ্ত দরখাস্ত বাছাই এবং নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

(৬) নির্বাচিত ভূমিহীনদের জন্য খাস প্লটে বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

(৭) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিহীনকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।

---

[৭৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারকনং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩এর (ঘ) অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(৮) বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করিতেছে কিনা, কেহ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করিতেছে কিনা সেই সম্পর্কে তদারকী ও শর্তভংগ করিলে জেলা প্রশাসকের নিকট বিধিভঙ্গ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

৬.০ ভূমিহীনদের বাছাই প্রক্রিয়া :

(ক) ভূমিহীনগণ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

(খ) সদস্য-সচিব প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করিবেন।

(গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসহ থানা কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হইবেন। এই সময় আবেদনকারীদেরকে কমিটির সামনে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করিবেন।

(ঘ) প্রাথমিক বাছাই-এর পর থানা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সঠিকতা যাচাই করিবেন এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করিবেন।

(ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বার/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি ফটো জমা দিতে হইবে এবং আবেদনপত্রে তাহার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(চ) আবেদনের সহিত স্থানীয় ইউ.পি. চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিত্ব সার্টিফিকেট জমা দিতে হইবে।

(ছ) একান্নভুক্ত একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেয়া যাইবেনা।

(জ) জমি স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথ নামে প্রদান করা হইবে।

(ঝ) ["কোন পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) একর জমি দেওয়া হইবে। তবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য খাসজমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১.৫০ (দেড়) একর পর্যন্ত জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। উপকূলীয় জেলাসমূহ হইল: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানা এবং কক্সবাজার জেলার সদর, কুতুবদিয়া মহেশখালী, টেকনাফ ও চকোরিয়া থানা"।][৭৫]

[(ঙ) চরাঞ্চলের কৃষি খাসজমিতে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া যাইবে।][৭৬]

৭.০ বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। কেহ এইরূপ করিলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হইবে।

---

[৭৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূ:/ম: শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৫ অনুচ্ছেদবলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-১১০৪-এর (ঘ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

৮.০ ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনের বিষয়ে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির নিকট অভিযোগ করিতে হইবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে কোন অনিয়মের প্রমাণ পাইলে সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত কেস বাতিল করিবেন এবং এই বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিবেন।

৯.০ কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা:

বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ই মার্চ/১৯৯৫ খ্রীঃ তারিখে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সকল খাসজমি কৃষি খাসজমি হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর এলাকাভুক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১০.০ ভূমিহীন পরিবার:

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

[(খ) "যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এইরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভুমিহীন হিসাবে গণ্য হইবে"।][৭৭]

১১.০ ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা:

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

(খ) নদী ভাংগা পরিবার (যাহার সকল জমি ভাংগিয়া গিয়াছে)।

(গ) সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার।

(ঘ) ["কৃষি জমিহীন ও বাস্তুবাটিহীন পরিবার"।][৭৮]

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছে এমন পরিবার।

["চ) ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এইরূপ কৃষি নির্ভর পরিবার।"][৭৯]

১২.০ (ক) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করিতে হইবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

---

[৭৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃ/মঃ শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৬ অনুচ্ছেদবলে সংযোজিত।

[৭৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃ/মঃ শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৭ অনুচ্ছেদবলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃ/মঃ শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৮ অনুচ্ছেদবলে সংযোজিত।

(গ) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩.০ (ক) কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে থানা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত করিবেন এবং উহার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং এই মর্মে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত কোন জমি সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে থানা কমিটির নিকট আপত্তি পেশ করিতে হইবে। থানা কমিটি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সকল আপত্তি সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(গ) থানা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট আপীল করা যাইবে। জেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করা যাইবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.০ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রার্থী ভূমিহীনদের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

১৫.০ আবেদনপত্র প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে থানা কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

১৬.০ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক ভূমিহীন বাছাই ও জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বন্দোবস্ত কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক প্রস্তাব থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

১৭.০ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাব পাওয়ার (২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৮.০ জেলা প্রশাসক প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা কমিটিতে পেশ করিবেন এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

১৯.০ ["অনুমোদিত প্রস্তাব ৫ ফেরত পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে এক টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করিয়া দিবেন, রেজিষ্ট্রেশন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন এবং বন্দোবস্ত

প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলিয়া দিবেন।"][৮০]

২০.০ কবুলিয়ত সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে থানা কমিটি বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত জমির দখল বুঝাইয়া দিবেন।

২১.০ ["কোন মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে। ঐ মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের পর আরও জমি থাকলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী উপজেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে। এই ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন"।][৮১]

২২.০ ভূমিহীনদের মধ্যে কৃসি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে থানার বড় বড় হাট-বাজারে লোক সমাগমের দিনে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। থানা নির্বাহী অফিসার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

২৩.০ থানা পর্যায়ের সকল সরকারী/আধা সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ-এর নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে নোটিশ টানাইতে হইবে।

২৪.০ প্রকৃত ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা দিলে সভাপতি বাদে উপস্থিত সকল অফিসিয়াল ও নন-অফিসিয়াল সদস্যদের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে সভাপতি নির্ণায়ক (কাষ্টিং) ভোট দিবেন।

২৫.০ ভূমিহীনদের নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে।

২৬.০ বনভূমি হিসাবে নোটিফিকেশনকৃত খাস কৃষি জমি ও চিংড়ী ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

২৭.০ ["নদী পয়স্তি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ চর্চা ম্যাপের সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইয়া তাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে উক্ত কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সকল জমির যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করিতে হইবে। দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত বন্দোবস্ত কেসসমূহ সমন্বয় করিতে হইবে। তবে উক্ত কার্যক্রম ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ করিতে হইবে।"][৮২]

২৮.০ আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত খাস কৃষি জমি এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। বর্তমানে আদর্শ গ্রাম সৃজনের জন্য অনুসৃত নীতিমালা/বিধি মোতাবেক অনুরূপ জমিতে আদর্শ গ্রাম সৃজন/প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

---

[৮০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-২৮১এর ২ অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত।

[৮১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারকনং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-১/৯৮-৩৬১এর ১ অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

[৮২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-২৮১এর ৩ অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

২৯.০ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোন ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্রে কোন ভুল তথ্য উপস্থাপন করিলে কিংবা কোন তথ্য গোপন করিলে তাহাদের আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রয়োজনে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩০.০ বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোন বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমি সংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লংঘন করিলে তাহার বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে থানা ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করিবেন।

৩১.০ এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাস কৃষি জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট লিখিত আকারে উপস্থাপন করিবেন। সদস্য-সচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করিবেন এবং এই ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২.০ সকল কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট কমিটির অন্তত ১/৩ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভায় কোরাম হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্য পদ বাতিল বা প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

৩৩.০ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত গঠিত কমিটিগুলো সর্বদা পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন।

৩৪.০ জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে জনস্বার্থে এই নীতিমালার যে কোন ধারা/উপ-ধারা সংশোধন কিংবা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫

রেজিস্টার্ড নং-ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৮
বিজ্ঞপ্তি

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৫- অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকার নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন । এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

বিষয়: অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা
নং ভূম:/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৪, তারিখ, ৭ই মার্চ, ১৯৯৫/২৩শে ফাল্গুন, ১৪০১

১.০ ভূমিকা:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের একটি নীতিমালা আছে। কিন্তু অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের কোন নীতিমালা না থাকায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরিয়া বন্ধ আছে। ফলে শহরাঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোন না কোনোভাবে প্রভাবশালী মহলের লোকজনের অবৈধ দখলে চলিয়া গিয়েছে এবং তাহারা দখলের সমর্থনে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজ-পত্র তৈরী করিয়া আদালত হইতে ডিক্রী লাভ করিতেছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তাই অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োজন। এই নীতিমালায় খাসজমি বলিতে কেবলমাত্র জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডকৃত সরকারি খাসজমি বুঝাইবে। অন্য কোন সংস্থা বা বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত সরকারি জমি বুঝাইবে না। পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে বনায়নের জন্য যে সকল জমি প্রয়োজন হইবে তাহা বন আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী বন ও ভূমি হিসেবে গেজেট নোটিফিকেশনকৃত জমি এবং বন আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী "রক্ষিত বনভূমি" হিসাবে ঘোষিত জমি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। অধিকন্তু এই ধরনের কেইস ভূমি মন্ত্রণালয় এর নীচে কোনো পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা হইবে না। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করিতে গিয়া যদি কোথাও কোনো জমি সম্পর্কে কোনো সরকারি সংস্থা বা বিভাগের সাথে জমি মালিকানা বা দখলগত বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিমত থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিভাগের সাথে আলোচনা ক্রমে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই নীতিমালার আওতায় উক্ত জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

২.০ সংজ্ঞা:

(ক) **অকৃষি খাসজমি:** দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী শহরাঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই সকল এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমি ও অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সকল জমি অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(খ) **থানা সদর:** যে সকল থানা সদরে পৌরসভা আছে সে সকল থানার ক্ষেত্রে পৌরসভার এলাকা এবং অন্যান্য থানার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে থানা সদর এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে। জেলা প্রশাসকগণ এই নীতিমালা জারীর তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সকল থানা সদরের সীমানা চিহ্নিত করার কার্য সম্পাদন করিবেন। অবশ্য পরবর্তীতে যদি কোন থানা সদরে পৌরসভা

প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ হইতে পৌরসভা এলাকাকেই ঐ থানার থানা সদর হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

(গ) **বাজার দর:** প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই বাজার দর হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৩.০ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের নীতিমালা:

(ক) সরকারি প্রয়োজনে যে কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ধর্মীয় উপসনালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট স্থাপনের জন্য পরিমাণ মত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিমাণ মত জমি নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধভাবে পুনর্বাসিত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোন প্রয়োজনে না লাগিলে দখল বিবেচনায় আনিয়া পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ধরনের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(ঙ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন।

(চ) প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় এর মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ভবন হইতে হইবে) এর জন্য জমি বন্দোবস্ত নিতে চান তাহা হইলে তাহাদিগকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং জেলা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ একর পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদেরকে জমির সমুদয় মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহাদের দলে একই পরিবারের একজনের বেশি সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

(ছ) শহর এলাকার বাহিরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী যদি মোট প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ নিজে সংগ্রহ করেন তাহা হইলে সর্বোচ্চ ১/৪ অংশ পরিমাণ সংলগ্ন খাসজমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(জ) অন্ততঃ ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিত ভাবে সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে জমি দখলে আছেন এমন লোকদেরকে সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ঝ) যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল জমির মূল মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় না করিয়া বাজার দরে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৮ (আট শতাংশ) জেলা ও থানা সদরে এবং পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এবং ইহার বাহিরে এলাকায় সর্বোচ্চ ০.৩২ একর (বত্রিশ শতাংশ) জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ তাহার নিকট হইতে অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেক অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে না। তবে কাহাকেও শহর এলাকায় মোট ০.০৪ একর (চার শতাংশ) এবং পল্লী এলাকার ০.১০ একর (দশ শতাংশ) অপেক্ষা কমও দেওয়া হইবে না। তাহা ছাড়া যেহেতু বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির পূর্বতন মালিক সেহেতু তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজনকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।

(ঞ) মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলা শহরের বাহিরে গবাদিপশু বা দুগ্ধ খামার এবং হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হইতে হবে। হাঁস-মুরগীর খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর ও দুগ্ধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। বন্দোবস্ত প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। প্রথম ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরোপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই জমি পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। তবে প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় পরিত্যক্ত হইলে বা বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

যদি কেহ নিজ জমিতে হাঁস-মুরগীর খামার বা দুগ্ধ খামার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে তাহার খামার সংলগ্ন খাসজমি উপরোক্ত নিয়মে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ট) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য সরকারি খাস পুকুর দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০.০ একর আয়তনবিশিষ্ট পুকুর নিবন্ধনকৃত সমবায় বা ব্যক্তিমালিকানাধীন (প্রাইভেট লিমিটেড) কোম্পানীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০.০ একর এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে কোন আয়তনের খাস পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরাপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী

বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত বন্দোবস্ত গ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। কিন্তু প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় পরিত্যক্ত হইলে বা যথাযথভাবে পরিচালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।

(ঠ) বিদেশী বিনিয়োগকারীকে অথবা যৌথ উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প অনুপাতে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের হোটেল/মোটেল (তিন তারকা ও তদুর্ধে) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ড) কারখানা ও বাড়ী সংলগ্ন খাসজমি আছে এবং এই খাসজমির অবস্থান এমন যে উহা অন্য কাহাকেও বন্দোবস্ত প্রদান করিলে বাড়ী বা শিল্প কারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি যাহাই হোক না কেন বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইরূপ বন্দোবস্ত কেসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পাদন করিয়া এবং প্রচলিত নিয়মে সেলামী ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।

(ঢ) কমপক্ষে ২০ বৎসর বা তদুর্ধকাল যাবৎ সরকারি/আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ৩০ জন বা তদুর্ধসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারি/আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য যে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর এবং জেলা বা থানা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন সরকারি/আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কমচারী/কর্মকর্তাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে ধার্য্যকৃত সেলামী আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(ণ) কমপক্ষে ১৫ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর এবং জেলা বা থানা সদরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ

কোন মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে বা বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে ধার্যকৃত সেলামী আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(ত) (i) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ (পাঁচ) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ii) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫.০ (পনের) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(iii) রাবার চাষের জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে সর্বোচ্চ ৩০.০ (ত্রিশ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০০.০০ (একশত) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(iv) উপরোক্ত (i), (ii), ও (iii) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি বন্দোবস্ত প্রদানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে। তবে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।#

(থ) উপরোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শহর এলাকার খাসজমি নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(দ) খাস খতিয়ান রেকর্ডভুক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়:প্রণালী, পুকুর, বাঁধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ ও ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরের এলাকাধীন জমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবে না। এইগুলি জমির শ্রেণী পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা সাপেক্ষে স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত সংরক্ষণীয় তালিকার অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। হাট-বাজারের জমিও এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্তযোগ্য হইবে না।

(ধ) পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থার কোন রূপান্তর না করার শর্তাধীনে উৎপাদনশীল কার্যে ব্যবহারের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

৪.০ **প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত কার্যক্রম:**

(ক) নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় ছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) জেলা শহরে ০.০৮ একর (আট শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ, থানা সদরে ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ এবং ইহার বাহিরের ০.৩০ একর (ত্রিশ শতাংশ)-এর উর্ধ্ব পরিমাণ জমি বন্দোবস্তের সকল প্রস্তাবে ভূমি সংস্কার বোর্ড হইতে অনুমোদন দেওয়া হইবে। ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে নীতিমালার অধীনে

বন্দোবস্ত কেইস বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত হইবে। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

৫.০ **যে সকল কারণে বন্দোবস্ত বাতিল হইবে:**

(ক) জমি যে উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে তাহা বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে।

(খ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

(গ) ভূমি সংক্রান্ত সরকারি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ লংঘন করিলে।

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হইলে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলেও বন্দোবস্ত বাতিল এবং প্রদত্ত কিস্তির টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

(ঙ) বন্দোবস্ত গ্রহণের পর কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখা বা শর্ত ভঙ্গের ঘটনা প্রকাশ হইলে বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত বাতিল ও প্রদত্তমূল্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬.০ কোন খাসজমি দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে সেই জমির জন্য জেলা প্রশাসক আলাদা একটি খতিয়ান খুলিবে। সেই খতিয়ানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকের নাম এবং জেলা প্রশাসকের নীচে বন্দোবস্ত প্রাপকের নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্তের ফলে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিতে হইবে। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত তথ্যাবলী বন্দোবস্ত দলিলে ও খতিয়ানে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭.০ বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির দখল প্রদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত হারে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮.০ বন্দোবস্তকৃত জমি সম্পর্কে উদ্ভূত যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯.০ এই নীতিমালা প্রণয়নের পর হইতে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত পূর্বের সকল নীতিমালা সার্কুলার, স্মারক, নির্দেশ ইত্যাদি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ইতিপূর্বে বলবৎ নীতিমালা সার্কুলার ইত্যাদি বলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বৈধ বন্দোবস্ত আদেশ বহাল থাকিবে। এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ আইন ও বিধি সকল সময়ে উহার উপর কার্যকর হইবে।

১০.০ প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র নীতিমালার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের সার্বিক এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকিবে।

১১.০ প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র নীতিমালার অন্যান্য সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে। রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য এই জেলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারি নির্দেশনা কার্যকর হইবে।

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

তারিখ, ২৩ জুন ২০০৯
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

নং ভুঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(জল)/২০/২০০৯-১৯১ দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' প্রণয়ন করেছেন।

২. **প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞাঃ**

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধাণতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মংস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মংস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

(গ) জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

৩. **সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহালঃ**

(ক) সমঝোতা স্বারকের (MOU) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্বারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্বারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি

মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এ সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের 'জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৫৩১/০০০০/১২৬১' কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০ বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি দিবেন।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারেন সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পের ন্যস্তকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দু'বছর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাংখিত সুফল দিতে না পারেন, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঙ) প্রকল্পভুক্ত কিংবা প্রকল্প বহির্ভূত কোন জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

৪. ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ যুব সম্পদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতিপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের (১৮-৩৫ বৎসর পর্যন্ত) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

৫. 'জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি' কর্তৃক ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

'জাল যার জলা তার' এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবেঃ

(১) নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপাজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

(২) নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মংস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিসমূহ তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহালসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

(৪) (ক) ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ-আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিলসহ) তৈরি করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এর উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে এর কম মূল্যে কোন সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্য না পাওয়া যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহালসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির নিকট জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি একটি দৈনিক পত্রিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবেন। আবেদন আহবানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন বলে উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) এই নীতিতে উল্লেখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা কমিটি সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল-এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

(ঙ) আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরুপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনত্রের সংগে দাখিল করবেন এবং সাথে ৩ (তিন) বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

(চ) স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী, সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

(ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই-এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি-এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসবে আবেদনকারী তাঁর আবেদনের সাথে দখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

(ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটি মাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সে সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

(ঞ) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ট) কোন কারণে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবেন। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-ক) যার মূল্য হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এই অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১) জমা করতে হবে।

(ঢ) লীজ গ্রহিতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

(৫) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

(ক)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(ঘ)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(ছ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(জ)	উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(ঝ)	বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য
(ঞ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(ট)	জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ণ)	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)	সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ ন্যূনতম পাঁচ সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এই সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তাঁর অধীনস্ত যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যে জেলায় অধিক হবে সে জেলার উপর উল্লিখিত সকলকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন। জেলা

জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া রয়েছে তা পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

(৭) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

(৮) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

(৯) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(১০) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরতপাঠাবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকে তবে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবেন। ভূমি আপিল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(১১) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে 'জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১' নং কোডে জমা করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। জামানতের অর্থ শেষ বছরের মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরসমূহের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৬. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা

উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন হবে নিম্নরূপঃ-

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
(খ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	সদস্য
(ছ)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(জ)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যন	সদস্য
(ঞ)	অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ট)	স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঠ)	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	উপজেলা পর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাই, সে উপজেলায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আহ্বায়কসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

(২) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী ঃ

(ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালে ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এই নীতি অনুসারে ৫নং ক্রমিকের (১), (২), (৩), (৪) ও (১১) এ বর্ণিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দিবেন।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি ৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করবেন। কোন জলমহাল

একাধিক উপজেলা সংশ্লিষ্ট হলে, বেশির ভাগ জলমহাল যে উপজেলায় অবস্থিত সে উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যে উপজেলায় ও উপজেলাসমূহে অবস্থিত হবে সে সকল উপজেলা/ উপজেলাসমূহের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসেবে সংযুক্ত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলির কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(ঘ) যে সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে, সেগুলো ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা;

(ঙ) জেলার জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিদা তথ্য/মতামত/ সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;

(চ) জরীপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা (ছবি সহ);

(ছ) উপজেলা ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপরিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি /প্রতিষ্ঠান দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

(৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায়/সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল নিস্পত্তি করবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় কমিশনার ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিস্পত্তি করবেন।

(৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

৭. উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ

জলমহাল ৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে):

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;

(গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;

(ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;

(ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা;

(চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।

(২) 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহয়তায় উল্লিখিত ৭(১) ক্রমিকের তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন দুই মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এরপরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এই নীতি, ২০০৯ জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবেন। উক্ত টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ইজারা প্রদানের জন্য এই নীতিতে উল্লিখিত ৭(১), ৭(২), ৭(৩) ও ৭(৪) ক্রমিকের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪ (চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য

একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এই কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপঃ

(ক)	মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
(খ)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	উপ সচিব (প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা-১/৪৬৩১/০০০০ /১২৬১ নং কোডে) জমা প্রদান করবেন। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়া দিবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলির ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। নির্ধারিত তারিখের যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোনো অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এনং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) কোনক্রমেই কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১ (এক)টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই 'মা' মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

৮. আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ "জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১" নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০ বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার-এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৯. ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছরে কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারকৃত জলমহালসমূহ তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবেন। সে ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবেন।

১১. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

১২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবেন।

১৩. ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোর ইজারা চুক্তির কোন শর্তে লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. এই নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ আগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পযন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোন সময় বৃদ্ধির করা যাবে না এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হবার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

১৫. নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না:

(ক) গুচ্ছগ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রায়ন প্রকল্প/অনুরুপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;

(খ) অর্পিত এবং পরিত্যাক্ত জলাশয়সমূহ;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;

(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান, পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ;

১৬. কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল (২০ একরের উর্ধ্বে বা ২০ একর পর্যন্ত) নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহবান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দিবেন এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করাবেনঃ

(ক)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সভাপতি
(খ)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
(ঘ)	উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য

উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় 'মা' মাছ নিধন করা যাবে না

১৭. দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণের এবং এতৎসংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্লাটফরমে ব্যবহার্য সফটওয়ার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরি ও সফটওয়ার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

১৮. (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলের জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃ ইজারার ব্যবস্থা করবেন।

(খ ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতারা সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতারা কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল

অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৯. সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্যবিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

২০. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তায় জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাল নাগাদ করা হবে।

২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২২. যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৩. সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

২৪. সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

২৫. মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে 'সংরক্ষিত' (Reserved) জলমহাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

২৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭. বদ্ধ বা উন্মুক্ত, কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৮. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবেন যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা

যায়। এইরূপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত তিন বছরের ইজারার গড় মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২৯. উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরূপ স্থান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন- মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং 'মা' মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সংগতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এই হার নির্ধারণ/পুণঃনির্ধারণ করবেন।

৩০. জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। এই কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/নিবন্ধিত এনজিও/জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৩১. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান করবেন।

৩২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৫-এর আলোকে ইজারাধীন যে সব জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি সেসব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কিনা তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কিনা, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কিনা এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লীজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৩. সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদান ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে ঃ

মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য

সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণলয়	সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৩৪. জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩৫. এই নীতিতে যাই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সচিব।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৬ আশ্বিন, ১৪২৪/২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৬ আশ্বিন, ১৪২৪ মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:

২০১৭ সনের ২১ নং আইন

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "অধিগ্রহণ" অর্থ ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ;

(২) "আরবিট্রেটর" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো আরবিট্রেটর;

(৩) "কমিশনার" অর্থে বিভাগীয় কমিশনার এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) "জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প" অর্থ সরকার কর্তৃক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত কোনো প্রকল্প;

(৫) "জেলা প্রশাসক" অর্থে জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৬) "দেওয়ানি কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908);

(৭) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৮) "প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা" অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবকারী সরকারি বা বেসরকারি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা;

(৯) "মালিক" অর্থে কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ও বৈধ দখলকারও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১০) "যৌথ তালিকা" অর্থ অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির উপর বিদ্যমান স্বত্ব বা অধিকার এবং উহার উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজিসহ সকল বিষয়ের বিবরণ সংবলিত তালিকা;

(১১) "স্থাবর সম্পত্তি" অর্থ কোনো ভূমি এবং উহাতে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনো কিছুর স্বত্ব বা অধিকার;

(১২) "স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তি" অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের দাবিদার বা দাবি করিবার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(১৩) "হুকুম দখল" অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অধিগ্রহণ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারি

৪। (১) জেলা প্রশাসকের নিকট কোনো স্থাবর সম্পত্তি জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে উল্লিখ করিয়া উক্ত সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে, নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, নোটিশ জারি করিবেন।

(২) বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (১) এর অধীন -

(ক) নোটিশ জারির পূর্বে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি এবং উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজিসহ সকল কিছুর ভিডিও ও স্থিরচিত্র অথবা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণ করত উহাদের বিবরণী প্রস্তুত করিবেন; এবং

(খ) নোটিশ জারির পর, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা এবং স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত যৌথভাবে একটি যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৪) বাস্তবে কোনো জমির রেকর্ডিয় শ্রেণি পরিবর্তিত হইলে জেলা প্রশাসক, যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালে, উক্ত শ্রেণি পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৫) অবৈধভাবে লাভবান হইবার নিমিত্ত অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোনো ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হইয়াছে কিনা বা নির্মাণাধীন কিনা তাহা, জেলা প্রশাসক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যৌথ তালিকায় উল্লেখ করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকা স্থানীয় ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং প্রকল্পের সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর, উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের পর, অসদুদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘরবাড়ি বা অবকাঠামোর দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তন জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।

(৮) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৯) কমিশনার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (৮) এর অধীন প্রাপ্ত আপিল শুনানি করিবেন এবং পরবর্তী ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) উপ-ধারা (৯) এর অধীন কোনো আপিল নিষ্পত্তি হইলে অথবা উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপিল করা না হইলে, পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি হইতে সকল অবৈধ ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নিজ খরচে অপসারণ করিবেন; অন্যথায় জেলা প্রশাসক প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক উহা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১২) জেলা প্রশাসক, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্বাচনের পর, আদেশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি ক্রয় বিক্রয় ও জমিতে অবকাঠামো তৈরির বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবেন।

(১৩) সাধারণভাবে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত ব্যক্তি বা সংস্থার অর্থে স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ সাপেক্ষে কেবল উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় “জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য” বলিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করিবার লক্ষ্যে কোনো কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যকে বুঝাইবে।

অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি

৫। (১) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি, আপত্তিকারী বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, দ্রুত শুনানি করিবেন, এবং উক্ত শুনানি বা প্রয়োজনে পুনরায় অনুসন্ধানের পর, উক্ত আপত্তি সম্বন্ধে তাহার মতামতসহ একটি প্রতিবেদন, সাধারণ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর

৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রস্তুত করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক, -

(ক) স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার (১৬.৫০ একর) ঊর্ধ্বে হইলে তাহার মতামত সংবলিত প্রতিবেদনসহ নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার (১৬.৫০ একর) নিম্নে হইলে তাহার মতামত সংবলিত প্রতিবেদনসহ নথি কমিশনারের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপত্তি দাখিল করা না হইলে, জেলা প্রশাসক, সাধারণ ক্ষেত্রে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়ের পরবর্তী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা কমিশনারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এবং এতদ্বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অধিগ্রহণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

৬। (১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরণকৃত প্রতিবেদন বিবেচনার পর, ক্ষেত্রমত, -

(ক) সরকার উক্ত প্রতিবেদন দাখিলে অনূর্ধ্ব ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে, এবং

(খ) কমিশনার উক্ত প্রতিবেদন দাখিলের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া অনূর্ধ্ব ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক, উপ-ধারা (১) অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান

৭। (১) সরকার, কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক, ধারা ৫ বা ধারা ৬ এর অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, জেলা প্রশাসক তদ্মোতাবেক দখল গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির উপর বা উহার নিকটবর্তী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে একটি সাধারণ নোটিশ জারি করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং উক্ত সম্পত্তির স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধিকে নোটিশ জারির ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস পর জেলা প্রশাসকের নিকট নোটিশে বর্ণিত সময় এবং স্থানে হাজির হইতে

হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের প্রত্যেকের দাবির পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণে তাহাদের স্বত্বের অংশ উল্লেখ করিতে হইবে মর্মে বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৩) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখলকার, যদি থাকে, এবং জ্ঞাত বা বিশ্বাসযোগ্য সকল স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ধারিত ফরমে একই পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক নোটিশের মাধ্যমে, নোটিশ জারির ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস পর, নোটিশে উল্লিখিত স্থানে সংশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে অথবা উহার কোনো অংশে অংশীদার হিসাবে, বা বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো দাবি থাকিলে এবং উক্ত দাবির প্রকার, দাবিদারগণের নাম এবং দাবির ফলে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য লভ্যাংশ বর্ণনাসহ যথাসম্ভব বাস্তবভিত্তিক একটি বিবরণী যে কোনো স্বার্থ সংশিষ্টব্যক্তিকে দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারায় বর্ণিত বিবরণী দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য আদেশপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 175 এবং 176 এর মর্মানুযায়ী উক্ত বিবরণী দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত

৮। (১) জেলা প্রশাসক, ধারা ৭ এর অধীন নোটিশে শুনানির জন্য কার্য তারিখে অথবা অন্য কোনো মুলতবি তারিখে, ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির সময় স্থাবর সম্পত্তির মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের জন্য দাবিদারগণের পরস্পরের দাবি এবং দাবিকৃত অংশের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন, যথা :-

(ক) স্থাবর সম্পত্তির জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তাহার বিবেচনায় প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) অধিগ্রহণ প্রস্তাবাধীন মৌজার সর্বশেষ জরিপের রেকর্ড ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তিতে সকল জ্ঞাত এবং আইনানুগ দাবিদারগণের ক্ষতিপূরণের অংশ।

(২) জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ক্ষতিপূরণের মঞ্জুরি (award) প্রস্তুতির তারিখ হইতে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক -

(ক) স্বার্থ সংশিষ্টব্যক্তিকে মঞ্জুরির নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং

(খ) প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলন প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জেলা প্রশাসকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুতির কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি

৯। (১) এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণযোগ্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশিষ্টস্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য:

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার মূল্য নির্ধারণের সময় উক্ত স্থাবর সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinitz) সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত স্থাবর সম্পত্তির ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বের ১২ (বার) মাসের গড় মূল্য নির্ধারিত নিয়মে হিসাব করিতে হইবে;

(খ) যৌথ তালিকা প্রস্তুতের সময় স্থাবর সম্পত্তির উপর দণ্ডায়মান যে কোনো ফসল বা বৃক্ষের জন্য স্বার্থসংশিষ্টব্যক্তির ক্ষতি;

(গ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্যমান অপর স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি;

(ঘ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তির অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা উপার্জনের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি; এবং

(ঙ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার আবাসস্থল বা ব্যবসা কেন্দ্র স্থানান্তর করিতে বাধ্য করা হইলে উক্তরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসংগত খরচাদি।

(২) সরকারি কোনো প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত বাজারদরের উপর অতিরিক্ত শতকরা ২০০ (দুইশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইবে বাজারদরের উপর অতিরিক্ত শতকরা ৩০০ (তিনশত) ভাগ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত ক্ষতির ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের উপর অতিরিক্ত শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যে সকল বিষয় বিবেচ্য নয়

১০। এই আইনের অধীন অধিগ্রহণযোগ্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা :-

(ক) অধিগ্রহণের আবশ্যকতার মাত্রা;

(খ) অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তির অনিচ্ছা;

(গ) বেসরকারি কোনো ব্যক্তির দ্বারা সাধিত এইরূপ কোনো ক্ষতি যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না এবং তিনি নিজেই উহা পূরণ করিতে পারেন;

(ঘ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর ব্যবহারের ফলে অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির কোনো ক্ষতি;

(ঙ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের সুবিধার জন্য মূল্য বৃদ্ধি; অথবা

(চ) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ পরিবর্তন, উন্নয়ন বা বিক্রয়।

ক্ষতিপূরণ প্রদান

১১। (১) ধারা ৮ এর অধীন রোয়েদাদ প্রস্তুতের পর, দখল গ্রহণের পূর্বে, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের দাবিদার ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে অথবা ক্ষতিপূরণ দাবিদারের মালিকানা লইয়া কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ নির্ধারণে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা, কোনো পক্ষের আরবিট্রেটর কর্তৃক নির্ধারিতব্য দাবিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সংশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইলে তিনি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আপত্তিসহ, উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণে অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ধারা ৩০ এর অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি সংশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদারকে ক্ষতিপূরণের সংশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং জেলা প্রশাসক তাহার নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিয়া বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান

১২। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত বিদ্যমান ফসলসহ কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে ফসলের জন্য জেলা প্রশাসক যেরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ক্ষতিপূরণ বর্গাদারকে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় “বর্গাদার” বলিতে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি আধি, বর্গা বা ভাগ বলিয়া সাধারণভাবে পরিচিত কোনো পদ্ধতিতে অপর কোনো ব্যক্তির জমি চাষ করেন এবং শর্তানুযায়ী উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

অধিগ্রহণ এবং দখল গ্রহণ

১৩। (১) ধারা ১১ অনুসারে রোয়েদাদকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে বা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি দায়মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে এবং জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবেন।

(২) কোনো স্থাবর সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অধিগ্রহণের পর জেলা প্রশাসক নির্ধারিত ফর্মে ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল অথবা প্রত্যাহার

১৪। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬ এর অধীন অনুমোদনকৃত কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাক্কলিত অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান না করিলে উক্ত মেয়াদান্তে অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং তদ্মর্মে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোনো সময়, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে, যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল হইলে অথবা প্রত্যাহার করা হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা বাবদ তাহার যুক্তিসঙ্গত খরচসহ উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ধার্য করিয়া উহা প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে আদায়পূর্বক যথাযথভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

ঘর-বাড়ি অথবা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণ

১৫। (১) কোনো মালিক তাহার বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করিতে হইবে মর্মে শর্ত আরোপ করিলে, সংশিষ্ট বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশবিশেষ অধিগ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধারা ৮ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ ধার্য করিবার পূর্বে যে কোনো সময়, মালিক লিখিতভাবে সংশিষ্ট বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণের শর্ত প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ কিনা তদ্বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হইলে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ

১৬। কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে অধিগ্রহণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচাদি নির্বাহ হইবে।

অধিগ্রহণকৃত জমি বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হস্তান্তর

১৭। (১) কোনো বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে, সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে, নির্ধারিত ফরমে, জেলা প্রশাসকের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে জেলা প্রশাসক, নির্ধারিত ফরমে, সংশিষ্ট সম্পত্তি দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে সংশিষ্ট বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন।

কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনরুদ্ধার

১৮। এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে উক্ত অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার

১৯। (১) যে উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার অথবা বিক্রয়, লিজ, এওয়াজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) কোনো প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানের পরিপন্থিভাবে কোনো অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার করিলে অথবা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিলে, জেলা প্রশাসক নির্দেশ প্রদান করিলে, তিনি উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোনো প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে জেলা প্রশাসক, কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশিষ্ট সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (resume) করিবেন এবং সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উহা খাস খতিয়ানভুক্ত করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হুকুম দখল

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল

২০। (১) জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, জনপ্রয়োজন ও জনস্বার্থে, যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে হুকুমদখল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে হুকুমদখলের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইলে, ভূতাপেক্ষভাবে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কেবল পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত, মালিক বা তাহার পরিবারের প্রকৃত আবাসস্থল, ধর্মীয় উপাসনালয়,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, গণগ্রন্থাগার, কবরস্থান বা শ্মশানের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা হইলে, জেলা প্রশাসক

(ক) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখ হইতে যে কোনো সময়, এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখের পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, দখল গ্রহণের তারিখ হইতে ২(দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, কোনো হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতায় রাখা যাইবে না।

আদেশ সংশোধন

২১। সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন করা না হইলে উহা বিবেচনা করা হইবে না।

জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত

২২। (১) কোনো স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইলে এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি এবং নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহা প্রদান করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে সংশিষ্ট সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ এবং ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ ও বিবরণ সম্পর্কে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া এবং উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ, এবং

(খ) উক্ত সম্পত্তিতে জ্ঞাত বা বিশ্বাসযোগ্য সকল স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের অংশ অথবা দাবি সংবলিত তথ্য- সম্পর্কে একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ সম্পর্কে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশিষ্ট সম্পত্তি হুকুমদখলকালীন সময়ে দখল বা ব্যবহারজনিত কারণে ভাড়া বা লিজ বাবদ প্রাপ্য অর্থের আবর্তক ক্ষতিপূরণ; এবং

(খ) নিম্নবর্ণিত কারণে প্রদেয় যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যথা:—

(অ) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি খালি করা বাবদ যাবতীয় ব্যয়;

(আ) হুকুমদখল মুক্ত হইবার পর পুনরায় দখল গ্রহণ বাবদ যাবতীয় ব্যয়; এবং

(ই) স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলের পূর্বাবস্থায় আনয়নে সম্ভাব্য ব্যয়সহ হুকুমদখল অবস্থায় সংঘটিত যে কোনো ক্ষতি।

(৬) কোনো স্থাবর সম্পত্তি ২ (দুই) বৎসরের অধিক সময় হুকুমদখল করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয়, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত রোয়েদাদ সংশোধন করিবেন।

ক্ষতিপূরণ প্রদান

২৩। (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন কারণ উদ্ভব না হইলে, জেলা প্রশাসক ধারা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ উহার দাবিদারকে প্রদান করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের দাবিদার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণের কোনো দাবিদার না থাকিলে অথবা ক্ষতিপূরণ দাবিদারের মালিকানা বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ নির্ধারণে কোনো আপত্তি থাকিলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপুরণের অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা, কোনো পক্ষের আরবিট্রেটর কর্তৃক নির্ধারিত দাবিকে ক্ষুণ্ন করিয়া, স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলের ক্ষেত্রে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইলে তিনি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আপত্তিসহ, উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ধারা ৩০ এর অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদারকে ক্ষতিপূরণের সংশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং জেলা প্রাশাসক তাহার নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিয়া বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আদায়

২৪। জেলা প্রশাসক, কোনো ব্যক্তির অনুকূলে হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দ প্রদান ও দখল হস্তান্তর করিবার পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার নিকট হইতে ধার্যকৃত অর্থ আদায় করিবেন।

হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ

২৫। (১) জেলা প্রশাসক, হুকুমদখলকালীন সময়ে, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) বিনষ্ট হইতে রক্ষার জন্য হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি সংস্কারের প্রয়োজন মর্মে সন্তুষ্ট হইলে জেলা প্রশাসক, স্বয়ং মালিককে তাহার স্থাবর সম্পত্তি সংস্কারের জন্য সুযোগ প্রদান করিবার পর, ক্ষতিপূরণের অর্থের অনূর্ধ্ব এক ষষ্ঠাংশ অর্থ ব্যয়ে উহার সংস্কার করিবেন এবং ব্যয়িত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত সমন্বয় করিবেন।

হুকুমদখল অবমুক্তকরণ

২৬। (১) কোনো হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক, যাহার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল তাহাকে বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য তদ্বিবেচনায় যোগ্য কোনো ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(২) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন দখল হস্তান্তর করা হইলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হইবেন, তবে উক্তরূপ দখল হস্তান্তরের কারণে, উক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির কোনো আইনগত অধিকার থাকিলে, অথবা যাহার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহার নিকট কোনো বৈধ দাবি থাকিলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার উক্ত দাবি প্রতিষ্ঠার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৩) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির অনুকূলে ফেরত প্রদানের জন্য অবমুক্ত করিবার পর, উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সম্পত্তি দখল গ্রহণ না করিলে অথবা দখল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, জেলা প্রশাসকের লিখিত আদেশে বর্ণিত সময় ও তারিখের পর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যাহার অনুকূলে হুকুমদখলমুক্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তরিত হইবে তাহাকে পাওয়া না গেলে অথবা তাহার কোনো প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির প্রকাশ্য কোনো স্থানে "স্থাবর সম্পত্তিটি হুকুমদখল মুক্ত হইয়াছে" মর্মে বিজ্ঞপ্তি লটকাইবেন এবং, উক্ত বিজ্ঞপ্তির ৯০ (নববই) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদ্মর্মে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকারি গেজেটে কোনো নোটিশ প্রকাশিত হইলে, উক্ত নোটিশ প্রকাশের তারিখ ও সময় হইতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতামুক্ত হইবে এবং আইনত দখল পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তারিখের পর হইতে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে কোনো ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো দাবির বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কোনো দায় থাকিবে না।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ

২৭। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে উদ্দেশ্যে কোন স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইবে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহৃত হইলে অথবা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে অথবা ধারা ২৬ অনুযায়ী অবমুক্তির কারণ উদ্ভব হইলে, জেলা প্রশাসক, যে কোনো সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত

সম্পত্তির দখল পরিত্যাগের জন্য উক্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দখলদারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের আদেশ নির্ধারিত সময়ে প্রতিপালন করা না হইলে অথবা অমান্য করা হইলে, তিনি সংশিষ্ট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দখলদারকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে বল (force) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রযোজ্য নয়

২৮। এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আরবিট্রেশন

আরবিট্রেটর নিয়োগ

২৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীকে, উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জন্য, আরবিট্রেটর নিয়োগ করিবে।

আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন

৩০। (১) কোনো স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তি এই আইনের অধীনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে তাহা সংশোধনের জন্য রোয়েদাদের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

শুনানির নোটিশ

৩১। (১) আরবিট্রেটর, ধারা ৩০ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, শুনানির তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের উপর নোটিশ জারি করিবেন, যথা:—

(ক) দরখাস্তকারী;

(খ) আপত্তিতে স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ;

(গ) জেলা প্রশাসক; এবং

(ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা।

(২) আরবিট্রেটর অনধিক ৯০ (নববই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনের উপর শুনানি গ্রহণ করিয়া তাহার আদেশ প্রদান করিবেন।

কার্যধারার পরিধি

৩২। আরবিট্রেটর কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যধারায় অনুসন্ধানের পরিধি কেবল দাখিলকৃত আবেদনে উল্লিখিত আপত্তির বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আরবিট্রেটররের কর্মপদ্ধতি

৩৩। আরবিট্রেটর, অধিগ্রহণকৃত অথবা হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ধারা ৯, ১০ ও ২২ এর বিধান অনুসরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসকের রোয়েদাদে উল্লিখিত অংকের শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক ক্ষতিপূরণ কোনো মালিকের জন্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ

৩৪। (১) এই অধ্যায়ের অধীন আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত প্রত্যেক রোয়েদাদ লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং, ক্ষেত্রমত ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধানাবলির আলোকে নির্দিষ্টকৃত রোয়েদাদের পরিমাণ, কারণসহ, জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর শতকরা ১০ (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক রোয়েদাদ এবং রোয়েদাদের কারণ সংবলিত বর্ণনা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২ এর দফা (২) ও (৯) এর মর্মানুযায়ী, যথাক্রমে, ডিক্রি ও রায় হিসাবে গণ্য হইবে।

মামলার ব্যয়

৩৫। এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কার্যধারায় খরচের পরিমাণ কোন পক্ষ কী পরিমাণে বহন করিবে তাহা রোয়েদাদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল

৩৬। (১) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গঠিত আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এক বা একাধিক আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(৩) একজন সদস্যকে লইয়া একটি আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে যিনি, জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন বা আছেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ অপেক্ষা অধিক হইলে রায় প্রদানের তারিখ হইতে উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান অথবা প্রদানের প্রস্তাব করা পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১০ (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রত্যেক ভূমির মালিকের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ অপেক্ষা শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক হইবে না।

(৬) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিয়া উহা লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে অবহিত করিতে হইবে।

অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান

৩৭। (১) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদের প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হইলে, জেলা প্রশাসক সংশিষ্ট রোয়েদাদের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন, এবং প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির অথবা রোয়েদাদের ১(এক) মাসের মধ্যে, যাহা অপেক্ষাকৃত কম, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন।

(২) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদের ফলে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক জমা প্রদানের অব্যবহিত পরে জেলা প্রশাসক সংশিষ্ট দাবিদারকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন।

(৩) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ অনুসারে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী থাকিবে।

২০০১ সনের ১ নং আইনের অপ্রযোজ্যতা

৩৮। সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১নং আইন) এর কোনো কিছুই এই আইনের অধীন আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানি আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

৩৯। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন দেওয়ানি আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে এই আইনের অধীনে কোনো কার্যধারা গ্রহণকালে জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সমন জারিপূর্বক কোনো ব্যক্তিকে হাজির হইতে এবং শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করা;

(খ) কোনো রেকর্ড বা দলিল উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা;

(গ) হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা; এবং

(ঙ) কোনো অফিস বা আদালত হইতে কোনো সরকারি রেকর্ড তলব করা।

প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা

৪০। (১) কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা হুকুমদখল করিবার অভিপ্রায়ে অথবা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনের অধীনে কোনো আদেশ পালনের জন্য জেলা প্রশাসক বা তদ্‌কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং যে কোনো সহকারী বা কর্মী—

(ক) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া জরিপ করিতে ও লেভেল গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা উহার অভ্যন্তরীণ সকল কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপসহ উহার নকশা প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত উদ্দেশ্যে যতদূর প্রয়োজন হইবে ততদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুঁড়িয়া লেভেল, সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যে স্থানে অন্য কোনোভাবে জরিপ কার্য সম্পাদন করা, লেভেল সংগ্রহ করা এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভবপর হইবে না, সেই স্থানে যে কোনো দণ্ডায়মান ফসল, বৃক্ষ বা জঙ্গলের যে কোনো অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া কমপক্ষে ২৪ (চবিবশ) ঘন্টা পূর্বে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, উক্ত সম্পত্তির দখলদারের বিনা অনুমতিতে, কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় উক্ত সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং উক্ত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে, উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে ঘটনাস্থলে অথবা সুবিধাজনক নিকটবর্তী দ্রুততম সময়ে আদায় করিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রদান করিবেন।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা

৪১। জেলা প্রশাসক, কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুমদখলকৃত অথবা অধিগ্রহণের বা হুকুমদখলের উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নির্দিষ্ট কোনো কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

নোটিশ ও আদেশ জারি

৪২। (১) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিতে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত বা প্রস্তুতকৃত সকল নোটিশ বা আদেশ, ঠিকানায় উল্লিখিত ব্যক্তির উপর অথবা যাহার উপর জারি করা প্রয়োজন তাহার উপর জারি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) নোটিশ বা আদেশ জারির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে উহা প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে, উক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার সহিত বসবাসরত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে উক্ত নোটিশ বা আদেশ প্রদান করিতে হইবে, অথবা কোনো নিযুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যকে নোটিশ প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে, উক্ত নোটিশ বা আদেশের অনুলিপি বাহিরের দরজা বা উক্ত ব্যক্তি সাধারণত যে স্থানে বসবাস করেন কিংবা ব্যবসা করেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক কাজ করেন, উক্ত স্থানের সংলগ্ন কোনো অংশে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে এবং অন্য একটি অনুলিপি জারিকারক কর্মকর্তার কার্যালয়ে লটকাইতে হইবে এবং সম্ভব হইলে সংশিষ্ট সম্পত্তি সংলগ্ন কোনো বিশেষ অংশেও লটকাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীর নিকট হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে, নোটিশ বা আদেশ প্রাপকের ঠিকানায় অথবা, ক্ষেত্রমত, শেষ জ্ঞাত আবাসস্থল, ব্যবসাকেন্দ্র বা কর্মস্থলের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

দণ্ড

৪৩। কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ অমান্য করিলে বা বিরোধিতা করিলে অথবা অমান্য বা বিরোধিতা করিবার চেষ্টা করিলে অথবা বিরোধিতা বা অমান্য করিবার জন্য প্ররোচনা প্রদান করিলে অথবা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে, তিনি ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দখল সমর্পণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ

৪৪। এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল প্রদানে কেহ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে অথবা কোনোরূপ বাধা প্রদান করিলে, জেলা প্রশাসক উক্ত ব্যক্তিকে সংশিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বল (Force) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

স্ট্যাম্প ডিউটি ও ফিস হইতে অব্যাহতি

৪৫। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি এবং উহার অনুলিপির জন্য স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তি বা দাবিদারের উপর কোনো প্রকার ফি আরোপ করা যাইবে না।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

৪৬। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

৪৭। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এই আইনের অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত, অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের বা আরজি পেশ করা যাইবে না এবং কোন আদালত উক্তরূপ কোন আদেশ বা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

ক্ষমতা অর্পণ

৪৮। সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, আদেশে বর্ণিত কারণ ও পরিস্থিতিতে, যে কোনো কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে, আদেশ অনুযায়ী, এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৪৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(খ) আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি;

(গ) ধারা ৪৪ এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণের ক্ষেত্রে বল (Force) প্রয়োগের পদ্ধতি;

(ঘ) অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য নথি সৃজন ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয় ও কার্যপদ্ধতি; এবং

(ঙ) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৫০। (১) Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরণ সত্ত্বেও উহার অধীন -

(ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম ও গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রদত্ত সকল নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এই আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) কোনো কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল সমীপে কোনো কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

৫১। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

**[বাংলাদেশ গেজেটের
অতিরিক্ত সংখ্যায় ২১ জুন ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৫
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৩ই জুন ২০০১ ইং

নং ভূঃমঃ/শা-৫/ভূমি নীতি/০১/২০০০/১৫০।– জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ে সরকার নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছে। এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্টপতির
আদেশক্রমে
এম. সাইফুল ইসলাম
সচিব।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ

১. প্রেক্ষাপট :

১.১ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এ দেশের এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই বাংলাদেশে ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্বও অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদি সব কিছুরই উৎস। ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টরের বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষের বাস, প্রতিজনের মোট ভূমির পরিমাণ গড়ে ২৭ শতক এবং চাষযোগ্য জমির পরিমান ১৭ শতক মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন ঘটছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২০.২ মিলিয়ন একর যা ১৯৯৭ সালে কমে দাড়িয়েছে ১৭.৫ মিলিয়ন একরে। ভূমির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার চাষযোগ্য জমির অন্যবিধ ব্যবহারের একটি চিত্র নিচের ছক থেকে পাওয়া যাবে:

ছক-১

বাংলাদেশ : ভূমির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার, ১৯৭৮-১৯৯৬

	(হাজার একরে)			(মোট জমির শতকরা অংশ)		
বৎসর	১৯৭৮	১৯৯০	১৯৯৬	১৯৭৪	১৯৯০	১৯৯৬
মোট জমির পরিমাণ	৩৫,২৮২	৩৭,৫২১	৩৬,৬৬৪	১০০	১০০	১০০
চাষযোগ্য জমি (নীট আবাদি+ কৃষিযোগ্য পতিত	২৩,১৯৯	২৩,২০৯	২১,৬৫০	৬৬	৬২	৫৯
নীট আবাদী	২০,৯৭৭	২১,৮৩৭	১৯,২৮০	৪৯	৫৮	৫৩
কৃষিযোগ্য পতিত	২২২১	১৩৭২	২২৮১	৭	৪	৬
বনাঞ্চল	৫,৫০৮	৪,৫৯১	৫৩১৫	১৬	১২	১৪
কৃষি অযোগ্য	৬,৫৭৬	৯,৭২১	৯,৭৮৮	১৯	২৬	২৭

তথ্যসূত্র ঃ বিবিএস বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

ছক-২

বৎসর	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৭
চাষযোগ্য জমি	২২,৯৭৪	২০,২০৯
আবাদি জমি	২০,২৩৮	১৭,৪৪৯
কৃষিযোগ্য পতিত	২,৪৩৬	২,৭৬০
বাড়ীঘর	৮৫৭	১,০২৭

তথ্যসূত্র ঃ বিবিএস বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

১.২ ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল ভূমি, পানি সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন তথ্য সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

১.৩ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন এবং দেশজ সম্পদের সার্বিক ও রপ্তানীমুখী উন্নয়নের মাধমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশের দুটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ যথা ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নিবিড় কৃষি কার্যক্রম, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানসহ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

২. ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্যাবলী:

ক. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করা;

খ. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে “জোনিং” ব্যবস্থা প্রবর্তণের মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ;

গ. ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদী, হাওড় বা সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ঘ. বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এরূপ জমি বিশেষ করে সরকারি খাসজমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

ঙ. ভূমির ব্যবহার যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা; এবং

চ. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

ছ. প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা, নদী ভাঙ্গন রোধ করা, পাহাড় টিলাভূমি কর্তন প্রতিহত করা;

জ. ভূমি দূষণ প্রতিরোধ করা;

ঝ. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বহুতলবিশিষ্ট দালান নির্মাণের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ জমির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩. ভূমি ব্যবহার ভিত্তিক জোন নির্ধারণ:

৩.১ ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং যথেচ্ছ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার্য জমি এলাকাভিত্তিক চিহ্নিত করা। দেশের সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ নাগরিক সুবিধা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল সকল নগরবাসীর কাছে সহজপ্রাপ্য করার জন্য কাজ করে থাকে।

আবাসিক এলাকার অবস্থান বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা থেকে একটা যুক্তিসংগত দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থার উপরও এই দূরত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৩.২ Town Improvement Act, ১৯৫৩ এর বিধান সত্ত্বেও বড় শহরগুলোতে বহু ক্ষেত্রেই আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে উঠেনি। আবাসিক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত জায়গায় অসংখ্য দোকানপাট, মার্কেট, ক্লিনিক ছাড়াও ছোট ছোট শিল্প-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এই অনভিপ্রেত অবস্থার আশু অবসান কাম্য।

৩.৩ শহরাঞ্চলে যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃশ্যমান, গ্রামাঞ্চলে তা একেবারেই অনুপস্থিত। মূল্যবান কৃষি জমি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারিত হচ্ছে, ছোট বাজার স্ফীত হয়ে গ্রাস করছে সংলগ্ন ফসলী জমি, ছোট ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদিত শিল্প নগরী খালি রেখে কল-কারখানা বসছে মালিকের বসতবাটির নিকটবর্তী স্থানে। এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে Village Improvement Act নামে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করা যেতে পারে। গ্রামীণ অবকাঠামো বিশেষ করে পরিকল্পিত আবাসনের জন্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩.৪ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আবাসিক এলাকা নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর জন্য জায়গা পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ইতিমধ্যেই যেসব জমি বনভূমি, টিলা শ্রেণীর জমি, জলাভূমি বা বিশেষ ধরনের বাগান হিসাবে পরিচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সেগুলির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আনা যাবে না অর্থাৎ ভরাট করে আবাসিক এলাকা সৃষ্টি বা শিল্পায়ন ইত্যাদি করা যাবে না।

৩.৫ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য জমির একটা জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করবে। মূলতঃ আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসেবে একেকটি জোন চিহ্নিত হবে। এর ফলে সামগ্রিক নগরজীবন একটা সুবিন্যস্ত আংগিকে প্রসার লাভ করবে।

৩.৬. শহর এলাকার বাইরে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেখানেও জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের আওতাধীন এলাকায় যে গ্রাম ও গ্রোথ সেন্টারগুলি আছে সেগুলির ভবিষ্যৎ প্রসারের সুবিধার্থে একটি জোনিং ম্যাপ উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। প্রধান লক্ষ্য থাকবে চাষযোগ্য জমি অকারণে যেন গ্রাম সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত না হয়। গ্রোথ সেন্টারগুলিতে ছোটখাট শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩.৬ জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি একাধিক উপজেলা সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ একটি উপজেলার একটি জোন পার্শ্ববর্তী উপজেলাগুলোতেও বিস্তৃত হয় তবে সেরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৩.৭ জাতীয় পর্যায়ে একটি জোনিং ল (Zoning Law) প্রণয়ন করা হবে, যার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের কাজটি করবে। জোনিং ম্যাপ প্রণীত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তার পরিবর্তন করা যাবে না। একান্তই পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তার জন্য কঠিন শর্তাবলী পালনের বিধান (Zoning Law) তে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। ম্যাপ প্রণয়নের জন্য জেলা প্রশাসকের রাজস্ব অফিসের সহায়তা প্রয়োজন অনুসারে প্রদান করা হবে।

৩.৯ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জোনিং ধারনা এবং জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের দক্ষতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের এক বা একাধিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।

৪. ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ:

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকেঃ

ক. কৃষি
খ. আবাসন
গ. বনাঞ্চল
ঘ. নদী, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, পুকুর, জলমহাল
ঙ. রাস্তাঘাট
চ. রেলপথ
ছ. বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান
জ. চা ও রাবার বাগান, হর্টিকালচার বাগান
ঝ. উপকূলীয় অঞ্চল
ঙ. চরাঞ্চল
ট. অন্যান্য

৫. কৃষি উৎপাদন :

৫.১ বিগত বছরগুলোতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রায় প্রতি বছরই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ করে এবং বাড়তি প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪.৫ লক্ষ টন। চাষযোগ্য জমির অপরিকল্পিত বা যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

৫.২ এ দেশে কৃষি ভূমি শুধু কৃষি খাতে বা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী পল্লী অঞ্চলে বিগত ৮০-র দশকে যে ভূমির প্রায় ১৫ ভাগ কৃষক/গ্রামবাসীদের বসতবাটি ও অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হতো বর্তমানে তা প্রায় ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া নগরায়ন, শিল্পায়ন, আবাসন, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি খাতেও অনেক জমি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষি ভূমির পরিমাণ দিন-দিন কমে যাচ্ছে। এসব অকৃষি খাতে বহুতল ইমারত বানালে ভূমি ব্যবহারে কৃচ্ছতা সম্ভব হবে।

৫.৩ উন্নয়নমূলক অথবা অন্য কোন কাজে ভূমি অধিগ্রহণের সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা বহু কেইসেই অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে বিপুল পরিমাণ উর্বর কৃষি কাজের অযোগ্য ও আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অধিগৃহীত ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও অপব্যবহার দুই-ই চলছে। বিভিন্ন সময় অধিগৃহীত বিপুল পরিমাণ কৃষি ভূমির প্রায় ২৫ ভাগ বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে কিংবা অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূমির এ ধরনের অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

৫.৪ কৃষি ভূমি সাধারণভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি হলেও এর ব্যবহার সার্বিক জাতীয় সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। এর একটি বিরাট অংশ বর্গাচাষী। এসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভূমির ব্যবহার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজণকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করতে হবে।

৫.৫ জাতীয় কৃষি নীতিতে ফসল উৎপাদনের জন্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভুগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার নিরিখে সেচযোগ্য জমির আয়তন নির্ধারণ করা জরুরী। এতে এক দিকে যেমন মরুকরণ প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও প্রতিহত হবে। অন্যদিকে পানির মত একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। সেচযোগ্য কৃষি জমির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। উর্বর কৃষি জমি যেখানে বর্তমানে দুই বা ততোধিক ফসল ফলে বা এমন জমি যা এরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময়, তা কোনক্রমেই অকৃষি কাজের জন্য যেমন– ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণ, গৃহায়ণ, ইটের ভাটা তৈরী ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অকৃষি খাতে উন্নয়ণমূলক কাজে ভূমির প্রয়োজন হলে এবং তার জন্য অকৃষি খাসজমি পাওয়া গেলে খাসজমি ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। একেবারেই বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে নূন্যতম পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি হুকুম দখল করা যেতে পরে।

৬. আবাসন:

গত কয়েক দশকে শহরাঞ্চলের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং পল্লী অঞ্চল থেকে জনগণের শহরমুখী প্রবাহ ভূমি ব্যবহারের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে বর্ণিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে

ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ বাসস্থান নির্মাণের কাজে ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা বাদ দিলে দেশের প্রায় সবটাই সমতল ভূমি। বাসস্থান নির্মাণের আবশ্যকতায় স্বাভাবিকভাবেই কৃষি জমি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলের গৃহায়ণ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন কঠোরতার সাথে প্রতিপালন ছাড়াও ও গ্রামীণ জনপদগুলিতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে তার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ ও থানা সদরগুলোতে গৃহায়ণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শহরাঞ্চলের আবাসিক এলাকাতে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ পরিহার করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও যাতে উর্বর জমিতে গৃহনির্মাণ সংকুচিত করা যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

৭. বনাঞ্চলঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। দেশের মোট বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চল, মধুপুর অঞ্চল, সুন্দরবন ইত্যাদি কিছু এলাকায় বিস্তৃত। জনজীবনের সুস্থতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণ স্থলভূমির অন্তত ২৫% বনাচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন মনে করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সীমিত বনভূমি দেখা যায় তা এই মানদণ্ডের বহু নীচে। তদুপরি দ্রুত নগরায়ন, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা স্থাপন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল ইত্যাদির কারণে যে বায়ু দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। বনায়নের উপযোগী ভূমি ও চরভূমিতে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিহত করা সম্ভব। রিজার্ভ ফরেস্ট ও অন্যান্য বনাঞ্চলে ব্যাপক বন সৃষ্টি এবং বর্তমান বনভূমির সঠিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

৮. শিল্পায়নঃ

৮.১ বর্তমান বিশ্বের মুক্ত অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে ব্যাপক শিল্পায়নের প্রচেষ্টা নিতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ও বিপণন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি অপরিহার্য। বিগত দশকগুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিরাট এলাকা চিহ্নিত করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের সর্বত্র এমনকি কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিসিক এস্টেট গঠনের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আনুকূল্যে স্থাপিত এইসব শিল্প এলাকা (শিল্প নগরীতে) বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন কার্যকর হয়নি। বহু এলাকা ভিন্নতর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে বিসিক এলাকাগুলোতে দেখা যায় অধিগৃহীত জমির প্রায় সবটাই, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যদিকে শিল্প নগরীতে খালি প্লট থাকা সত্ত্বেও শিল্প উদ্যোক্তারা হয় প্রয়োজনীয় জমি পাচ্ছে না অথবা সেখানে শিল্প স্থাপনে

তারা যে কারণেই হোক উৎসাহী নন। অনেকে শিল্প নগরীর বাইরে কিন্তু অল্প দূরত্বে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন করে উৎপাদন করছেন।

৮.২ বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিতব্য কলকারখানার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি উপাদান গুরুত্ব পেয়ে থাকে তার মধ্যে সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর রেয়াতের সুবিধা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবিচ্ছিন্ন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি অন্যতম। সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রধান সড়কগুলোর পাশেই মূলত শিল্প ও ব্যণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে আনুমানিক ৫০০ গজ জায়গা ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখা, বিসিক এস্টেটগুলোতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের মালিকরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী না হলে বা অপারগ হলে ঐ প্লটগুলো পুনঃগ্রহণ করে আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিল্প উৎপাদনে যাওয়ার শর্তে বরাদ্দ প্রদান, বিসিক শিল্প নগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটিরশিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হতে পারে।

৯. জলাভূমি:

৯.১ এ দেশে প্রায় ২৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথ আছে। এইসব নদ-নদী এবং অন্যান্য জলাভূমি মিলে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে ব্যবহৃত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথাযথ মৎস্য চাষ করা হলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হতে পারে।

৯.২ নদীগুলোতে ক্রমাগত পলিমাটি পড়া, যেখানে সেখানে মাটি ভরাট, নিচু এলাকায় পানির স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত করে রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জলাভূমি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। এর ফলে নিম্নলিখিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে:

- ক. বর্ষাকালে বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি;
- খ. শুষ্ক মৌসুমে নৌচলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাব;
- গ. সীমিত মৎস্যচাষ;
- ঘ. সেচের জন্য অপর্যাপ্ত পানি;
- ঙ. লবণাক্ততা বৃদ্ধি;
- চ. জলাবদ্ধতা সমস্যার সৃষ্টি;
- ছ. কাপড় কাচা, গোসল করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য পানির স্বল্পতা।

৯.৩ মৎস্য উৎপাদনের জন্য চিরাচরিত ক্ষেত্র, যথা নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি কোনভাবেই যাতে প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর অনেক জায়গাতেই গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এগুলোকে ব্যাপকহারে কৃষি জমিতে রূপান্তর করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য

যে, শুধুমাত্র কৃষি জমির আয়তন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান ঘটবে না, বরং তাতে নানাবিধ সমস্যা যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া, জনগণ কর্তৃক মাছজাত প্রোটিন গ্রহণে ঘাটতি ইত্যাদি সৃষ্টি হবে। জাতীয় কৃষিনীতি ও জাতীয় মৎস্যনীতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে যুগপৎ ফসল ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত চা বাগানগুলো আমাদের রপ্তানী আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য কিছু এলাকায় রাবার বাগান আছে। এছাড়া আছে ফলের বাগান। এসব বিশেষ ধরনের বাগানের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। এর জন্য যে জমি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে বা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত আছে তা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত জাতীয় নীতির বহির্ভূত কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এসব জমিতে বিদ্যমান মূল্যবান গাছ নির্বিচারে সংহার করা যাবে না এবং জমির স্বাভাবিক উর্বরতাও বিনষ্ট করা চলবে না।

১০. উপকূলীয় অঞ্চল:

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ থেকে বিপুল আয়তনের চর জেগে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো জাগবে। মেয়াদী ভূমি উদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমুদ্রগর্ভ থেকে চর জাগার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে। সমুদ্রগর্ভ থেকে কৃত্রিম উপায়ে চর সৃষ্টির টেকনোলজি ব্যয়বহুল হলেও জাতীয় প্রয়োজনে এই পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন চরভূমিতে বনায়ন, ভূমিহীনদের জন্য আবাসন সৃষ্টি, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জায়গা/সুবিধার (Public easement) জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণ, পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাষন ব্যবস্থাসহ উন্নত চষাবাদ, ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন আবশ্যক। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব।

১১. চরাঞ্চল:

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নদীর উভয় পাশে এবং প্রাকৃতিক জলাভূমি যেমন হাওড়-বাঁওড়, মরা নদী ইত্যাদিতে বহু চর জেগে ওঠে। একটি নীতির মাধ্যমে এইসব চর ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া ছাড়াও তাদের জন্য আদর্শগ্রাম ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়ে থাকে। নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে এসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. ভূমির অন্যান্য ব্যবহার:

১২.১ উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও আরো বহুবিধ কারণে ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্বার্থে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা যথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, হাট-বাজার, অফিস-আদালত নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কার্য ও আবাসস্থল, ডেইরি ও পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যমান স্থাপনার অতিরিক্ত স্থাপনা ক্ষেত্রে অনায়াসে একটা সীমারেখা টানা যেতে পারে। বিদ্যমান স্থাপনার আয়ত্তাধীন সম্পূর্ণ জমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রথমেই নিশ্চিত

করতে হবে। তারপরেও যদি বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় তবে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা নিতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষণ এবং সেচ কাজের সুবিধার্থে নদী খনন করা হয়। এর ফলে যে মাটি পাওয়া যায় তা পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

১২.২ নির্মাণ কাজে ব্যাপকভাবে ইটের ব্যবহার এবং যত্রতত্র ইটের ভাটা তৈরীর ফলে ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তনসহ দেশের প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবনতি ঘটছে। এ অবস্থা রোধকল্পে নির্মাণ কাজে ইটের বিকল্প হিসাবে পাথরকুচি, বালু ও সিমেন্টের তৈরী "হলো ব্লক" এর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে যা ভূমিকম্পে দালান-কোঠা ধ্বংসরোধেও সহায়ক হবে।

১৩. অধিগৃহীত জমির অপব্যবহার :

১৩.১ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ইতিপূর্বে অধিগৃহীত জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বর্তমানে অব্যবহৃত অথবা অবৈধ দখলে অথবা অপব্যবহৃত অবস্থায় আছে। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতায় এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উদ্ধারকৃত জমি সরকার খাসজমি হিসেবে সহজেই পুনঃগ্রহণ (resume)করতে পারে। খাসজমির তালিকায় পুনঃগৃহীত জমির উল্লেখসহ অন্যান্য পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করে তা নিয়মিতভাবে সংশোধন করতে হবে।

১৩.২ ভূমি অধিগ্রহণের মূখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পে অধিগ্রহীত জমির বহুমুখী ব্যবহার (multilateral use) করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন আনা যেতে পারে। প্রকল্পের স্বার্থে প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবে অব্যবহৃত এ ধরনের জমিতে বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও মহাসড়কের জমিতে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সহায়ক কার্যক্রম যথা শস্য চাষ, যথোপযুক্ত বৃক্ষ রোপন, পশু পালন, হাঁস-মুরগীর চাষ ও মৎস্য চাষ করা যেতে পারে।

১৪. ভূমি ডেটা ব্যাংক:

১৪.১ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যেসব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটা প্রণীত হবে। নিম্নলিখিত সূত্রসমূহ থেকে সংগৃহীত ভূমি ডেটা সংরক্ষণ করা হবে:

ক. অব্যবহৃত সরকারি খাসজমি;
খ. পতিত জমি;
গ. অধিগৃহীত জমি বা অব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক পুনঃগৃহীত (resume):
ঘ. ভবিষ্যতে কোন বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট এমন অধিগৃহীত জমি;

ঙ. পয়স্তি চর (নদী থেকে জেগে ওঠা চর) এবং
চ. সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি।

১৪.২ সরকারি খাসজমির (কৃষি ও অকৃষি) ব্যবহার ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত কৃষি ও অকৃষি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালায় বিধৃত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিযোগ্য খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কিন্তু অকৃষি খাসজমির ক্ষেত্রে প্রয়োজন মিটানোর জন্য এর সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। মূলত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এর ব্যবহার সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৪.৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট এবং ঢাকা ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর মালিকানায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে কয়েক হাজার একর মূল্যবান সম্পত্তি আছে। কালক্রমে এসব সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের আয়ত্বে চলে গেছে। এগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.৪ সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিমিত্ত প্রায়শঃই স্থাপনা নির্মাণ প্রয়োজন হয়। প্রচলিত বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা হয়। ভূমির স্থানীয় প্রাপ্যতার আলোকে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রস্তাবিত ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু হলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রথমেই খাসজমির প্রাপ্যতা পরীক্ষা করা হবে। উপযুক্ত খাসজমি পাওয়া গেলে সেটাই বন্দোবস্ত দেয়া শ্রেয় হবে।

১৪.৫ ভূমি ডেটা ব্যাংক তালিকাভুক্ত খাসজমি যদি একান্তই ব্যবহারের উপযুক্ত বিবেচিত না হয় তাহলে জেলা প্রশাসক ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে অধিগৃহীতব্য জমি কোনক্রমেই সেচযোগ্য বা উর্বর কৃষিজমি না হয় এবং জমির পরিমাণও ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে।

১৫. Certificate of Land Ownership (CLO)

ভূমি প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিকানা স্বত্ব কোন একটি ডকুমেন্টের উপর নির্ভরশীল নয়। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, জমির পর্চা এবং সার্ভে রেকর্ডে নামভুক্তি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ। এতে একদিকে যেমন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও মামলা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে ভূয়া দলিলের মাধ্যমে নামজারিসহ বিভিন্ন হঠকারিতার শিকার হয় নিরীহ জনগণ। এই অবস্থা নিরসনকল্পে একটি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য একক দলিল প্রদানের মাধ্যমে ভূস্বামীর সত্ত্ব নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। Certificate of Land Ownership (CLO) স্কীমটি সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হলে খাসজমির ব্যাপকহারে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাওয়ার বর্তমান প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস করা যাবে বলে আশা করা যায়। ভূমি ডেটা প্রণয়ন ও নিয়মিত আপডেটিং এর ক্ষেত্রে এই স্কীমটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

১৬. ভূমি ব্যবহার নীতির মুখ্য দিকসমূহ:

১৬.১ কৃষি জমি যতটুকু সম্ভব কৃষি কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জমির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আনা যাবে না;

১৬.২ অনুপস্থিত কৃষি জমি মালিকানাদের জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৩ কৃষি জমির ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া একটি যৌক্তিক পরিমাণে সীমিত রাখতে হবে;

১৬.৪ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ স্ব-স্ব এলাকায় ভূমির ব্যবহারভিত্তিক জোন চিহ্নিত করবে;

১৬.৫ চিহ্নিত জোনসমূহের ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে;

১৬.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের রাজস্ব অফিস প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;

১৬.৭ জোনিং ম্যাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হওয়ার পর তা সুনির্দিষ্টক্ষেত্র এবং শর্তপালন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না;

১৬.৮ দেশে একটি জোনিং ল (Zoning Law) থাকবে। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জোনিং ম্যাপ এই আইনের ক্ষমতাবলে সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে;

১৬.৯ গ্রামীণ এলাকার জন্য মডেল হাউস নির্মাণ ও পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা তৈরি উৎসাহিত করতে হবে;

১৬.১০ আবাসনের জন্য ব্যবহৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একতলা ভবনের পরিবর্তে বহুতল ভবন নির্মাণকে উৎসাহিত করতে হবে;

১৬.১১ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত বনাঞ্চল বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত থাকবে;

১৬.১২ বর্তমানে ব্যবহৃত বনভূমির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.১৩ উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকরভাবে বনাঞ্চলের সবুজ বেষ্টনী সৃজন করতে হবে;

১৬.১৪ সামাজিক বনায়নকে উৎসাহিত করতে হবে;

১৬.১৫ বিদ্যমান জলাশয় উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং তা ভরাট করা যাবে না। এ দায়িত্ব ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট পুকুরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর এবং বৃহৎ জলাশয় যেমন- নদী, খাল, হাওড়, বাঁওড় এবং বিল-এর দায়িত্ব ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জলাশয়সমূহের নিয়মিত সংস্কার ও পুনঃখনন প্রয়োজন হবে;

১৬.১৬ যতদূর সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে সড়ক/রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে;

১৬.১৭ বাঁধে পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষরোপণ করতে হবে;

১৬.১৮ বাঁধ নির্মাণের জন্য খননকৃত খাদ/গহ্বর জলাশয় হিসাবে মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস পালনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি করার সময় যতদূর সম্ভব নতুন জলাশয় সৃষ্টি না করে আশে পাশে অবস্থিত ভরাট জলাশয় পুনঃখনন করে বাঁধের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৬.১৯ বাঁধ নির্মাণের ফলে যাতে করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.২০ শুধুমাত্র জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক ও জেলা-উপজেলা, উপজেলা-উপজেলা সংযোগকারী সড়ক ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। যেসব ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ একান্তই অপরিহার্য সেখানে বসত বাড়ি ও উর্বর কৃষি জমি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে অন্তগ্রাম/আন্তগ্রাম রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পিত উপায়ে হতে হবে।

১৬.২১ শিল্প স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট জোনে নতুন শিল্প-কারখানা নির্মাণ করতে হবে। এর জন্য শিল্প সহায়ক সেবাসমূহ যাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

১৬.২২ কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতির শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলে শুধুমাত্র সেই প্রকৃতির শিল্প কারখানাই স্থাপনযোগ্য হবে;

১৬.২৩ শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন/নির্গমনের যথাযথ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে ভূমি বা পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়;

১৬.২৪ দেশের প্রধান সড়কসমূহে যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রধান সড়কসমূহের দুই পার্শ্বে "সার্ভিস লেইন"-এর ব্যবস্থা রাখা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে প্রধান সড়কসমূহের দুই পার্শ্বে বনায়নের জন্য ১০ হতে ২০ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে;

১৬.২৫ বিসিক শিল্প নগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটিরশিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে;

১৬.২৬ চা-বাগান, রাবার বাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত জমি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চা-বাগানের জমি কোন অবস্থাতেই চা-চাষ বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা যাবে না;

১৬.২৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহকে জরিপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

১৬.২৮ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপ-সম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।

১৭. জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ:

কোন জাতীয় নীতিই পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যায় না যদি না বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এটা বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। ভূমি নীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশে কৃষি জমির সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের অপরিহার্যতা, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ব্যাপক মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয়তা, বনায়ন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাবে না। মানুষ যখন এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ হবে তখন গৃহনির্মাণের জন্য তার উর্বর ভূমিখণ্ড সে সহজে ব্যবহার করবে না। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সে নিজের থেকেই সচেষ্ট হবে।

১৮. জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি (National Land Use Committee)

১৮.১ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হবে:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
ভূমি মন্ত্রী	সহ-সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	সদস্য
অর্থ মন্ত্রী	সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রী	সদস্য
পানি সম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
শিল্প মন্ত্রী	সদস্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী	সদস্য
কৃষি মন্ত্রী	সদস্য
যোগাযোগ মন্ত্রী	সদস্য
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	সদস্য
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী	সদস্য
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	সদস্য
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী	সদস্য
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
পরিকল্পনা মন্ত্রী	সদস্য
মন্ত্রীপরিষদ সচিব	সদস্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
সংশ্লিষ্ট সচিবগণ	সদস্য
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১৮.২ ভূমি মন্ত্রণালয় জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক/সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

১৯. জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিতভাবে একটি ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে:

ভূমি মন্ত্রী	আহ্বায়ক
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	সদস্য
কৃষি মন্ত্রী	সদস্য
যোগাযোগ মন্ত্রী	সদস্য
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী	সদস্য
পরিকল্পনা মন্ত্রী	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১৯.১ ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক/সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

এম, সাইফুল ইসলাম
সচিব।

পরিশিষ্ট ২

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-পরিচালিত পূর্বের গবেষণানির্ভর সংশ্লিষ্ট আইনি প্রস্তাবনাসমূহ

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, অধ্যাপক আবুল বারকাত, *পিএইচডি-এর নেতৃত্বে*, দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৯-২০১৩), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালিত করে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা-বনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও সংশ্লিষ্ট মেমো-সার্কুলার-বিধিমালার 'অধিকারভিত্তিক' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংবিধানের মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনী-প্রস্তাবনাসহ সম্পূর্ণ নতুন আইনের খসড়াও প্রণয়ন করা হয়। আইনের সংখ্যাতাত্ত্বিক (Quantitative) বিশ্লেষণও সম্পন্ন করা হয় একেবারেই মৌলিক এক গবেষণাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এই গবেষণার ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনন্যতা থেকে বলা যেতে পারে, সম্ভবত এটাই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের প্রথম গবেষণা দলিল। সম্প্রতি ওই গবেষণালব্ধ আইনি সংস্কার এবং প্রণয়ন প্রস্তাবনাসমূহ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে: বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। এই পরিশিষ্টে ব্যবহৃত আইনি প্রস্তাবনাসমূহ এই প্রকাশনা থেকেই নেয়া হয়েছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসম্পর্কিত আইনঃ প্রস্তাবিত সংশোধনী

১। ২০১৩-তে এই নীতিমালা জারির পর থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনসংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারিকৃত সব আদেশ, পরিপত্র, স্মারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে।

এই নীতিমালা জারির পূর্বে প্রচলিত নিয়মনীতি মোতাবেক কৃষি খাসজমির যেসব বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে, ওইসব বন্দোবস্ত বহাল থাকবে। তাছাড়া পূর্বের নীতিমালার আওতায় যেসব বন্দোবস্ত কেস জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৩-০৮-১৯৯৬ ইং তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করা হয়নি, সেসব কেসও বহাল থাকবে এবং কবুলিয়াত সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। এমন কেসসমূহ বর্তমান নীতিমালা ও তার সংশোধনী মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে ১৯৭২ সালের পর বিধিবহির্ভূতভাবে যদি কোনো কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে, সেই বন্দোবস্ত কেস সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও তার প্রমাণাদির ভিত্তিতে থানা কমিটি, জেলা কমিটির কাছে বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারবে এবং জেলা কমিটি উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে তদারকির জন্য একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলাপর্যায়ে একটি জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থানাপর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করা হলো। [১৯৯৭ এর নীতিমালায় এই কমিটিসমূহের গঠন, কার্যক্রম/দায়িত্ব বর্ণিত ছিল। ১৯৯৭-এর নীতিমালা পর্যবেক্ষণের আলোকে, এটার প্রয়োগজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশকৃত সমাধানের আলোকে ১৯৯৭-এর নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।][৮৩]

২। নির্বাহী কমিটি গঠন

ক. **[জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠনঃ**

সভাপতি

(১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহসভাপতি

(২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সদস্য

(৩) মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত

(৪) মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত

---

[৮৩] প্রস্তাবিত

(৫) মাননীয় সংসদ সদস্য, খুলনা বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত
(৬) মাননীয় সংসদ সদস্য, বরিশাল বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত
(৭) মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত
(৮) মাননীয় সংসদ সদস্য, রংপুর বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত
(৯) একজন মহিলা সংসদ সদস্য, মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত
(১০) জাতীয় মহিলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি
(১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
(১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৬) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৭) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৮) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড
(২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
(২১) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড
(২২-২৮) ৭টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার
(২৯) জাতীয়পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন সদস্য
(৩০) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়][৮৪] (সদস্য-সচিব)

খ. জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নিবাহী কমিটির কার্যপরিধি:

(১) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
(২) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।
(৩) কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও চিহ্নিত সম্পর্কিত বিভিন্ন এলাকার উঠতি সমস্যাগুলো সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
(৪) এ কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

৩। জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি

উপদেষ্টা: একজন সংসদ সদস্য (ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)

(১) জেলা পরিষদ প্রশাসক/চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ----------------------------- সভাপতি
(২) জেলা প্রশাসক---সদস্য
(৩) পুলিশ সুপার--সদস্য
(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ---সদস্য
(৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ---সদস্য
(৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ---সদস্য

---

[৮৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-১১০৪ এর ক অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(৭) জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা --সদস্য
(৮) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী আফিসার ---সদস্য
(৯) জেলা কৃষক সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----সদস্য
(১০) জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
(১১) জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----সদস্য
(১২) জাতীয় মহিলা পরিষদের জেলাপর্যায়ের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
(১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর][৮৫] -- সদস্য সচিব

(খ) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি

(১) জেলা কৃষি খাসজমির বরাদ্দ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার বিধিমালা প্রচার।

(২) উপজেলা কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের প্রস্তাব অনুমোদন ও উপজেলা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি।

(৩) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমিসংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) কমিটি প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবে এবং জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৪। **[উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি**

(১) সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)--- উপদেষ্টা
(২) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ -- সভাপতি
(৩) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা --সহসভাপতি
(৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা --সদস্য
(৫) ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা---সদস্য
(৬) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ---সদস্য
(৭) বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার, যদি থাকে -------------------------------সদস্য
(৮) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা--সদস্য
(৯) চেয়ারম্যান, ইউসিসিএ ---সদস্য
(১০) ইউপি চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)----------------------------------সদস্য
(১১) বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
(১২) উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)----সদস্য
(১৩) স্থানীয় সৎ, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কাজে উৎসাহী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)-- --সদস্য
(১৪) স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের প্রধান (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)------- সদস্য
(১৫) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন) ---সদস্য
(১৬) একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)--------------------সদস্য

---

[৮৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদবলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(১৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়পর্যায়ে কার্যক্রম আছে এমন এনজিওর একজন প্রতিনিধি---সদস্য

(১৮) সহকারী কমিশনার (ভূমি) --------------------------------------- সদস্য-সচিব][৮৬]

(খ) [উপজেলা][৮৭] কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) [উপজেলা][৮৮]র আওতাধীন এলাকার কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারকরণ।

(২) উদ্ধারকৃত কৃষি খাসজমিকে নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুবিধার্থে প্লটে বিভক্তিকরণ।

(৩) সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) ভূমিহীনদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান । [***][৮৯]

(৫) প্রাপ্ত দরখাস্ত বাছাই এবং নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

(৬) নির্বাচিত ভূমিহীনদের জন্য খাস প্লটে বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

(৭) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিহীনকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।

(৮) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যক্রম অথবা তালিকাভুক্তকরণ থেকে উদ্ভূত বিবাদ স্থিরকরণ।

(৯) বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি না, কেউ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে কি না সেই সম্পর্কে তদারকি ও শর্ত ভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

৫। (ক) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমটি

(১) চেয়ারম্যান —ইউনিয়ন পরিষদ --- সভাপতি

(২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন নারী ইউপি সদস্য ------------------সহসভাপতি

(৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন ইউপি সদস্য ---------------------------সদস্য

(৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন স্কুল শিক্ষক---সদস্য

(৫) ভূমিহীন কৃষক সমিতির একজন প্রতিনিধি ------------------------------------সদস্য

(৬) সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বা উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা--------------------------সদস্য

(৭) সচিব—ইউনিয়ন পরিষদ -- সদস্য-সচিব

(খ) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মোট ভূমিহীন ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং হালনাগাদকরণ।

(২) ভূমিহীন ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র স্থিরকরণ।

(৩) ভূমিহীন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতের পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

---

[৮৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত ।

[৮৭] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৮৮] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৮৯] [এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ] শব্দগুলি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৪) ভূমিহীন ব্যক্তি নির্বাচনসংক্রান্ত অন্য কোনো কার্যক্রম সম্পাদন।

৬। ভূমিহীনদের বাছাই প্রক্রিয়া

(ক) ভূমিহীন মানুষ নির্ধারিত ফর্মে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এবং ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের কাছে দরখাস্ত দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিনা মূল্যে দরখাস্তের আবেদনপত্র সরবরাহ ও রসিদ প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গৃহীত দরখাস্ত শর্তাধীন সময়ের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রেরণ করবেন।

(খ) উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব অন্যান্য অফিসে গৃহীত দরখাস্তসমূহ তার নিজ অফিসে গ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং দরখাস্তসমূহ ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করবেন।

(গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ [উপজেলা][৯০] কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হবেন। এ সময় আবেদনকারীদেরকে কমিটির সামনে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করবেন।

(ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সঠিকতা যাচাই করবেন এবং এভাবে চূড়ান্তরূপে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন।

(ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে এবং তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা আবেদনপত্রে সঠিকভাবে লিখতে হবে।

৬.১। খাসজমি বরাদ্দের সময় বিবেচিত বিষয়সমূহ

(ক) একান্নভুক্ত একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেয়া যাবে না।

(খ) জমি স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথ নামে প্রদান করা হবে কিন্তু যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় স্ত্রী সম্পূর্ণ জমির মালিক হবেন এবং এটাকে কবুলিয়ত হিসেবে অভিহিত করা হবে।

(গ) [চরাঞ্চলের কৃষি খাসজমিতে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া যাবে।][৯১]

(ঘ) ["কোনো পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) একর জমি দেয়া হবে। তবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য খাসজমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১.৫০ (দেড়) একর পর্যন্ত জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। উপকূলীয় জেলাসমূহ হলো: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ ও মিরসরাই থানা এবং কক্সবাজার জেলার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও চকোরিয়া থানা"।][৯২]

৭। বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কেউ এরূপ করলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হবে।

---

[৯০] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৯১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-১১০৪ এর (ঘ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

[৯২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৫ অনুচ্ছেদ বলে প্রতিস্থাপিত।

৮। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্টনের বিষয়ে [উপজেলা][৯৩] কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সংঘটিত কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির নিকট অভিযোগ করতে হবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে কোনো অনিয়মের প্রমাণ পেলে সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত কেস বাতিল করবেন এবং এ বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করবেন।

৯। কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা

বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ মার্চ, ১৯৯৫ সালে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সব খাসজমি কৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ দেশের সব মেট্রোপলিটন এলাকা, সব পৌর এলাকা এবং সব উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত সব প্রকার জমি ব্যতীত এর বাইরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সব খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০। ভূমিহীন পরিবার

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

[(খ) "যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ী আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসেবে গণ্য হবে"।][৯৪]

১১। ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

(খ) নদী ভাঙ্গা পরিবার (যার সব জমি ভেঙ্গে গিয়েছে)।

(গ) [জমি চাষাবাদে সক্ষম বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।][৯৫]

(ঘ) ["কৃষি জমিহীন ও বসতবাড়ীহীন পরিবার"।][৯৬]

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।

["(চ) ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবার।"][৯৭]

[(ছ) (তৃতীয় লিঙ্গ) যথা বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনে অক্ষম বক্তি।] [৯৮]

[(জ) চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা থেকে অপসারিত বসতি স্থাপনকারী বাঙালী।][৯৯]

---

[৯৩] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৯৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূ:/ম: শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৬ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

[৯৫] "সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার" শব্দগুলির পরিবর্তে বন্ধনীর মধ্যে শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৯৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূ:/ম: শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৭ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

[৯৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূ:/ম: শাখা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৮ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

[৯৮] প্রস্তাবিত

[৯৯] প্রস্তাবিত

[(ঝ) শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি।][১০০]

[তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে পরিবারটিকে কৃষির ওপর সরাসরি নির্ভরশীল হতে হবে অর্থাৎ যেকোনোভাবেই তাদের কৃষি শ্রমিক অথবা বর্গা প্রক্রিয়ার অধীন জমির চাষি হতে হবে।][১০১]

১২। (ক) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(খ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) এ সংশোধিত নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং কমিটির কার্যক্রম তদারকি করবেন।

১৩। (ক) কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও তার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবেন এবং এ মর্মে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত কোনো জমি সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপজেলা কমিটির কাছে আপত্তি পেশ করতে হবে। উপজেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সব আপত্তি সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন।

(গ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে তার করা যাবে। জেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তার সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(ঘ জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কাছে তার করা যাবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তার সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে বন্দোবস্তপ্রার্থী ভূমিহীনদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন।

১৫। আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারন করবেন।

---

[১০০] প্রস্তাবিত

[১০১] প্রস্তাবিত

১৬। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক [***][১০২] ভূমিহীন বাছাই ও জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সহকারি কমিশনার (ভূমি) বন্দোবস্ত কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক প্রস্তাব [উপজেলা][১০৩] নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পেশ করবেন।

১৭। [উপজেলা][১০৪] নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাব পাওয়ার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।

১৮। জেলা প্রশাসক প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা কমিটিতে পেশ করবেন এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে ফেরত পাঠাবেন।

১৯। অনুমোদিত প্রস্তাব ফেরত পাওয়ার পর সহকারি কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ১ (এক) টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করে দেবেন, রেজিস্ট্রেশন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলে দেবেন।

২০। কবুলিয়াত সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে [উপজেলা][১০৫] কমিটি বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত জমির দখল বুঝিয়ে দেবেন।

২১। কোনো মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ওই মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের পর আরও জমি থাকলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২২। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে [উপজেলা][১০৬]র বড় বড় হাট-বাজারে লোক সমাগমের দিনে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। [উপজেলা][১০৭] নির্বাহী অফিসার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২৩। [উপজেলা][১০৮] পর্যায়ের সব সরকারি/আধা সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে নোটিশ লটকাতে হবে।

২৪। প্রকৃত ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে [উপজেলা][১০৯] কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা দিলে সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত সব অফিসিয়াল ও নন-অফিসিয়াল সদস্যদের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট দেবেন।

---

[১০২] "ভূমিহীন বাছাই ও" শব্দগুলো বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৩] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৪] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৫] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৬] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৭] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৮] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১০৯] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৫। ভূমিহীনদের নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।

২৬। বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত কৃষি খাসজমি ও চিংড়ী ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

২৭। ["নদী পয়োস্তি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পর্চা ম্যাপের সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে উক্ত কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন এবং এসব জমির যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত পর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত বন্দোবস্ত কেসসমূহ সমন্বয় করতে হবে। তবে উক্ত কার্যক্রম ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।"][১১০]

২৮। আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত কৃষি খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। বর্তমানে আদর্শ গ্রাম সৃজনের জন্য অনুসৃত নীতিমালা/বিধি মোতাবেক অনুরূপ জমিতে আদর্শ গ্রাম সৃজন/প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২৯। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোনো ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্রে কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করলে কিংবা কোনো তথ্য গোপন করলে তাদের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩০। বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোনো বন্দোবস্তগ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোনো আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে [উপজেলা][১১১] ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবে।

৩১। এ নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের কাছে লিখিত আকারে উপস্থাপন করবেন। সদস্য সচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করবেন এবং এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

[সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বরাদ্দ প্রদান সেই সাথে সংরক্ষণসহ খাসজমির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে এবং সব সংশ্লিষ্ট অফিস এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে।][১১২]

৩২। সদস্যদের সব সভায় অন্তত ১/৩ উপস্থিত হলে কোরাম পূর্ণ হবে। যদি কোনো নন-অফিসিয়াল সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল ও শূন্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/মনোনয়ন কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদ পূরণ করতে [তথ্য প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ/মনোনয়নের জন্য অবহিত করা

---

[১১০] প্রস্তাবিত

[১১১] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১১২] প্রস্তাবিত

হবে। কিন্তু উক্ত শূন্যতার জন্য কমিটির কোনো কার্যধারা বা সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না।][১১৩]

[যদি পূর্ণ কমিটির গঠন কোনো কারণে বিলম্বিত হয়, উপজেলা কমিটি আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানানোর এবং খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগাম কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে এটা অবশ্যই পূর্ণ কমিটির কাছে উপস্থাপন এবং অনুমোদন করাতে হবে।] [১১৪]

৩৩। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত গঠিত কমিটিগুলো সর্বদা পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

৩৪। [বেদখলি কৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে খাসজমির অবৈধ দখলদারদেরকে কোনো আইনে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালত সম্পর্কিত আইনের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ভূমি ও আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।][১১৫]

৩৫। জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে জনস্বার্থে এই নীতিমালার যেকোনো ধারা/উপধারা সংশোধন কিংবা পরিবর্তন করতে পারবে।

[যদি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা পাওয়া না যায়, সংশ্লিষ্ট কমিটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তার প্রাথমিক কার্যাবলি চালিয়ে যেতে পারবে।][১১৬]

---

১১৩ প্রস্তাবিত

১১৪ বন্ধনীর মধ্যে অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশিত করা হবে (প্রস্তাবিত)।

১১৫ প্রস্তাবিত

১১৬ প্রস্তাবিত

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসম্পর্কিত আইনঃ প্রস্তাবিত সংশোধনী

১। ভূমিকা

[ভূমি মন্ত্রণালয় কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাসজমিই দেখাশোনা করেন। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত একটি নীতিমালা ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার অনুপস্থিতিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে শহর/নগর অঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোনো না কোনোভাবে প্রভাবশালী মহলের অবৈধ দখলে চলে গেছে এবং তারা দখলের সমর্থনে জালিয়াতির মাধ্যমে জাল কাগজপত্র তৈরি করে আদালত থেকে ডিক্রী লাভ করছে বা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, অকৃষি খাসজমি নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। এ নীতিমালার বিধান অনুসরণ করে স্থানীয় ভূমি কর্মকর্তা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত বিষয় সুরাহা করার চেষ্টা করতেন। এটা কার্যকর থাকার সময়ে, এ নীতিমালায় বেশকিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কয়েক বছর পর সরকার খাসজমি বন্দোবস্তের ধারণা পরিত্যাগ করেন। এর ফলে, একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ভূমি কর্মকর্তাদের পরোক্ষ সমর্থনে ভূমিদস্যুরা অকৃষি খাসজমি দখলে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এ পটভূমির আলোকে, একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন নীতিমালাটি অকৃষি খাসজমির সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বিতরণ, এবং বন্দোবস্তের জন্য বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।][১১৭]

২। সংজ্ঞা

(ক) **অকৃষি খাসজমিঃ** [খাসজমি যা কৃষি জমি নয় তাদের অবস্থান নির্বিশেষে অকৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে।][১১৮]

(খ) **[উপজেলা][১১৯] সদরঃ** যেক্ষেত্রে [উপজেলা][১২০]র মধ্যে পৌরসভা অবস্থিত সে সব থানার অঞ্চলসমূহ [উপজেলা][১২১] সদর অঞ্চল হিসেবে এবং অন্যান্য থানা অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারদের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে [উপজেলা][১২২] সদর এলাকা হিসেবে গণ্য করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সব [উপজেলা][১২৩] সদরের সীমানা চিহ্নিতকরণের কার্য সম্পাদন করবেন। যদি ভবিষ্যতে কোনো [উপজেলা][১২৪] সদরে পৌরসভা

---

১১৭ প্রস্তাবিত

১১৮ প্রস্তাবিত

১১৯ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২০ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২১ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২২ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২৩ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২৪ "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ থেকে পৌরসভা এলাকাকেই ওই থানার উপজেলা সদর হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(গ) **বাজার দর:** [বন্দোবস্তের জন্য অকৃষি খাসজমির মূল্য বাজার দরের ভিত্তিতে যথাযথ মূল্য নিরূপণের নিমিত্তে গঠিত একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।][১২৫]

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালা

(ক) [সরকারি প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তকরণ করা যেতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জমির যথাযথ মূল্য প্রদান করা হবে।][১২৬]

(খ) সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং ৩.০ একর খাসজমি যথাক্রমে মহানগর এলাকায় এবং জেলা ও উপজেলা সদরে সমবায় সমিতির পক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩০ (ত্রিশ) জন [প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা][১২৭] নিয়ে বহুতল আবাসিক ভবন (ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) তলা ভবন) নির্মাণের জন্যে গঠিত হয়েছে। কোনো মুক্তিযোদ্ধাই যিনি জেলা বা মহানগর এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির মালিক তিনি সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। বহুতল ভবনের নির্মাণের উদ্দেশ্যে, সমবায় সমিতিটির প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের প্রতি ০.২৫ একর (২.৫ শতাংশ) বিবেচনায় রেখে খাসজমি নির্ধারণ এবং বরাদ্দ করা হবে। এ ধরনের বরাদ্দে বিধি অনুসারে নির্ধারিত সেলামী পুনরুদ্ধার করা হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার প্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। [সেই জমিতে নতুন কাঠামো উলম্বভাবে নির্মাণ করা হবে।][১২৮]

(গ) অকৃষি খাসজমি মহানগর ও জেলা শহর এলাকার বাইরে দুগ্ধ খামার, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। দুগ্ধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর এবং হাঁস-মুরগির খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর বরাদ্দ করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে এ বরাদ্দ ১০ (দশ) বছরের জন্যে হতে পারে। যদি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায় এবং যদি সব শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হয়, তাহলে প্রশাসনের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ওইরূপ জমির বরাদ্দ একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা না যায়, অথবা যদি এটি পরিত্যক্ত করা হয়, অথবা যদি বরাদ্দের শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হয়, তাহলে বন্দোবস্ত যেকোনো সময় বাতিল করার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জমিতে হাঁস-মুরগির অথবা দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তিনি তার জমি সংলগ্ন অকৃষি খাসজমি বরাদ্দ পাবেন, কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) মহানগর এলাকার বাইরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বা যৌথ উদ্যোক্তাদের পক্ষে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমির এলাকা অনুমোদিত প্রকল্পের অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কিন্তু মহানগর এলাকায়

---

[১২৫] প্রস্তাবিত

[১২৬] প্রস্তাবিত

[১২৭] "সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত" শব্দগুলোর পরিবর্তে "প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা" শব্দটি প্রতিস্থাপিনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১২৮] প্রস্তাবিত

প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি আন্তর্জাতিক মানের (তিন তারকা অথবা অধিক) হোটেল / মোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

(ঙ) অভিবাসী বাংলাদেশীদের মহানগর এলাকায় ০.১০ একর এবং অনধিক ৩ একর জমি জেলা সদর এলাকায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বহুতল ভবন [অন্তত ৫ (পাঁচ) তলা ভবন] নির্মাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে জমির পূর্ণ মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। প্রতি পরিবারের শুধু একজন সদস্য উক্ত বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবে। [****][১২৯]।

(চ) যদি একজন আবেদনকারী নগরাঞ্চলের বাইরে শিল্প-কারখানা নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ ব্যবস্থা করতে পারে, সংলগ্ন জমির ১/৪ অংশ [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে][১৩০] বরাদ্দ করা যেতে পারে।

(ছ) [অকৃষি খাসজমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। নির্ধারিত মূল্যের ১০% -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। উলম্ব বিস্তারের জন্য কোনো সুযোগ না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমি পাবে।][১৩১]

(জ) যদি সংশ্লিষ্ট অকৃষি খাসজমি কোনো সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় না হয়, তাহলে জমির পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও আইনগতভাবে অপুনর্বাসিত ব্যক্তিগণকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। জমির এলাকা ০.০৫ একর অতিক্রম করবে না। কিন্তু এ ধরনের বরাদ্দ নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রযোজ্য হবে না।

(ঝ) অকৃষি খাসজমির বরাদ্দ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক এবং জাতীয়পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির বরাবরে করা যেতে পারে। সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে][১৩২] মহানগর এলাকায় ০.০৫ একর এবং মহানগর এলাকার বাইরে ০.০৮ একর জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে [এ শর্ত সাপেক্ষে যে, ওইরূপ জমি তার নিজ অথবা স্ত্রীর, অথবা নির্ভরশীল সন্তানের নামে নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখকদের অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হবে। এ শ্রেণির ব্যক্তি যদি জাতীয় পুরস্কার, যেমন: একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমি ইত্যাদি পুরস্কারপ্রাপ্ত হন তাহলে তারা বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন / বরাদ্দের জন্য যোগ্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন।][১৩৩]

৪। বন্দোবস্ত কার্যক্রম

(ক) মহানগর এলাকায়, যদি নিলামের মাধ্যম ছাড়াই বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

---

[১২৯] "বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসেবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বন্দোবস্ত দেয়া হবে" বাক্যটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১৩০] "বাজার দর" শব্দটির পরিবর্তে "কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য" শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১৩১] প্রস্তাবিত

[১৩২] "বাজার দর" শব্দটির পরিবর্তে "কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য" শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১৩৩] প্রস্তাবিত

(খ) জেলা শহরে ০.০৮ একর (৮ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [উপজেলা][১৩৪] সদরে ০.১৬ একর (১৬ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [অন্যান্য পৌর বা শহর এলাকায়][১৩৫] ০.৩০ একর (৩০ শতাংশ) অথবা এ সীমার অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুমোদন [ভূমি মন্ত্রণালয়][১৩৬] থেকে দেয়া হবে। [পূর্ববর্ণিত অঞ্চলের ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে, বন্দোবস্তের বিষয়সমূহ বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হবে।][১৩৭]
(গ) সব ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

৫। [কমিটি গঠন

ক. **জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি**

(১) **সভাপতি**
মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(২) **সহসভাপতি**
প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(০৩-০৯) **সদস্যবৃন্দ**
সাতটি বিভাগ থেকে ৭ (সাত) জন সংসদ সদস্য (মাননীয় স্পিকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।
(১০) একজন মহিলা সংসদ সদস্য (সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত হবেন)।
(১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ।
(১২) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
(১৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
(১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(১৬) চেয়ারম্যান, রাজউক।
(১৭) চেয়ারম্যান, সিডিএ।
(১৮) চেয়ারম্যান, ভূমি তার বোর্ড।
(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার কমিশন।
(২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
(২১) সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
(২২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
(২৩) একজন এনজিও প্রতিনিধি (ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।
(২৪) মুক্তিযোদ্ধাদের একজন প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।
(২৫) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব
(২৬) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

---

[১৩৪] "থানা" শব্দটির পরিবর্তে "উপজেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১৩৫] প্রস্তাবিত
[১৩৬] "ভূমি সংস্কার বোর্ড" শব্দটির পরিবর্তে "ভূমি মন্ত্রণালয়" শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
[১৩৭] প্রস্তাবিত

জাতীয় কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সাথে অবৈধ দখলকারীদের হাত থেকে অকৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(২) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন।

(৩) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন।

(৪) প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একবার বৈঠক করা।

(৫) সভাপতিসহ ৯ (নয়) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

খ. জেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(১) সভাপতি

সভাপতি/প্রশাসক, জেলা পরিষদ

(২) সহসভাপতি

জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

(৩) পুলিশ সুপার।

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

(৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, যদি থাকে।

(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ।

(৭) বিভাগীয় পরিবেশ কর্মকর্তা।

(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

(৯) জাতীয় মহিলা পরিষদ থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১০) জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১১) মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর।

জেলা কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বিতরণের বিধি/নীতিমালা প্রকাশ।

(২) যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের জন্যে উপজেলা কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন এবং উপজেলা কমিটির কার্যক্রম নিরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান।

(৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক কৃত কোনো অনিয়মের তদন্ত করা ও আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন শুনা।

(৫) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বৈঠক করা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়া।

(৬) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

গ. উপজেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সংসদ সদস্য এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

(১) সভাপতি
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
(২) সহসভাপতি
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদস্যবৃন্দ
(৩) উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি।
(৪) উপজেলা সমবায় অফিসার।
(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা পুলিশ স্টেশন।
(৬) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ।
(৭) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।
(৮) পৌরসভা মেয়র/মেয়রবৃন্দ।
(৯) জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।
(১০) উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
(১১) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
(১২) মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।
সদস্য-সচিব
(১৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ।

উপজেলা কমিটির কার্যাবলী:
(১) বন্দোবস্তের জন্যে অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ এবং উদ্ধারকরণ।
(২) উদ্ধারকৃত অকৃষি খাসজমি বিতরণের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র জমিখন্ডে বিভক্তিকরণ।
(৩) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্যে সরকারি নীতিমালার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে আবেদনপত্র আহ্বান ।
(৫) প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই, এবং সংক্ষিপ্ত/অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
(৬) নির্বাচিত আবেদনকারীদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা।
(৭) জমির বন্দোবস্তপ্রাপ্তদেরকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।
(৮) বন্দোবস্ত প্রাপক কর্তৃক বন্দোবস্তের শর্তাবলী প্রতিপালন তদারকিকরণ।
(৯) বন্দোবস্তের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশকরণ।
(১০) প্রতি ২ (দুই) মাসে একবার বৈঠক করা।
(১১) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।][১৩৮]

৬। [আইনের প্রাধান্য
নীতিমালায় উল্লেখিত কমিটি সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে গঠিত হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে বিলম্বের ক্ষেত্রে, উপজেলা কমিটি তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবে কিন্তু বন্দোবস্তের প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।][১৩৯]

---

[১৩৮] প্রস্তাবিত
[১৩৯] প্রস্তাবিত

৭। [আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যক্রম

(ক) আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ফরমে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে আবেদন করবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে জমা দেবে। উক্ত কার্যালয় আবেদনকারীদের আবেদনের রশিদ প্রদান করবেন এবং যথা সময়ে তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) সদস্য-সচিব ইউনিয়ন ভিত্তিক আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করবে এবং যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকার সাথে অযোগ্য আবেদনের (যদি থাকে) তালিকা প্রত্যাখ্যানের কারণসহ প্রকাশ করবেন।

(গ) উপজেলা কমিটি সঙ্গত যাচাই-বাছাইয়ের পরে আবেদনকারীদের নির্বাচিত করবেন। কমিটি আবেদনপত্র পর্যালোচনাকালে আবেদনকারীদের ডাকতে পারবে।

(ঘ) প্রাথমিক নির্বাচনের পরে, কমিটি এলাকা পরিদর্শন করবে এবং নির্বাচন চূড়ান্ত করবে। আবেদনকারীগণ তাদের পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি জমা দেবে।

(ঙ) একটি যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যকে ভূমি দেয়া যাবে না এবং এটা স্বামী এবং স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হবে।

(চ) আবেদনকারীকে জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায় ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অধিক জমি বরাদ্দ করা যাবে না।

(ছ) বন্দোবস্ত দেয়া জমি বন্দোবস্তের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কারো কাছে অন্য কোনো উপায়ে কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না।

(জ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমিসংক্রান্ত কোনো আইন / অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

(ঝ) উপজেলা কমিটি দ্বারা সংঘটিত কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির বরাবরে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে। জেলা কমিটি অভিযোগ তদন্ত করবেন, এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন যা বন্দোবস্ত বাতিলকরণ পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

(ঞ) জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আপত্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির বরাবরে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং জাতীয় কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অভিযোগ নির্ধারণ করবেন এবং এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।][১৪০]

৮। [বিবিধ

(ক) যোগ্য আবেদনকারীগণের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের নোটিশ সব সরকারি-আধা সরকারি সেই সাথে বেসরকারি অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দিতে হবে।

---

[১৪০] প্রস্তাবিত

(খ) উপজেলা কমিটির সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। কোনো অসম্মতির ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সমান ভোটের ক্ষেত্রে, সভাপতির নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট থাকবে।

(গ) ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সার্বিক সতর্কতা এবং কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাপক বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রশমিত করতে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

(ঘ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমিসংক্রান্ত কোনো আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

(ঙ) বনভূমি এবং চিংড়ি ও লবণ চাষের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত খাসজমি এ নীতির আওতায় বরাদ্দ দেয়া হবে না।

(চ) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত সব কমিটি তাদের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

(ছ) প্রয়োজনানুসারে, জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি এ নীতির কোনো বিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবেন।][১৪১]

---

[১৪১] প্রস্তাবিত

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪][১৪২]: প্রস্তাবিত সংশোধনী

শিরোনাম: নীতিমালাটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, [২০১৪][১৪৩] হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১. দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪][১৪৪]' প্রণয়ন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ২. প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞা:

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানত: জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবে।

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোনো সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়, তবে সে সমিতি কোনো সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোনো ব্যক্তি বা কোনো অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবে না।

(গ) জলমহাল বলতে এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোব, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এরূপ জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ৩. সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল:

(ক) সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে যেসব জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ন্যস্ত করা হবে সেসব জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোনো সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এসব জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের "জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১" কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

---

[১৪২] "২০১৩" এর পরিবর্তে "২০১৪" প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৪৩] "২০১৩" এর পরিবর্তে "২০১৪" প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৪৪] "২০১৩" এর পরিবর্তে "২০১৪" প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০ বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি প্রদান করবেন।

(কক)(১) সাধারণভাবে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (উচ্চ) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ অথবা ৬ (ছয়) বৎসর, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, সেই মেয়াদের জন্য সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত/কার্যকর হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) বছরের অধিক হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথম ৬ (ছয়) বছর পর অনধিক ৬ (ছয়) বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে, সমঝোতা স্মারকটি নবায়ন করা যাবে। এরূপ নবায়নের প্রয়োজন হলে, সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত: ৬ (ছয়) মাস পূর্বে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(২) সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে কোনো জলমহাল হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেলে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে উক্ত জলমহাল বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। [টেকসই ব্যবহারের জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।][১৪৫]

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। [প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবহস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে"।][১৪৬]

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোনো জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাঙ্খিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে।

(ঙ) কোনো জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

---

১৪৫ প্রস্তাবিত

১৪৬ "জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দুই বছর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবহস্থাপনা করবেন" বাক্যটি বিলুপ্ত করে "প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবহস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে" বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪. ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

(ক) যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সব বদ্ধ সরকারি জলাশয়সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সব বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, এবং যুব মৎস্যজীবীদের (যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে)[১৪৭] নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

(খ) ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন কোনো মৎসজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে, সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণে, কেবল সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের কাছাকাছি অবস্থানে বসবাসরত নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজ সেবা অধিদপ্তরে স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাবে:

(১) বেকার যুবক;
(২) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান;
(৩) যুব মহিলা;
(৪) বিধাবা ও স্বামী পরিত্যক্তা;
(৫) আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য; এবং
(৬) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি।

তবে, কোনো পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

(গ) এ অনুচ্ছেদের দফা (খ) এর অধীন কোনো জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একর প্রতি বার্ষিক ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা এ হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৫. "জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি" কর্তৃক ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

"জাল যার জলা তার" এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে [২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে][১৪৮] জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে:

(১) নির্দিষ্ট জলমহালে নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোনো ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকে যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

---

[১৪৭] প্রস্তাবিত
[১৪৮] প্রস্তাবিত

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোনো সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবে ও বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

[(২) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি গঠন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবীদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র, বেসরকারি সংস্থা, সেমিনার এবং মাইকিং করে বা প্রয়োজনে ঢোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কর্মসূচি শুরু করতে হবে।][১৪৯]

[(৩)][১৫০] নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং[১৫১] ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং[১৫২] ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবে এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবে।

[(৪)][১৫৩] উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীকালে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহালসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এ নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দেবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দেবেন।

[(৫)][১৫৪](ক) ২০ (বিশ) একরের ঊর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ যা স্থানীয় মৎস্যজীবী/জেলে সংগঠনের অনুকূলে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিবন্ধনকৃত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে [১০ (দশ)][১৫৫] বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিলসহ) তৈরি করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দেবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এটার ওপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য

---

[১৪৯] প্রস্তাবিত

[১৫০] "২" এর স্থলে "৩" প্রস্তাবিত

[১৫১] প্রস্তাবিত

[১৫২] প্রস্তাবিত

[১৫৩] "৩" এর স্থলে "৪" প্রস্তাবিত

[১৫৪] "৪" এর স্থলে "৫" প্রস্তাবিত

[১৫৫] "৩ (তিন) বৎসর" এর পরিবর্তে "১০ (দশ) বৎসর" প্রস্তাব করা হয়েছে

নির্ধারিত হবে এবং এর কম মূল্যে কোনো সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্য পাওয়া না যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহালসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির কাছে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রত্রিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে [এবং উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে][১৫৬] প্রকাশ করবেন। আবেদন আহবানের ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের কাছাকাছি/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে। [মাইকিং করে বা প্রয়োজনে ঢোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কাজ করতে হবে।][১৫৭] ইজারা দেয়ার জন্য শুধু রেজিস্ট্রিকৃত প্রকৃত মৎস্য সংগঠনকে আবেদন করার আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(ঘ) এ নীতিতে উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রের কপি (নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি, প্রশংসাপত্র এবং ব্যাংক একাউন্টের লেনদেনসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি) সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি [১০ (দশ) বৎসর][১৫৮] মেয়াদী লিজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন রোধ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইজারার মেয়াদ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। [ইজারার মেয়াদের মধ্যে কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত ইজারা সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে।][১৫৯]

(ঙ) আবেদনকারী কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহালে বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কতৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করবে এবং সাথে বিগত ৩ (তিন) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

(চ) জলমহালটি যে জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী বা কাছাকাছি সেই জেলার প্রকৃত মৎসজীবী সমিতিকে জলমহালটি ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।

---

[১৫৬] প্রস্তাবিত

[১৫৭] প্রস্তাবিত

[১৫৮] “৩ (তিন) বৎসর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বৎসর” প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৫৯] প্রস্তাবিত

(ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোনো জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোনো জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহালসংক্রান্ত কোনো সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবে। লিজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লিজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লিজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

(ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই-বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪][১৬০] এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটিমাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সেই সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত নির্বাচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবে।

(ঞ) সময়মত লিজমানি পরিশোধ না করা, বা তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোনো অনিয়মের কারণে কোনো জলমহালের লিজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লিজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ট) কোনো কারণে কোনো জলমহাল সঠিকভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বৎসর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবে। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম যার মূল্য হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এ অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১) জমা করতে হবে।

(ঢ) লিজগ্রহিতা কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লিজকৃত জলমহাল কোনো অবস্থাতেই সাবলিজ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লিজ বাতিল করে দেবেন এবং জমাকৃত লিজমানি সরকারের অনুকূলে

[১৬০] "২০১৩" সংখ্যাটির স্থলে "২০১৪" সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লিজগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্তসংক্রান্ত কোনো আবেদন করতে পারবে না। [লিজগ্রহীতার লিজ বাতিল হওয়ার পর সাব-লিজ চালানের কোনো অজুহাত অনুমতি দেয়া যাবে না এবং এরূপে হস্তান্তরগ্রহীতাকে জলমহালের দখল থেকে অনতিবিলম্বে উৎখাত করা হবে।][১৬১]

[(৬)][১৬২] কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুইটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

[(৭)][১৬৩] ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ (বিশ) একরের ঊর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

(ক) [জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক][১৬৪]---------------------------------- সভাপতি][১৬৫]
(খ) [জেলা প্রশাসক---সহসভাপতি][১৬৬]
(গ) পুলিশ সুপার --সদস্য
(ঘ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) --সদস্য
(ঙ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ---সদস্য
(চ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা --সদস্য
(ছ) উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর --সদস্য
(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড --সদস্য
(ঝ) উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ---সদস্য
(ঞ) বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক ------------------------------------সদস্য
(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার --সদস্য
(ঠ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা --সদস্য
(ড) অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
(জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) ---------------------------------সদস্য
(ঢ) ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----------সদস্য
(ণ) নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----------------সদস্য
(ত) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) ------------------------------------সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এ সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তার অধীনস্থ যেকোনো অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যেই জেলায় অধিক হবে সেই জেলার উপরে উল্লেখিত সবাইকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার

[১৬১] প্রস্তাবিত
[১৬২] "৫" এর স্থলে "৬" প্রস্তাবিত
[১৬৩] "৬" এর স্থলে "৭" প্রস্তাবিত
[১৬৪] "জেলা প্রশাসক" এর স্থলে "জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক " প্রস্তাব করা হয়েছে
[১৬৫] প্রস্তাবিত
[১৬৬] প্রস্তাবিত

আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। জেলা জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যেসব জলমহাল ইজারা দেয়া হয়েছে তা পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

[(৮)][১৬৭] সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

[(৯)][১৬৮] প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১লা মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করবেন।

[১০][১৬৯] ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্ত, কোনো জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোনো জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

[(১১)][১৭০] জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের করতে পারবে এবং বিভাগীয় কমিশনার [১৫ (পনের) কর্মদিনের][১৭১] মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ডের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং ভূমি আপিল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার ঊর্ধ্বে মূল্যমানের জলমহালসমূহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন। আন্তজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবে। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকলে ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবে। ভূমি আপিল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

[(১২)][১৭২] জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে 'জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১' নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেবে। জামানতের অর্থ শেষ

---

[১৬৭] "৭" এর স্থলে "৮" প্রস্তাবিত

[১৬৮] "৮" এর স্থলে "৯" প্রস্তাবিত

[১৬৯] "৯" এর স্থলে "১০" প্রস্তাবিত

[১৭০] "১০" এর স্থলে "১১" প্রস্তাবিত

[১৭১] "৭ (সাত) কর্ম দিন" এর স্থলে "১৫ (পনের) কর্ম দিন" প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৭২] "১১" এর স্থলে "১২" প্রস্তাবিত

বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

[(১৩) ইজারাপ্রাপ্ত বা ইজারা পাওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যদি জলমহাল ইজারাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সরকার বা জেলা প্রশাসকের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য মোকদ্দমা করতে আগ্রহী হয় তাহলে এ নীতিতে বর্ণিত সব পদক্ষেপ গ্রহণ অন্তে এ মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করবেন এবং নোটিশ প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিন সমাপ্ত হওয়ার পর নোটিশের একটি অনুলিপি আরজির সাথে সংযুক্ত করে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।][১৭৩]

অনুচ্ছেদ ৬. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

(১) উপজেলাপর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

(ক) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান---চেয়ারম্যান][১৭৪]
(খ) [উপজেলা নির্বাহী অফিসার ---ভাইস-চেয়ারম্যান][১৭৫]
(গ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা---সদস্য
(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা --সদস্য
(ঙ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ---সদস্য
(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ---সদস্য
(ছ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা --সদস্য
(জ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ---সদস্য
(ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ---সদস্য
(ঞ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান --সদস্য
(ট) অনুমোদিত মৎসজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
(উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) ------------------------------সদস্য
(ঠ) স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) -----------সদস্য
(ড) উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)--সদস্য
(ঢ) উপজেলাপর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)--সদস্য
(ণ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) --সদস্য-সচিব

---

[১৭৩] প্রস্তাবিত

[১৭৪] "উপজেলা নির্বাহী অফিসার-----------আহবায়ক" শব্দগুলো " উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান------------ চেয়ারম্যান " শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৭৫] প্রস্তাবিত

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সেই উপজেলায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। [চেয়ারম্যানসহ][১৭৬] ন্যূনতম [৬ (ছয়) জন][১৭৭] সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

(২) [সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।][১৭৮]

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম:

(ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এ নীতি অনুসারে ৫ নং অনুচ্ছেদের [(১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)][১৭৯] এ বর্ণিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দেবে।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি [১০ (দশ) বছরের][১৮০] জন্য ইজারা প্রদান করবে। কোনো জলমহাল একাধিক উপজেলাসংশ্লিষ্ট হলে, বেশির ভাগ জলমহাল যেই উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যেই উপজেলা/উপজেলাসমূহে অবস্থিত হবে সেসব উপজেলা/উপজেলাসমূহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসেবে সংযুক্ত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলোর কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(ঘ) যেই সব সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে; সেইগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কর্যক্রম গ্রহণ করছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা;

(ঙ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;

(চ) জরিপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা (ছবিসহ);

(ছ) উপজেলায় ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সব জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

---

[১৭৬] “আহবায়কসহ ” শব্দটি “চেয়ারম্যানসহ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৭৭] “৫ (পাঁচ) জন” এর স্থলে “৬ (ছয়) জন” প্রস্তাবিত

[১৭৮] “উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।” শব্দগুলোর স্থলে “সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন ” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

[১৭৯] “(১), (২), (৩), (৪) ও (১১)” সংখ্যাগুলো “ (১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)” সংখ্যাগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৮০] “৩ (তিন) বছর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বছর” প্রস্তাব করা হয়েছে

(৪) কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

(৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল দায়ের করতে পারবে এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে আপিল নিস্পত্তি করবে। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় কমিশনার ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোনো জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোনো জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবে।

(৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ (এক) মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করবে।

অনুচ্ছেদ ৭. উপজেলা প্রকল্পের আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সীমতি সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);
- (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;
- (গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সব সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;
- (ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এ মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;
- (ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবে এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবে এমন অঙ্গীকারনামা;
- (চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির কাছে সরকারি কোনো বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।

(২) 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় কোনো জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাঝে প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৭ (১) এর তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন ২ (দুই) মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এর পরে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এ নীতি, [২০১৪][১৮১] জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দেবে। উক্ত টাকা ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোনো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোনো জলমহাল 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতাই ইজারা প্রদানের জন্য এ নীতিতে উল্লেখিত ৭ (১), ৭ (২), ৭ (৩) ও ৭ (৪) অনুচ্ছেদের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪ (চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবে এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদানসংক্রান্ত এ কমিটির যেকোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়---সভাপতি
(খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়---------------------------------------[সহসভাপতি][১৮২]
(গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়---সদস্য
(ঘ) অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়--সদস্য
(ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়--সদস্য
(চ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়---সদস্য
(ছ) সংশ্লিষ্ট উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়--সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সভায় কোনো কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। [চেয়াম্যানসহকারে ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার জন্য কোরাম হবে।][১৮৩]

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যা বেশি হয় তার মূল্যের ওপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মুল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো জলমহাল কোনো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা - ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১নং কোডে) জমা প্রদান করবে। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের

---

[১৮১] "২০০৯" এর পরিবর্তে "২০১৪" প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৮২] "সদস্য" শব্দটির পরিবর্তে "সহ-সভাপতি" শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে

[১৮৩] প্রস্তাবিত

মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোনো অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎসজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কি না জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মুল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রাণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) কোনোক্রমেই কোনো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১ (এক) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোনো অবস্থাতেই 'মা' মাছ শিকার করতে পারবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮. আবেদন ফর্ম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহালসংক্রান্ত সব আয়ের অর্থ "জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩২/০০০০/১২৬১" নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০শে বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার এর কাছে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৯. ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনোক্রমেই সাবলিজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলিজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ওই ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোনো জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহালসমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক ভূমি মন্ত্রাণালয় প্রস্তুত করবে। সেই ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১১. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যেকোনো সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০শে চৈত্র তা শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে কোনো কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

অনুচ্ছেদ ১২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সেই জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩. ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে কি না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৪. এ নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত [][১৮৪] খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যেসব খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোনো সময় বৃদ্ধি করা যাবে না এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫. নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এ নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না:

(ক) গুচ্ছ গ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প/অনুরূপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;

(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারি কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;

(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান পাবলিক ইজমেন্টের ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ। এ দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কোন কোন পুকুর/জলাশয় পাবলিক ইজমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের পর উক্ত তালিকা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ;

(চ) ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে পুকুর/দিঘী/জলমহাল সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলে ভূমি মন্ত্রণালয় সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পর্যটন এর গুরুত্ব বিঘ্ন না ঘটিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা লিজ প্রদান করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৬. কোনো যুক্তিসংগত কারণে কোনো জলমহাল [২০ (বিশ) একরের আহ্বান বা ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত] নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবে। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহ্বান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট

---

[১৮৪] "২০ একর পর্যন্ত" শব্দগুলো বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে

সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কলেকশন-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দেবে এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা যাবে:

(ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) --আহবায়ক
(খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা---সদস্য
(গ)ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান---সদস্য
(ঘ) উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ---সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা -----------------------------------সদস্য সচিব

উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় 'মা' মাছ নিধন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৭. দেশের সব জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সব তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্লাটফরমে ব্যবহার্য সফটওয়ার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রাণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরি ও সফ্‌টওয়্যার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১৮. (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা করবে।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ওপর ইজারাগ্রহীতার সব অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোনো জলমহালের ওপর ইজারাগ্রহীতার কোনো প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সব অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোনো সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৯. সব বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্ম পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তার জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাল-নাগাদ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২২. যেসব জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। সেসব বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের ঊর্ধ্বের সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩. সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবে (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

অনুচ্ছেদ ২৪. সরকারি জলমহাল/ইজারা বন্দোবস্তগ্রহীতা নিবন্ধিত কোনো মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোনো জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোনো সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৫. মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে 'সংরক্ষিত' (Reserve) জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৭. বদ্ধ বা উন্মুক্ত, কোনো জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২৮. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবে যাতে প্রকৃত মৎসজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়। এরূপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারার গড় মূল্যের ওপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৯. উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্থান নির্বচান করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরূপ স্থান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, যেমন-মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং "মা" মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সঙ্গতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এ হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩০. জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোনো পাখি শিকার করতে পারবে না। এ কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/নিবন্ধিত এনজিও এবং জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা [২০০৯][১৮৫] এর আলোকে ইজারাধীন যে সব জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনো শেষ হয় নাই সে সব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কি না তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কি না, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কি না এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লিজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪][১৮৬] এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৩. সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয়পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

মাননীয় ভূমি মন্ত্রী--সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী---সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী---সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী--সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী---সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়--সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়---সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় --সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়---সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় --সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ---সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়---সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪. জলমহাল ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সব আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/ নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অনুচ্ছেদ ৩৫. এ নীতিতে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যেকোনো বন্দোবস্ত /ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

---

[১৮৫] "- ২০০৫" চিহ্নটি ও সংখ্যটির স্থলে "২০০৯" সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

[১৮৬] "২০০৯" সংখ্যটির স্থলে "২০১৪" সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

আমাদের দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অপরিকল্পিত বাসগৃহ নির্মাণ, উন্নয়ন কাজে ভূমি ব্যবহার, শিল্প, কারখানা, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক ইত্যাদি নির্মাণকাজে ভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে। ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি ও ধরন ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে, আর ভূমির এরূপ ব্যবহারের ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও দেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কৃষি ভূমি, বনাঞ্চল, পাহাড়, টিলা শ্রেণির ভূমি, জলাশয় ধ্বংসের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশও ইস্ট হচ্ছে। সুতরাং, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, ভূমির শ্রেণি ও প্রকৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্পকারখানা, রাস্তা বা মহাসড়ক নির্মাণ বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও আরম্ভ

এই আইন কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হবে। সরকারি গেজেটে প্রকাশিত নির্ধারিত তারিখ হতে এই আইন কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(১) “কৃষি” বলতে বোঝাবে এবং অন্তর্ভুক্ত করবে, মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্য ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ, প্রাণি এবং অন্যান্য জীবণক্রম চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের বিজ্ঞান বা অনুশীলন।

(২) “কৃষি জমি” বলতে বোঝাবে কৃষি কাজ করা হয় এমন জমি।

(৩) “কৃষি নির্ভর বা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প” বলতে এমন শিল্প বোঝাবে, যা কাঁচামালের জন্য কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ব্যাখা: এই উপধারায় “কৃষি প্রক্রিয়াকরণ” বলতে, কৃষি হতে জুস, পেস্ট, জ্যাম, জেলি, সস, আচার, কমলালেবুর আচার, পাস্তুরায়ন, বেকিং, পটেটো চিপস, চিংড়ি বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অন্যান্য কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা স্কোয়াশ করাকে বোঝাবে।

(৪) “অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ” বলতে এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে।

(৫) “এওয়াজ বা বিনিময়” বলতে বোঝাবে দুইজন ব্যক্তি পারস্পরিক সমোঝতার মাধ্যমে অর্থ ব্যতীত যেকোনো জিনিসের মালিকানার বিনিময়ে অপর একটি জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর করা। বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর হতে পারে বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

(৬) “বালুমহাল” বলতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক বিশেষভাবে ঘোষিত ওইসব খোলা জায়গা বা নদী তীরবর্তী ভূমিকে বোঝাবে যেখানে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত আছে।

(৭) "চিংড়িমহাল" বলতে বোঝাবে ও অন্তর্ভুক্ত করবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩০ মার্চ, ১৯৯২ তারিখে ঘোষিত চিংড়িমহাল বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিংড়ি চাষের এলাকা।

(৮) "কালেক্টর" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(৯) "কমিটি" বলতে এই আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি বোঝাবে, যেমনঃ জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি, ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, জেলা ভূমি জোনিং ও ব্যবহার কমিটি, উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি, ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ব্যবহার কমিটি।

(১০) "কমিশনার" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(১১) "চাষী" বলতে সেসব ব্যক্তিকে বোঝাবে যারা নিজের বা বর্গাকৃত ভূমি নিম্নোক্তভাবে চাষ করে:

(ক) চাষী নিজ পরিশ্রম দ্বারা; বা

(খ) তার পরিবারের কোনো সদস্যের শ্রম দ্বারা; বা

(গ) ভাড়া করা শ্রমিকদের শ্রম দ্বারা; বা

(ঘ) তার নিজের শ্রম সম্পূর্ণ করার জন্য মজুরিতে নিযুক্ত কোনো শ্রমিকের শ্রম দ্বারা।

(১২) "ডেপুটি কমিশনার" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(১৩) "এস্টেট" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(১৪) "বনাঞ্চল" বলতে ১৯২৭ সালের বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত বনাঞ্চলকে বোঝাবে।

(১৫) "সরকার" বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে বোঝাবে।

(১৬) "হোল্ডিং" বলতে একজন ভাড়াটে প্রজা (মালিক) দ্বারা অনুষ্ঠিত পৃথক প্রজাস্বত্ব বিষয়ক একখণ্ড, বহুখণ্ড বা ভূমির অবিভক্ত অংশকে বোঝাবে।

(১৭) "বাসগৃহ" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(১৮) "খাসজমি" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

(১৯) "ভূমি" বলতে আবাদী, অনাবাদী, অথবা বছরের যেকোনো সময় পানিতে ভরে থাকে এরূপ জমি এবং জমি হতে উদ্ভূত সব সুবিধা, সকল উন্মুক্ত বা বদ্ধ মৎস্য খামার, ঘরবাড়ি বা দালান-কোঠা এবং মাটির সঙ্গে সংলগ্ন অন্যান্য দ্রব্য অথবা মাটির সঙ্গে সংলগ্ন যেকোনো দ্রব্যের সাথে স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করবে কিন্তু কোনো সাগর বা উপসাগরকে নয়।

(২০) "ভূমিহীন" পরিবার বলতে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ওইসব পরিবার অন্তর্ভুক্ত করবে যাদের কোনো বসতবাড়ি বা আবাদী জমি নাই অথবা, কৃষির ওপর নির্ভরশীল ওইসব

পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করবে যাদের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ি আছে কিন্তু কোনো আবাদী জমি নাই।

(২১) "ভূমি জোনিং" বলতে এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে জমি বর্তমান ব্যবহার উপযুক্ততা এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘোষিত নির্দিষ্ট ভূমি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২২) "ভূমি জোনিং ম্যাপ" বলতে ভূমির বর্তমান ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উপযুক্ততার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ম্যাপ।

(২৩) "অকৃষি প্রজা" অর্থ একজন প্রজা যার জমি দখলে রাখার উদ্দেশ্য কৃষি বা উদ্যানতত্ত্ব বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত না তবে, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ইজারা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার ইজারাসূত্রে ভূমির উপর নির্মিত দালান-কোঠা ও সংলগ্ন প্রয়োজনীয় জমি দখলে রাখে সে এটির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(২৪) "বিধি" বলতে এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২৫) "রাজস্ব কর্মকর্তা" বলতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইস্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)।

(২৬) "সায়রাতমহাল" বলতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিভিন্ন রাজস্ব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হবে, যেখান হতে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্য সকল কর গৃহীত হবে, এবং যা জলাশয়, বালুমহাল, পাথরমহাল, হাট-বাজার, খেয়াঘাট, ফেরিঘাট, বাগানমহাল, খরমহাল ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২৭) "চা বাগান" বলতে একক ব্যবস্থাপনায় এক খণ্ড বা বহুখণ্ড জমির সমন্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২৮) "গ্রাম" অর্থ সরকার কর্তৃক বা সরকার দ্বারা পরিচালিত কোনো জরিপে, একটি অঞ্চল পৃথক গ্রাম হিসাবে সীমানা চিহ্নিত, জারিকৃত ও রেকর্ডকৃত এলাকা এবং যেখানে এই ধরনের কোনো জরিপ করা হয় নাই সেই এলাকায় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কালেক্টর কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে গ্রাম হিসেবে ঘোষিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২৯) "জলমহাল" বলতে, এমন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়কে বোঝাবে যেখানে বৎসরের একটি সময় বা সারা বৎসর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর-বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত হবে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

৩। আইনের প্রাধান্য

ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা অথবা ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতসংক্রান্ত এই আইনের কোনো বিধান অন্য কোনো প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে।

৪। কৃষি জমি সংরক্ষণ

(১) বাংলাদেশের কৃষি ভূমি এই আইনের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো অবস্থাতে ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তনযোগ্য না।

(ক) কোনো কৃষি জমি যা, অনাবাদী, একফসলী বা বহুফসলী যাই হোক না কেন অকৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

শর্ত থাকে যে, কৃষি জমিতে বনায়ন, কৃষিজ খামার, কৃষিজ বা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, কৃষি ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হবে না।

(খ) কৃষি জমি ধ্বংস করে কোনো বসতবাড়ি, শিল্প-কারখানা, ইটভাটা, মহাসড়ক, হাটবাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো অকৃষিজ অবকাঠামো তৈরি করা যাবে না।

(গ) কোনো শিল্প কারখানা, সরকারি-বেসরকারি অফিস, বাসস্থান, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমির উলম্ব বিস্তার-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং উক্তরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(ঘ) কোনো অবস্থাতেই চাষযোগ্য উর্বর একফসলী বা বহুফসলী কোনো জমিতে কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি গৃহীত হবে না।

(ঙ) উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাসভবন, শিল্পকারখানা বা অন্য কোনো অবকাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী করতে হবে, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা ভূমি জরিপ ও ভূমি খতিয়ান শাখা কর্তৃক সর্বশেষ প্রস্তুতকৃত ভূমি ম্যাপ অনুযায়ী করতে হবে এবং অনুরূপ বিধান অনুর্বর কৃষি ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(চ) ভূমিহীন মানুষ শুধু ইজারা বা খাসজমি দখল পাওয়ার অধিকারী হবে। যাই হোক না কেন, কৃষি খাসজমি কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে না।

শর্ত থাকে যে, খাসজমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক এবং রেলওয়ে হিসেবে ব্যবহার করা যাবে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক ও রেলওয়ে এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ভূমি পাওয়া না যায়।

(২) অকৃষি জমি সংরক্ষণ:

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সরকার কর্তৃক বনভূমি, টিলা, শ্রেণি জমি জলাশয়, জলমহাল, চা বাগান, ফল বাগান, রাবার বাগান এবং অন্য কোনো বিশেষ বাগান হিসেবে পরিচিত ভূমিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, ভৌগোলিক কাঠামো পরিবর্তন করে বা জলাশয় ভরাট করে বা পাহাড় কেটে কোনো আবাসিক এলাকা বা শিল্পাঞ্চল নির্মাণ করা যাবে না।

(খ) অধিগ্রহণকৃত জমির অপচয় এবং অপব্যবহার রোধকল্পে ন্যূনতম পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

(গ) ভূমি অপচয় রোধ করতে, সরকারি বা বেসরকারি অফিস, শিল্পকারখানা বা যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একই জমিতে একের অধিক প্রতিষ্ঠানকে সহাবস্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৫। সিকস্তি (Diluvian), পয়োস্তি (Alluvian)

সিকস্তি ও পয়োস্তি ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৮৬ ও ৮৭ এর বিধানানুযায়ী পরিচালিত হবে।

শর্ত থাকে যে, ভূমি জোনিং সিকস্তি ও পয়োস্তি ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৬। সায়রাতমহাল সংরক্ষণ

(১) নদী, পুকুর, জলাশয়, বিল, বাওর, ঝিল, বা যেকোনো সায়রাতমহালের বৈশিষ্ট্য, ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হিসেবে প্রতীয়মান না হলে, সরকার অনুমোদিত ভূমি জোনিং শুধু মাছ ধরা বা পানি সরবরাহ কাজে সংরক্ষিত হবে। এক্ষেত্রে ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুসরণ করতে হবে।

(২) যদি না, অন্য কোনো উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হয় হাট-বাজার, বালুমহাল, পাথরমহাল, বাগানমহাল, এবং অন্যান্য সায়রাতমহালের প্রকৃতি ও ধরন পরিবর্তন করা যাবে না।

(৩) যে সব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বল্প পরিমাণ কৃষি জমির মালিক (৩ বা ৫ শতাংশ), ক্ষেত্র বিশেষে তিনি বা তারা এটি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, এই আইনের বিধান অনুযায়ী, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, ভূমি জোনিং ম্যাপে বাসস্থানের জন্য অনুমোদিত জায়গার মালিকের জমির সাথে এওয়াজ বা বিনিময় করতে পারবেন।

৭। সায়রাতমহাল ব্যতীত অন্যান্য ভূমি সংরক্ষণ

সায়রাতমহাল ব্যতীত বনভূমি, পাহাড়-টিলা, জনসাধারণের ব্যবহৃত ভূমি, যেমনঃ খেলার মাঠ, সড়ক, রেলওয়ে এবং এর সংলগ্ন জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব আধুনিক ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী বনাঞ্চল এবং পাহাড়ী ভূমি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যাবে।

৮। ভূমি জোনিং

(১) ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কৃষি, মৎস্য, পশু, বনায়ন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, পর্যটন শিল্প উন্নয়ন, পরিবেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে, ভূমির অন্তর্নিহিত সক্ষমতা ও উপযুক্ততার সফল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার সারাদেশে ডিজিটাল ভূমি জোনিং বাস্তবায়ন করেছে।

(২) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ সরকারের একটি পরিকল্পনা যার মাধ্যমে জাতীয় এবং আঞ্চলিকপর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(৩) প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমি সর্বাধিক ব্যবহার করা হইয়া থাকে—

ক) কৃষি;
খ) আবাসন;
গ) নদী, সেচ ও নিষ্কাশন, নালা, পুকুর, জলমহাল;
ঘ) বনাঞ্চল;
ঙ) রাস্তা-ঘাট, মহাসড়ক, রেলওয়ে;
চ) হাট-বাজার, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান;
ছ) চা, রাবার ও উদ্যান (হর্টিকালচার) এলাকা;
জ) উপকূলীয় অঞ্চল;
ঝ) পর্যটন এলাকা;
ঞ) চরাঞ্চল, পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এলাকা; ও
ট) অন্যান্য

(৪) প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বাসস্থান সুনির্দিষ্টকরণ, শিল্পাঞ্চল, চিংড়ি চাষ এবং জাহাজ মেরামত শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট অঞ্চল করতে হবে এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণে, এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

৯। অধিগ্রহণ

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জমি চিহ্নিত করে ভূমি জোনিং ম্যাপের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করবেন।

১০। ভূমি জোনিং ম্যাপ

(১) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং মৌজা সমূহের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ভূমির প্রকৃত ব্যবহার, উপযুক্ততা ও প্রাচুর্যতা বিবেচনা করে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করবেন।

(২) বাংলাদেশে অবস্থিত সব ভূমির ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে, গ্রামাঞ্চলের জন্য মৌজা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক এবং পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূমির ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।

১১। ভূমি জোনিং ম্যাপের আবেদনপত্র এবং পরিমার্জন

(১) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং শর্ত পালন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না।

(২) ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমির ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুমোদন করবে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর সাধারণত তা পরিবর্তন বা সংশোধন যোগ্য হবে না। যাই হোক, বিদ্যমান কমিটির সুপারিশক্রমে নিম্নোক্তক্ষেত্রে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে:

(ক) বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনার সুবিধার্থে এই ধারায় বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে সরকার কর্তৃক বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসাবে সময়ে সময়ে ঘোষিত পরিকল্পনাকে বোঝাবে এবং অন্তর্ভুক্ত করবে ।

(খ) যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য খুবই যুক্তযুক্ত হয় বা নদীর গতিপথ বা বনাঞ্চল সম্প্রসারণ বা সায়রাতমহালের জন্য প্রয়োজনীয় হয়।

(গ) ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে করণিক বা সরল বিশ্বাসে ভুল সংগঠিত হলে।

(ঘ) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গৃহীত হলে।

(৩) সব মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুত হবে এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

১২। কমিটি

(১) ভূমি জোনিং ও ব্যবহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকবে:

(ক) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি,
(খ) ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি,
(গ) জেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি,
(ঘ) উপজেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি,
(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি।

(২) ধারা-১২, উপধারা- ১ এ বর্ণিত কমিটির গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম এবং কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১৩। ভূমির শ্রেণি বা ধরণ চিহ্নিতকরণ

সরকার সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় মালিকানা নির্বিশেষে, খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী, বর্তমান জমির শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য (ভূমি কৃষি, অকৃষি, বাণিজ্যিক, আবাসন বা জলাশয় কি না) প্লট আকারে চিহ্নিত করবেন।

১৪। অপরাধ বিচার ও শাস্তি

(১) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা এই আইনের ধারা-৫ এর উপধারা-১, ২ এবং ধারা-১১ এর উপধারা-১ লংঘন করে বা সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তাগণ লংঘনের সহায়তা প্রদান করে তবে সেই ব্যক্তি, বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা যিনি ওইরূপ সহায়তা প্রদান করেছেন তিনি ২ (দুই) বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১০০০০০/- (দশলক্ষ) টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

(২) এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য জামিনযোগ্য এবং আপোসযোগ্য হবে এবং সহকারী ভূমি কমিশনারের অনুমতিক্রমে সহকারি ভূমি অফিসার স্থানীয় থানায় এফআইআর (FIR) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী দাখিল করতে পারবেন অথবা অধিক্ষেত্র সম্পন্ন প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

(৩) এই আইনের অপরাধসমূহ সাধারণত প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপধারা-১ এ বর্ণিত বিধানাবলী ভঙ্গ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন।

(৪) যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা এরূপ তথ্য প্রাপ্ত হন যে, কোনো ব্যক্তি ভূমি জোনিং ভঙ্গ করেছে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি সহকারি ভূমি কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অবহিত করবেন।

(৫) বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ভূমি জোনিং ম্যাপ ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধীকে দণ্ডের পাশাপাশি ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুসরণ করতে এবং ভূমি জোনিং ম্যাপ ভঙ্গ করে কোনো স্থাপনা নির্মিত হইয়া থাকিলে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

১৫। ভূমি জোনিং পুনঃচালুকরণ

(১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন, বিদ্যমান ভূমির শ্রেণি বিন্যাস ভূমি জোনিং ম্যাপ বা কমিটির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করলে বা কৃষি ভূমিকে আবাসিক এলাকায় বা বসতভিটায় রূপান্তর করলে ডেপুটি কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinence, 1970 (Ordinence XXIV of 1970) -এর অধীনে ভূমি জোনিং ম্যাপ পুনঃচালুকরণের জন্য যেকোনো অবকাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারবেন,

শর্ত থাকে যে, ধারা-১৫ তে উল্লেখিত ক্ষমতা ধারা-১৪ এর উপধারা-১ এর ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করবে না।

(২) উপধরা-১ অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ নিলে উক্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা বা অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

১৬। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গ্রামাঞ্চলে স্বল্পখরচে বাসগৃহ নির্মাণের বিধি প্রণয়ন করবে, যাতে ভূমি ব্যবহারের উলম্ব বিস্তার বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একই ভবনে বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রতিটি ভবনের একটি অর্থনৈতিক উপযোগিতাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) কেবিনেট পরিষদকে এমন বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে যাতে, যোগাযোগ, সম্প্রচার নেটওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত ভবনসমূহ ফিসহ বা ফি ছাড়া বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যায়।

(৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালকে চা বাগান ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৭। সচেতনতা বৃদ্ধিজনিত কার্য

ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি জনসাধারণের মধ্যে ভূমির অঞ্চল ভিত্তিক নকশা প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

১৯। দ্ব্যর্থবোধকতা নিরোসনে সরকারের সংরক্ষিত ক্ষমতা

এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোনো দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা দেখা যায় তবে সরকার বিষয়টি বর্ণনা করবেন বা বর্তমানে বলবৎ অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

২০। সংরক্ষণ

কৃষি ভূমি সংরক্ষণ এবং ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

শর্ত থাকে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ধারা-১৪ ও ধারা-১৫ এর অধীনে কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

২১। বিদেশি বিনিয়োগ, জরুরি প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই আইন কার্যকর হবে না

বিদেশি বিনিয়োগ, জরুরি প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে না।

ব্যাখ্যা ১: এই ধারায় "বিদেশি বিনিয়োগ" বলতে বিদেশি কোনো নাগরিক বা বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের শিল্প খাতে আমদানিকৃত মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি বা সরকার দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদিত অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাকে বোঝাবে।

ব্যাখ্যা ২: এই ধারায় "সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ" বলতে, বিদেশি নাগরিক বা কর্পোরেশন বা স্বতন্ত্র নাগরিক কর্তৃক জাতীয় সীমানার মধ্যে চালু কোম্পানির মূলধনকে বোঝাবে।

ব্যাখ্যা ৩: এই ধারায় "জরুরি প্রয়োজন" বলতে সরকার বা ডেপুটি কমিশনার বা সরকার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণে, জলাধার নির্মাণ সেচের জন্য খাল খনন, খনিজ সম্পদ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য খনন কাজ, নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে ।

ব্যাখ্যা ৪: এই ধারায় "উন্নয়ন পরিকল্পনা" বলতে শহর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩ এর অধ্যায়-৩ এর অধীনে কার্যক্রমকে বোঝাবে।

প্রস্তাবিত কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার বিধিমালা

নং. এসআরও কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৪ এর ধারা-১৪ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার্থে সরকার নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করবেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার বিধিমালা হিসেবে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা

এই বিধিমালায় বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে

(ক) "ফরম" বলতে এই বিধিতে সংযুক্ত ফরমকে বোঝাবে।

(খ) "আইন" বলতে ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইনকে বোঝাবে ।

(গ) "ধারা" বলতে উক্ত আইনের ধারাসমূহকে বোঝাবে ।

৩। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি

(১) কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠন করা যেতে পারে:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ---সভাপতি
অর্থ মন্ত্রী --সদস্য
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী --সদস্য
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী --সদস্য
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ---সদস্য
ভূমি মন্ত্রী --সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রী ---সদস্য
পানিসম্পদ মন্ত্রী---সদস্য
শিল্প মন্ত্রী---সদস্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী--সদস্য
কৃষি মন্ত্রী--সদস্য
খাদ্য মন্ত্রী ---সদস্য
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী---সদস্য
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ---সদস্য
রেল মন্ত্রী---সদস্য
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী --সদস্য
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ---সদস্য
সংস্কৃতি মন্ত্রী --সদস্য
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী --সদস্য
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ---সদস্য

পরিকল্পনা মন্ত্রী--সদস্য
সচিব, মন্ত্রী পরিষদ ---সদস্য
সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়---সদস্য
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ একজন এনজিও প্রতিনিধি ---------সদস্য
সভাপতি, এফবিসিসিআই --সদস্য
সভাপতি, জাতীয় মহিলা সংস্থা --সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ---সদস্য সচিব

(২) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(ক) ভূমি ব্যবহার ও ভূমি জোনিং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করবেন।

(খ) ভূমি ব্যবহার ও ভূমি জোনিং সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন।

(গ) স্বল্প খরচে আবাসন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(ঘ) বছরে অন্তত দুইবার সভা আয়োজন করবেন। একবার পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য, অন্যবার নির্দেশনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য।

৪। ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি

(১) এই আইনের অধীনে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নীতির সুষ্ঠ বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে:

ভূমি মন্ত্রী চেয়ারম্যান সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
--সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় --সদস্য
সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় --সদস্য
সচিব রেল মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়--সদস্য
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়---সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় --সদস্য
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ---সদস্য
সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়--সদস্য
চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড --সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ---সদস্য
মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর --সদস্য
সব বিভাগীয় কমিশনার --সদস্য

চেয়ারম্যান (রাজউক) --সদস্য
চেয়ারমান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ--সদস্য
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ --সদস্য
চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ --সদস্য
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ একজন এনজিও প্রতিনিধি---------সদস্য
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় -- সদস্য সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে যেকোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট (মনোনীত) করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

(২) ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

(ক) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা এবং নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন ।

(খ) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

(গ) ভূমি জোনিং এবং ভূমি ম্যাপিং কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করবেন ।

(ঘ) ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহারসংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে যথাযথ সমাধানের পদক্ষেপ নিবেন।

(ঙ) এই আইনানুযায়ী কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহারসহ সমগ্র দেশের ভূমি প্রকৃতি নির্ণয়ের কাজে সময়ে সময়ে অন্যান্য কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অন্যান্য সব কার্য পরিচালনা করবেন ।

৫। জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি

(১) জেলা কাউন্সিলের প্রশাসক/ চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠন করতে হবে:

প্রশাসক/চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ -----------------------------------চেয়ারম্যান
ডেপুটি কমিশনার --- ভাইস চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, সব উপজেলা পরিষদ --সদস্য
আঞ্চলিক সংস্থাপন কর্মকর্তা অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ------------------------সদস্য
পুলিশ সুপার--সদস্য
সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, (জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত)---সদস্য
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) --------------------------------------সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ---সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও মহাসড়ক---------------------------------------সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী (LGED) --সদস্য
ডেপুটি পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর --------------------------------সদস্য
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ---সদস্য

জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা --------------------------------------সদস্য
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা --সদস্য
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ---সদস্য
বিভাগীয় পরিবেশ কর্মকর্তা --সদস্য
বিভাগীয় বন কর্মকতা (যদি থাকে) --সদস্য
ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এনজিও প্রতিনিধি (জেলা ভূমি জোনিং ও
ভূমি ব্যবহার কমিটি দ্বারা নির্বাচিত) --সদস্য
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (RDC) ---------------------------------সদস্য সচিব

(২) জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির কাজ হলো:

(ক) ডিজিটাল ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহারসংক্রান্ত সরকারি দলিল তৈরি করবেন।
(খ) উপজেলাপর্যায়ে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নসহ ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
(গ) উপজেলা কমিটির কাজ তত্ত্বাবধান করবেন।
(ঘ) উপজেলা কমিটি কোনো অনিয়ম করলে আইনত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(ঙ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির তার আবেদন শুনিবেন।
(চ) উপজেলাপর্যায়ে ভূমি জোনিং ও ভূমি ম্যাপিং কার্যাবলী সফল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
(ছ) ডিজিটাল ভূমি জোনিং সম্পর্কে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা, সেমিনার, ট্রেনিং আয়োজন করবেন।
(জ) ভূমি জোনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবেন।
(ঝ) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার সভা আয়োজন করবেন।
(ঞ) ডিজিটাল ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৬। উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি

(১) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠিত হবে:

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ --চেয়ারম্যান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO) ------------------------------------- ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ---সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, (LEGD) --সদস্য
উপজেলা সংস্থাপন কর্মকর্তা (যদি থাকে) -----------------------------------সদস্য
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা--সদস্য
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ---সদস্য
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকতা--সদস্য

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ---সদস্য
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা---সদস্য
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ---সদস্য
কলেজের একজন অধ্যক্ষ (মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত) -------------------------------------সদস্য
পৌরসভার মেয়র---সদস্য
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার---সদস্য
ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এরূপ এনজিও---সদস্য
প্রতিনিধি (মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত) ---সদস্য
সহকারি কমিশনার (ভূমি) ---সদস্য সচিব
সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) **উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:**

(ক) এই আইনের অধীনে, ভূমি জানিং ম্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ এবং ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন করা।

(খ) জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির নির্দেশানুসারে ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহারসংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া।

(গ) জেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটির সাথে আলোচনা করে যে ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি জোনিং বা ভূমি ম্যাপ প্রণয়ন করবেন তাকে যথার্থ সাহায্য প্রদান করবেন।

(ঘ) বিধি-৭ (২), (৩) অনুযায়ী ইউনিয়ন কমিটির কাছে আবেদন করলে তা গ্রহণ করবেন অথবা, সরাসরি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন।

(ঙ) আবেদনপত্র গ্রহণ করে তা পরীক্ষা ও আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ করে সদস্য সচিব তৎপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(চ) ভূমি ব্যবহারের ধরন তত্ত্বাবধান করা, ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার আইন লংঘন করা হলে, এই বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করবেন, ২০১২ সালের আইন অনুসারে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ছ) ভূমি ব্যবহারসংক্রান্ত সংঘাত নিরসনে রেজুলেশন প্রণয়ন করবেন।

শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হয় তবে সেই ব্যক্তি জেলা কমিটির নিকট তার করতে পারবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, উপজেলা কমিটি তাদের যেকোনো সিদ্ধান্ত উপদেষ্টাকে জানাইবেন কিন্তু কোনো সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

৭। **ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি**

(১) ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে:
চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ ---চেয়ারম্যান

উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা (কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত)---------------------সদস্য
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত)-----------সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত)-সদস্য
সহকারি ভূমি কর্মকর্তা --সদস্য সচিব

(২) উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:
উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির কাজ নিম্নরূপ:

(ক) উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে মালিকানা নির্বিশেষে ভূমি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করবেন। এই ভূমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ভূমি প্লট নং বা খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী ভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবেন।

(খ) আবেদনপত্র পরীক্ষার পর উপজেলা কমিটির নিকট সুপারিশমালা প্রেরণ করবেন। আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে, উপজেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে কৃষি ভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করবেন।

(গ) যদি কোনো ব্যক্তির ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়, তবে এই সম্পর্কে আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন এবং উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) উপজেলা কমিটির অনুমতিক্রমে নতুন সদস্য কো-অপ্ট (মনোনয়ন) করবেন।

শর্ত থাকে যে, যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোনো ব্যক্তির, এইরূপে বাসগৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে যা কৃষি ভূমি ধ্বংস করা ব্যতীত সম্ভব নয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি তার আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য ইউনিয়ন কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবেন।

৮। ভূমির প্রকৃতি চিহ্নিতকরণ

সরকার সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় মালিকানা নির্বিশেষে, খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী, বর্তমান জমির শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য (ভূমি কৃষি, অকৃষি, বাণিজ্যিক, আবাসন বা জলাশয় কি না) প্লট আকারে চিহ্নিত করবেন।

৯। স্বল্প মূল্যে আবাসন

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গ্রামাঞ্চলে স্বল্প খরচে বহুতল ভবন নির্মাণের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ এইক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এটি ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

১০। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা

একই উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার কমানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একই স্থান বা ভবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে, একই কাঠামো অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ভূমির উলম্ব বিস্তার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১১। দায়মুক্তি

যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা এই আইনের কোনো বিধান ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন।

শর্ত থাকে যে, সরল বিশ্বাসে এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো আদেশ বা নিয়ম অনুসারে কৃত কার্যের জন্য, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু বা অন্যান্য কার্যধারা গ্রহণ করা হবে না এবং এই আইনের অধীনে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোনো আদালত এরূপ কোনো মামলা আমলে নেবেন না।

ব্যাখ্যা: সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য বলতে বোঝায় যথার্থ যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে করা কার্য।

১২। ভূমি জোনিং ম্যাপ সম্পর্কে অভিমত

(১) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে, মাঠপর্যায়ে ভূমির বর্তমান ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথমিক তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ, উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক ডিজিটাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে এবং এটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ ও ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের অফিসের ভূমি অধিগ্রহণ শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়নপর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবেন।

(২) সব ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ নির্ভুলভাবে এবং রঙিনাকারে ছাপানো হবে এবং এটি সবার জন্য প্রতিবেদন আকারে এবং ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত থাকবে। ম্যাপ প্রস্তুতের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পর্যায় হতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে জনগণের প্রয়োজনীয় অভিমত এবং তথ্যসহ প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে ।

১৩। জোনিং ডাটাবেস বা উপাত্তভিত্তিক

ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের পাশাপাশি ভূমির মৌলিক তথ্য সম্বলিত একটি তথ্যভাণ্ডার থাকবে। যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে। যা সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

১৪। ভূমি জোনিং মানদণ্ড

বিভিন্ন ভূমি অঞ্চল সনাক্ত করতে, কিছু মৌলিক মানদণ্ড ভূমি ব্যবহারের উপযুক্ততা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত মানদণ্ড ভূমি জোনিং ঘোষণার জন্য পেশ করা হয়েছে:

(ক) শস্য উপযোগিতা স্থিতিমাপ (প্যারামিটার) অর্থাৎ জমির লবণাক্ততা, পিএইচ (PH), উপাদানের ভিত্তিতে মাটির ধরন।

(খ) ফসলাধিক্য।

(গ) মহাসড়ক বা রেললাইনের উভয় পাশ দিয়ে ১ (এক) কিলোমিটার এবং উপজেলা হতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত ২০০- ২৫০ মিটার উঁচু ভূমি ঝুঁকি লাঘবকারী (Buffering) জায়গা হিসেবে রাখতে হবে।

(ঘ) ইউনিয়নের ৬০ শতাংশের বেশি ভূমি, ভূমি অঞ্চল ঘোষণার জন্য ভূমি জোনিং ম্যাপের আওতাভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) অপেক্ষাকৃত অনুর্বর উচু ভূমি নগরায়ণ ও বাণিজ্যিক কার্যে ব্যবহার করতে হবে।

(চ) জটিলতা নিরসনে মিশ্র জোনিং মনোনীত করা যেতে পারে।

(ছ) সদ্যজাগরিত ভূমি বনভূমির জন্য রাখা হবে।

(জ) বিদ্যমান ভূমির প্রধান উপযোগিতা ও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় বিশেষত, মৎস্য, লবণ, পর্যটন, জাহাজ ভাঙ্গা কাজে ভূমি জোনিং নির্ধারণে ECAs এর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঝ) টেকসই ভূমি জোনিং এর জন্য সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক বিবেচনা করতে হবে।

(ঞ) ভূমি জোনিং এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু নমনীয়তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ট) মৎস্য চাষের জন্য জলাশয় এবং নিচু ভূমি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ৩

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ১: জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনা

গবেষণা-পরিচয়

করোনাভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯) মহামারির এই অনিশ্চিত ও কঠিন সময়ে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশে জমি ও জীবন সমার্থক। জমি দারিদ্র্য, বৈষম্য ও জীবনমান নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। জমি ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক। জমির পরিমাণ সীমিত। তাই এ নিয়ে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। ঘটছে সহিংসতা, দুর্নীতি, দখল-জবরদখল, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ফাটকা ব্যবসা, বলপূর্বক উচ্ছেদ। বাড়ছে ভূমিহীনতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য ও দারিদ্র্য। ভূমির ওপর জনগণের সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকারের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের ভূমি আইনগুলোতে কি যথাযথ গুরুত্বের সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কটি বিবেচিত হয়েছে? খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন বিষয়গুলো কি সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? বিদ্যমান আইনের কি কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে? এসব প্রশ্নসহ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে বর্তমান গবেষণায়। উত্তরগুলো জরুরি, কেননা ভূমি আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং তার মানবিক বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত না করতে পারলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ভূমি-অধিকার নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয়– শেষ হবে না ভূমি নিয়ে জনগণের সীমাহীন ভোগান্তি ও ক্ষতি।

উন্নয়ন সংগঠন নিজেরা করি'র সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করছে। আমরা এইচডিআরসি-এর পক্ষ থেকে এসেছি। আজকের আলোচনায় আপনাদের প্রদত্ত সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্ন্তনিহিত বিষয়াদি, মতামত এবং সুপারিশ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার নাম-পরিচয় এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আলোচনা শেষ হতে কম-বেশি ২ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

গবেষণাকর্মটি যে সংগঠনের সহযোগিতায় সম্পাদিত হচ্ছে

নিজেরা করি
nijera kori
৭/৮ ব্লক সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করেছে

HDRC Human Development Research Centre
humane development through research and action
রোড ৮, বাড়ি ৫, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: (+৮৮ ০২) ৮১১৬৯৭২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫৭৬২০;
ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব: www.hdrc-bd.com
২০২০

FGD বা দলগত আলোচনার তথ্যাবলী			
FGD নম্বর		অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা	
FGD-এর স্থান			
গ্রাম		ইউনিয়ন	
উপজেলা		জেলা	
FGD পরিচালনাকারী	নাম		স্বাক্ষর
FGD রেকর্ডার/ নোট টেকার	নাম		স্বাক্ষর
তারিখ ও সময় ব্যাপ্তি	তারিখ	শুরু হবার সময়	শেষ হবার সময়

অংশগ্রহণকারীগণের তথ্য						
ক্রম	নাম	বয়স (বছরে)	শিক্ষা (সর্বোচ্চ শ্রেণি পাস)	পেশা	বাঙালি=১ আদিবাসী=২ (কোন আদিবাসী গোষ্ঠী উল্লেখ করুন)	মোবাইল নম্বর
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						

সাধারণ জ্ঞাতব্য

- ⇨ একটি উপযুক্ত বড় পরিসরের নির্জন জায়গা নির্বাচন করুন যেখানে সকল অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বৃত্তাকারে বসা যাবে।
- ⇨ ঘরে পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন এবং একটি একক আসা-যাওয়ার পথ তৈরি করুন (যাতে একসাথে একজন ব্যক্তি প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারেন)।
- ⇨ তাপমাত্রা পরিমাপ করে প্রবেশ নিশ্চিত করুন (থার্মালমিটার দিয়ে)।
- ⇨ সবার ভালোর জন্য বিনীতভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের আলোচনা থেকে সরে যেতে বলুন।
- ⇨ শারীরিকভাবে অসুস্থ কেউ (জ্বর, শুকনো কাশি, বা গলাব্যথাসহ) অংশ নিচ্ছেন না তা নিশ্চিত করুন।
- ⇨ সব অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা উপকরণ (ফেস মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার) সরবরাহ করুন এবং তাদের আলোচনার সময় ফেস-মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস পরার জন্য অনুরোধ করুন।
- ⇨ আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব (কমপক্ষে ১ মিটার বা একে অপরের থেকে ৩ ফুট দূরত্ব) কঠোরভাবে নিশ্চিত করুন।
- ⇨ আলোচনাকালীন সময় সব অংশগ্রহণকারীকে তাদের মাস্ক মুখ থেকে না খোলার জন্য অনুরোধ করুন। প্রয়োজনে তাদের আরও জোরে কথা বলতে বলুন এবং কথা বলার সময় পর্যাপ্ত সময় দিন।
- ⇨ উত্তরদাতাদের অনুমতি নিয়ে, বৃত্তাকার বিন্যাসের বাইরে রেকর্ডার সেট করুন।
- ⇨ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ফলে কথা শোনার সময় অসুবিধা হতে পারে, সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের বিরক্ত না করে খুব সাবধানে প্লে-পজ-প্লে-রিওয়াইন্ড ব্যবহার করুন।
- ⇨ সবার জন্য পানি এবং হালকা-নাশতার (প্রয়োজনে দুপুরের খাবার) ব্যবস্থা করুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে খাদ্যগ্রহণের সময় সবাই স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখছেন।
- ⇨ যারা আগে আসবেন তাদের সাথে অনানুষ্ঠানিক/প্রারম্ভিক আলাপচারিতার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
- ⇨ সবাইকে তাদের মোবাইল ফোনটি বন্ধ করতে অনুরোধ করুন।
- ⇨ সময়ের হিসাব রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
- ⇨ প্রারম্ভিক আলাপচারিতার পর আলোচনায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন, অংশগ্রহণকারীদের সাথে চোখের যোগাযোগ বজায় রাখুন এবং দরজা, জানালা বা আলোর প্রবেশ বন্ধ করার জন্য শব্দ করা থেকে অংশগ্রহণকারীদের বিরত থাকতে অনুরোধ করুন ।

FGD বা দলগত আলোচনা পরিচালনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
➢ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের নাম বলতে বলুন যে নামে দলের সবাই তাকে ডাকবেন এবং একটি ইতিবাচক সহজ (‘ice-breaker’) প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন।
➢ কম পরিমাণ কথা বলুন এবং কখনো নিজস্ব মতামত বা বিবেচনা প্রকাশ করবেন না।
➢ যখন কেউ কিছু বলবেন, তখন বাকি অংশগ্রহণকারীদের তাকে বাধা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন।
➢ আলোচনার যেকোনো পর্যায়ে তা আপত্তিজনক না হলে বাধা না দেওয়ার চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে, অংশগ্রহণকারীকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাদ গেলে তা পুনরায় বলার জন্য অনুরোধ করুন।
➢ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বিমূর্ত সাধারণীকরণের মধ্যে খুব সাবধানে যাতায়াত করুন।
➢ অংশগ্রহণকারীগণের সবাই যাতে কথা বলে সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন এবং কারো সাথে এককভাবে আলোচনা করবেন না– যারা কিছু বলতে আগ্রহী তাদের আলোচনায় যাওয়ার বিষয়ে শারীরিক ভাষা ব্যবহার করুন অথবা যা বলা হয়েছে সে বিষয়ে তাদের ভাবনাগুলো কী তা সাবধানে জিজ্ঞেস করুন।
➢ শারীরিক ভাষা উন্মুক্ত রাখুন এবং হাত নিরপেক্ষ রাখুন। হাত ভাঁজ করবেন না বা আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন না। উপস্থিত সবার মাঝে আস্থা স্থাপনের জন্য উৎসাহমূলক এবং ভদ্র দৃষ্টিগত যোগাযোগ ব্যবহার করুন।
➢ যারা কথা বলতে লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করেন তাদের কথা বলাতে উৎসাহ দানের ব্যাপারে মনে মনে ঠিক করে নিন।
➢ সম্পূর্ণ আলোচনাটি শেষ হবার সময়ে যাতে ইতিবাচক মুহূর্ত তৈরি হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন, কিন্তু এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না যা পূরণ করা সম্ভব নয়।
➢ সবাইকে নিশ্চিত করুন যে সম্পূর্ণ আলোচনাটি শেষ হতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা সময় লাগতে পারে এবং সেই সময়ের মধ্যেই আলোচনা শেষ করতে চেষ্টা করুন।

আলোচনার বিষয়সমূহ

১. ভূমি আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা

আলোচ্য বিষয়	আলোচ্য ইস্যুসমূহ
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত	• বলতে কী বোঝেন • কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে • কী কী সমস্যা হচ্ছে (আইন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি) • দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী • (কেবল যারা জানেন তাদের জন্য) প্রাসঙ্গিক আইন বা নীতিমালার মূল্যায়ন (কারণসহ 'ভালো-খারাপ' বিশ্লেষণ)
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত	• বলতে কী বোঝেন • কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে • কী কী সমস্যা হচ্ছে (আইন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি) • দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী • (কেবল যারা জানেন তাদের জন্য) প্রাসঙ্গিক আইন বা নীতিমালার মূল্যায়ন (কারণসহ 'ভালো-খারাপ' বিশ্লেষণ)
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা	• বলতে কী বোঝেন • কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে • কী কী সমস্যা হচ্ছে (আইন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি) • দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী • (কেবল যারা জানেন তাদের জন্য) প্রাসঙ্গিক আইন বা নীতিমালার মূল্যায়ন (কারণসহ 'ভালো-খারাপ' বিশ্লেষণ)
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল	• বলতে কী বোঝেন • কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে • কী কী সমস্যা হচ্ছে (আইন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি) • দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী • (কেবল যারা জানেন তাদের জন্য) প্রাসঙ্গিক আইন বা নীতিমালার মূল্যায়ন (কারণসহ 'ভালো-খারাপ' বিশ্লেষণ)
ভূমি ব্যবহার	• বলতে কী বোঝেন • কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে • কী কী সমস্যা হচ্ছে (আইন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি) • দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী • (কেবল যারা জানেন তাদের জন্য) প্রাসঙ্গিক আইন বা নীতিমালার মূল্যায়ন (কারণসহ 'ভালো-খারাপ' বিশ্লেষণ)

২. গত ৫ বছরে আপনারা কোন কোন ভূমি অফিসে গিয়েছেন? কী জন্য গিয়েছেন? দয়া করে সংক্ষেপে আপনাদের অভিজ্ঞতা (প্রার্থিত সেবা, ব্যায়িত সময়, অর্থ, জড়িত ব্যক্তিবর্গ, অন্যান্য ভোগান্তি ইত্যাদি) আমাদের সাথে শেয়ার করুন।

৩. নিচের বিষয়গুলোর ওপর আপনাদের মূল্যায়ন দয়া করে জানান।

	মূল্যায়ন			মূল্যায়নের কারণ
	ভালো	মোটামুটি	খারাপ	
১. ভূমি কার্যালয়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের আচরণ				
২. ভূমি কার্যালয়ের পরিবেশ				
৩. ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া				
৪. জেন্ডার-সংবেদনশীলতা				
৫. প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতার অবস্থা				
৬. প্রান্তিক মানুষের প্রবেশগম্যতার অবস্থা				

সুপ্রিয় মডারেটর, অংশগ্রহণকারীদের কত জন 'ভালো', কত জন 'মোটামুটি', কত জন 'খারাপ' বলছেন, তার সংখ্যা উল্লেখ করুন এবং নির্দিষ্ট মূল্যায়নের পেছনের প্রতিটি কারণ নোট করুন।

এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করুন: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আপনি যেভাবে আমাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রদান করলেন—এজন্য আমরা আপনার কাছে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ২: মুখ্য উত্তরদাতার প্রশ্নমালা-০১
ভূমি অধিকার কর্মীর সাথে সাক্ষাৎকার

গবেষণা-পরিচয়

করোনাভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯) মহামারির এই অনিশ্চিত ও কঠিন সময়ে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনি জানেন, বাংলাদেশে জমি ও জীবন সমার্থক। জমি দারিদ্র্য, বৈষম্য ও জীবনমান নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। জমি ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক। জমির পরিমাণ সীমিত। তাই এ নিয়ে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। ঘটছে সহিংসতা, দুর্নীতি, দখল-জবরদখল, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ফাটকা ব্যবসা, বলপূর্বক উচ্ছেদ। বাড়ছে ভূমিহীনতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য ও দারিদ্র্য। ভূমির ওপর জনগণের সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকারের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের ভূমি আইনগুলোতে কি যথাযথ গুরুত্বের সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কটি বিবেচিত হয়েছে? খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন বিষয়গুলো কি সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? বিদ্যমান আইনের কি কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে? এসব প্রশ্নসহ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে বর্তমান গবেষণায়। উত্তরগুলো জরুরি, কেননা ভূমি আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং তার মানবিক বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত না করতে পারলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ভূমি-অধিকার নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয় – শেষ হবে না ভূমি নিয়ে জনগণের সীমাহীন ভোগান্তি ও ক্ষতি।

উন্নয়ন সংগঠন নিজেরা করি'র সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করছে। আমরা এইচডিআরসি-এর পক্ষ থেকে এসেছি। আজকের সাক্ষাৎকারে আপনার প্রদত্ত সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্ন্তনিহিত বিষয়াদি, মতামত এবং সুপারিশ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার নাম-পরিচয় এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এই সাক্ষাৎকার শেষ হতে কম-বেশি ১ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

গবেষণাকর্মটি যে সংগঠনের সহযোগিতায় সম্পাদিত হচ্ছে

নিজেরা করি
nijera kori

৭/৮ ব্লক সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করেছে

HDRC **Human Development Research Centre**
humane development through research and action

রোড ৮, বাড়ি ৫, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: (+৮৮ ০২) ৮১১৬৯৭২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫৭৬২০;
ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব: www.hdrc-bd.com
২০২০

সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীর পরিচিতি	
ক)	নাম:
খ)	পেশা:
গ)	সংগঠন:
ঘ)	ভূমি অধিকার কর্মী হিসেবে সম্পৃক্ততার সময়কাল (মাসে):
ঙ)	যোগাযোগের নম্বর/মোবাইল: 0 1

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদলের পরিচিতি			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম			
স্বাক্ষর			
নোট টেকারের নাম			
স্বাক্ষর			

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

১. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭

ভালো নীতি

১.১ "কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭"-র ভালো নীতিগুলো কী কী?
১.২ কেন এ নীতিগুলোকে ভালো নীতি বলছেন?
১.৩ এই ভালো নীতিগুলো কি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?
১.৪ কোন কোন ভালো নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
১.৫ সেই নীতিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী কী?
১.৬ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

মন্দ নীতি

১.৭ "কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭"-য় কি কোনো মন্দ নীতি রয়েছে? (থাকলে) সেগুলো কী কী?
১.৮ কোন কারণে এ নীতিগুলোকে খারাপ নীতি বলছেন?
১.৯ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

প্রভাব

১.১০ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে "কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭" কি প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
১.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে এ নীতিমালা কি প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
১.১২ দেশের ও মানুষের উন্নয়নে এ নীতিমালা কি প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?

২. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫

ভালো নীতি

২.১ "অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫"-র ভালো নীতিগুলো কী কী?
২.২ কেন এ নীতিগুলোকে ভালো নীতি বলছেন?
২.৩ এই ভালো নীতিগুলো কি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?
২.৪ কোন কোন ভালো নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
২.৫ সেই নীতিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী কী?
২.৬ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

মন্দ নীতি

২.৭ "অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫"-য় কি কোনো মন্দ নীতি রয়েছে? (থাকলে) সেগুলো কী কী?
২.৮ কোন কারণে এ নীতিগুলোকে খারাপ নীতি বলছেন?
২.৯ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

প্রভাব

২.১০ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে "অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫" কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
২.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে এ নীতিমালা কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
২.১২ দেশের ও মানুষের উন্নয়নে এ নীতিমালা কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?

৩. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

ভালো নীতি

৩.১ "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯"-এর ভালো নীতিগুলো কী কী?
৩.২ কেন এ নীতিগুলোকে ভালো নীতি বলছেন?
৩.৩ এই ভালো নীতিগুলো কি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?
৩.৪ কোন কোন ভালো নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
৩.৫ সেই নীতিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী কী?
৩.৬ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

মন্দ নীতি

৩.৭ "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯"-এ কি কোনো মন্দ নীতি রয়েছে? (থাকলে) সেগুলো কী কী?
৩.৮ কোন কারণে এ নীতিগুলোকে মন্দ নীতি বলছেন?
৩.৯ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

প্রভাব

৩.১০ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
৩.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে এ নীতিমালা কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?
৩.১২ দেশের ও মানুষের উন্নয়নে এ নীতিমালা কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে প্রভাব রেখেছে?

৪. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭

ভালো আইন

৪.১ "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭"-এর ভালো আইনগুলো কী কী?
৪.২ কেন এ আইনগুলোকে ভালো আইন বলছেন?
৪.৩ এই ভালো আইনগুলো কি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?
৪.৪ কোন কোন ভালো আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
৪.৫ সেই আইনগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী কী?
৪.৬ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

মন্দ আইন

৪.৭ "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭"-তে কি কোনো মন্দ আইন রয়েছে? (থাকলে) সেগুলো কী কী?
৪.৮ কোন কারণে এ আইনগুলোকে মন্দ আইন বলছেন?
৪.৯ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

প্রভাব

৪.১০ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭" কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?
৪.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে এ আইন কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?
৪.১২ দেশের ও মানুষের উন্নয়নে এ আইন কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?

৫. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

ভালো নীতি

৫.১ "জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১"-এর ভালো নীতিগুলো কী কী?
৫.২ কেন এ নীতিগুলোকে ভালো নীতি বলছেন?
৫.৩ "জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১"-এর ভালো নীতিগুলো কি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?
৫.৪ কোন কোন ভালো নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না?
৫.৫ সেই নীতিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী কী?
৫.৬ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

মন্দ নীতি

৫.৭ "জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১"-তে কি কোনো মন্দ নীতি রয়েছে? (থাকলে) সেগুলো কী কী?
৫.৮ কোন কারণে এ নীতিগুলোকে মন্দ নীতি বলছেন?
৫.৯ কারণগুলো দূরীকরণে করণীয় কী?

প্রভাব

৫.১০ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে "জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১" কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?
৫.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে এ নীতি কি প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?
৫.১২ দেশের ও মানুষের উন্নয়নে এ নীতি কী প্রভাব রেখেছে? কীভাবে?

৬. দয়া করে নিচের বিষয়গুলোর ওপর আপনার মূল্যায়ন আমাদের জানান।

	মূল্যায়ন			কারণ
	ভালো	মোটামুটি	মন্দ	
১. ভূমি কার্যালয়ের পরিবেশ				
২. ভূমিসংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া				
৩. জেন্ডার-সংবেদনশীলতা				
৪. প্রান্তিক মানুষের প্রবেশগম্যতার অবস্থা				
৫. স্বচ্ছতা				
৬. জবাবদিহিতা				
৭. ভোগান্তি হ্রাসের প্রক্রিয়া				
৮. ভূমি সেবার বিকেন্দ্রায়ন				
৯. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি				

এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করুন: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আপনি যেভাবে আমাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রদান করলেন—এজন্য আমরা আপনার কাছে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ৩: মুখ্য উত্তরদাতার প্রশ্নমালা-০২
ভূমি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার

গবেষণা-পরিচয়

করোনাভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯) মহামারির এই অনিশ্চিত ও কঠিন সময়ে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশে জমি ও জীবন সমার্থক। জমি দারিদ্র্য, বৈষম্য ও জীবনমান নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। জমি ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক। জমির পরিমাণ সীমিত। তাই এ নিয়ে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। ঘটছে সহিংসতা, দুর্নীতি, দখল-জবরদখল, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ফটকা ব্যবসা, বলপূর্বক উচ্ছেদ। বাড়ছে ভূমিহীনতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য ও দারিদ্র্য। ভূমির ওপর জনগণের সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকারের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের ভূমি আইনগুলোতে কি যথাযথ গুরুত্বের সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কটি বিবেচিত হয়েছে? খাদ্যনিরাপত্তা ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন বিষয়গুলো কি সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? বিদ্যমান আইনের কি কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে? এসব প্রশ্নসহ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে বর্তমান গবেষণায়। উত্তরগুলো জরুরি, কেননা ভূমি আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং তার মানবিক বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত না করতে পারলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ভূমি-অধিকার নিশ্চিত করা কখনই সম্ভব নয়—শেষ হবে না ভূমি নিয়ে জনগণের সীমাহীন ভোগান্তি ও ক্ষতি।

উন্নয়ন সংগঠন নিজেরা করি'র সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করছে। আমরা এইচডিআরসি-এর পক্ষ থেকে এসেছি। আজকের সাক্ষাৎকারে আপনার প্রদত্ত সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্ন্তনিহিত বিষয়াদি, মতামত এবং সুপারিশ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার নাম-পরিচয় এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এই সাক্ষাৎকার শেষ হতে কম-বেশি ১ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

গবেষণাকর্মটি যে সংগঠনের সহযোগিতায় সম্পাদিত হচ্ছে

নিজেরা করি
nijera kori

৭/৮ ব্লক সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করেছে

HDRC **Human Development Research Centre**
humane development through research and action

রোড ৮, বাড়ি ৫, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: (+৮৮ ০২) ৮১১৬৯৭২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫৭৬২০;
ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব: www.hdrc-bd.com
২০২০

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিচিতি	
ক)	নাম:
খ)	পদ:
গ)	কার্যালয়:
ঘ)	ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে সম্পৃক্ততার সময়কাল (মাসে):
ঙ)	যোগাযোগের নম্বর/মোবাইল:

0	1								

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদলের পরিচিতি			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম			
স্বাক্ষর			
নোট টেকারের নাম			
স্বাক্ষর			

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

ভূমি আইন বা নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যা

১. **কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭**
১.১ ‘কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭’-এর কোন কোন নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়?
১.২ কী কী সমস্যা হয়?
১.৩ সমস্যা সমাধানে করণীয়?

২. **অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫**
২.১ ‘অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫’-এর কোন কোন নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়?
২.২ কী কী সমস্যা হয়?
২.৩ সমস্যা সমাধানে করণীয় কী?

৩. **সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯**
৩.১ **‘সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯’-এর কোন কোন নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়?**
৩.২ কী কী সমস্যা হয়?
৩.৩ সমস্যা সমাধানে করণীয় কী?

৪. **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭**
৪.১ ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭’-এর কোন কোন আইন বাস্তবায়নে সমস্যা হয়?

৪.২ কী কী সমস্যা হয়?
৪.৩ সমস্যা সমাধানে করণীয়?

৫. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১
৫.১ 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর কোন কোন নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়?
৫.২ কী কী সমস্যা হয়?
৫.৩ সমস্যা সমাধানে করণীয় কী?

ভূমি শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত

৬. দয়া করে নীচের বিষয়গুলোর ওপর আপনার মূল্যায়ন জানান।

	মূল্যায়ন			কারণ
	ঠিক	মোটামুটি	বেঠিক	
১. ভূমি বণ্টনের বিকেন্দ্রায়ন				
২. ভূমিসংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোর মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বণ্টন				
৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভাজন				
৪. নিয়মানুগ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি				
৫. সমন্বয় মেকানিজম				
৬. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন				
৭. মানবসম্পদ				
৮. লজিস্টিকস				
৯. তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার				
১০. বাজেট				
১১. খাতভিত্তিক বরাদ্দ				
১২. নেটওয়ার্ক বিল্ডিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব				
১৩. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি				

এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করুন: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আপনি যেভাবে আমাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রদান করলেন—এজন্য আমরা আপনার কাছে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ৪: কেস স্টাডি গাইডলাইন

গবেষণা-পরিচয়

করোনাভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯) মহামারির এই অনিশ্চিত ও কঠিন সময়ে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনি জানেন, বাংলাদেশে জমি ও জীবন সমার্থক। জমি দারিদ্র্য, বৈষম্য ও জীবনমান নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। জমি ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক। জমির পরিমাণ সীমিত। তাই এ নিয়ে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। ঘটছে সহিংসতা, দুর্নীতি, দখল-জবরদখল, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ফাটকা ব্যবসা, বলপূর্বক উচ্ছেদ। বাড়ছে ভূমিহীনতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য ও দারিদ্র্য। ভূমির ওপর জনগণের সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকারের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের ভূমি আইনগুলোতে কি যথাযথ গুরুত্বের সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কটি বিবেচিত হয়েছে? খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন বিষয়গুলো কি সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? বিদ্যমান আইনের কি কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে? এসব প্রশ্নসহ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে বর্তমান গবেষণায়। উত্তরগুলো জরুরি, কেননা ভূমি আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং তার মানবিক বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত না করতে পারলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর ভূমি-অধিকার নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয়—শেষ হবে না ভূমি নিয়ে জনগণের সীমাহীন ভোগান্তি ও ক্ষতি।

উন্নয়ন সংগঠন নিজেরা করি'র সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করছে। আমরা এইচডিআরসি-এর পক্ষ থেকে এসেছি। আজকের আলোচনায় আপনার প্রদত্ত সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্ন্তনিহিত বিষয়াদি, মতামত এবং সুপারিশ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার নাম-পরিচয় এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এই আলোচনা শেষ হতে কম-বেশি ২ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

গবেষণাকর্মটি যে সংগঠনের সহযোগিতায় সম্পাদিত হচ্ছে

নিজেরা করি
nijera kori

৭/৮ ব্লক সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করেছে

HDRC **Human Development Research Centre**
humane development through research and action

রোড ৮, বাড়ি ৫, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: (+৮৮ ০২) ৮১১৬৯৭২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫৭৬২০;
ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব: www.hdrc-bd.com
২০২০

<table>
<tr><th colspan="3">প্রারম্ভিক তথ্যাবলী</th></tr>
<tr><td colspan="2">উত্তরদাতার নাম</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">সংগঠন/সমিতির নাম (যদি থাকে)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">পদবী (যদি থাকে)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">ঠিকানা</td><td>গ্রাম/পাড়া</td><td></td></tr>
<tr><td>ইউনিয়ন</td><td></td></tr>
<tr><td>উপজেলা</td><td></td></tr>
<tr><td>জেলা</td><td></td></tr>
<tr><td>বিভাগ</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">যোগাযোগের নম্বর</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ই-মেইল আইডি (যদি থাকে)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদলের পরিচিতি</th></tr>
<tr><td>তারিখ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>সাক্ষাৎকারের স্থান</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>সাক্ষাৎকার শুরুর সময়</td><td></td><td>সাক্ষাৎকার শেষের সময়</td><td></td></tr>
<tr><td>সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম</td><td></td><td>স্বাক্ষর</td><td></td></tr>
<tr><td>নোট টেকারের নাম</td><td></td><td>স্বাক্ষর</td><td></td></tr>
</table>

কেস স্টাডির বিষয়সমূহ

কেস স্টাডির বিষয়াবলি নিম্নলিখিত ৫টি নীতিমালা বা আইনের যেকোনো এক বা একাধিক নীতিমালা বা আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা ও প্রভাব থেকে চিহ্নিত করতে হবে।

১. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭
২. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫
৩. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯
৪. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭
৫. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১

কেস স্টাডির বিষয়সমূহ হতে পারে নিম্নরূপ:

১. ভালো নীতি/আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না এমন উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
২. ভালো নীতি/আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনের ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও কার্যক্রম
৩. মন্দ নীতি/আইনের বাস্তবায়নের উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
৪. মন্দ নীতি বা আইনের বাস্তবায়নের কু-প্রভাব
৫. খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি) যার বা যাদের পাওয়ার কথা, তার বা তাদের না পাওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
৬. খাসজলা যার বা যাদের পাওয়ার কথা, তার বা তাদের না পাওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
৭. ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি) দখল নেওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
৮. ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর খাসজলা দখল নেওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ

৯. খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি) যার বা যাদের পাওয়ার কথা নয়, তার বা তাদের পাওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
১০. খাসজলা যার বা যাদের পাওয়ার কথা নয়, তার বা তাদের পাওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
১১. ভূমিগ্রাসীদের খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি) দখল নেওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
১২. ভূমিগ্রাসীদের খাসজলা দখল নেওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
১৩. অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ
১৪. দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের প্রভাব
১৫. নারীর ক্ষমতায়নে বা অধিকার রক্ষার্থে নীতিমালা বা আইনের প্রভাব
১৬. উপরোল্লিখিত ১৫টি বিষয়ের বাইরে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বা আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা ও প্রভাবসম্পর্কিত যেকোনো বিষয়।

এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করুন: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আপনি যেভাবে আমাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রদান করলেন—এজন্য আমরা আপনার কাছে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ।
আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।

পরিশিষ্ট ৪

এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষণাদল

প্রধান গবেষক

অধ্যাপক আবুল বারকাত, *পিএইচডি*

সহ-গবেষক

গাজী মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী
আসমার ওসমান
মো. অলিউল ইসলাম

গবেষণা সহযোগী

নুরুন্নাহার
হাসনা হেনা শাওলী

পাণ্ডুলিপি-উন্নয়ন সহযোগী

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

মাঠগবেষণা সমন্বয়ক

মো. কবিরুজ্জামান লাপ্পু

মাঠগবেষক

কবির আহমেদ
রফিকুল ইসলাম রাসেল
জ্যোতি চাকমা

ব্যবস্থাপনা

আবু তালেব
আরিফ মিয়া

প্রকাশনা সমন্বয়ক

সেলিম রেজা

প্রকাশনা সহযোগী

মোজাম্মেল হক
সাবেদ আলী

কারিগরি সহযোগিতা

অজয় কুমার সাহা

নির্ঘণ্ট

অ

অংশগ্রহণমূলক, ৮৯, ১১৩, ১৪৯, ১৮০, ২০৭

অংশীদারিত্ব, ১২৯, ১৩২, ৩৭৩

অ-আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ১৪, ১৮৩

অকৃষি, ১৩, ১৪, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৫৪, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৪১, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৯৪, ২৯৯, ৩১২, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৬, ২৪, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫৬, ৬৮, ৭২, ৭৫, ৭৬

অকৃষি খাত, ৭২, ১৮৮, ১৯৮

অকৃষি খাসজমি, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৫৪, ৬০, ৬১, ৭২, ৭৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ২১৪, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৪১, ১৪৫, ২৪৬, ২৪৭৮, ২৫০, ২৫১, ২৯৪, ৩১২, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫

অকৃষি খাসজমির বিতরণ প্রক্রিয়া, ৯৫, ৯৭, ১০৪

অকৃষি খাসজমি শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ১০৩

অকৃষি জমি, ৩৬, ৫৮, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১৯১, ৩৪৫

অজ্ঞতার ঘোমটা, ১৬, ২৪, ২৮

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ১২২

অদৃশ্য হাত, ৩, ১১, ১২

অধিকার, x, xi, xv, ৩, ৪, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০১০, ১১১, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৮, ১৭১, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২১৮, ২২৩, ২২৫, ২৬৫ ,২৭-, ২৮১, ৩০১, ৩০৫, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৬

অধিকারভিত্তিক ভাবনা, ৩৫, ৪১

অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন, ৩৩, ২১৩, ২১৬

অধিকারহীনতা, x, ২৮, ৪৯, ৫৭, ১১৯

অধিগৃহীত জমি, ১৮৮, ১৯২, ১৯৫, ১৯৯, ২১১, ২৯৫, ২৯৮

অধিগ্রহণ, ১১, ১৪, ২৩, ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৭১, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৯, ১১১, ১২৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২৪৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৯, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫ ,৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫

অধিগ্রহণকৃত জমি, ৪২, ১০২, ১০৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ২০০, ২৪৮, ২৭৮, ৩৪৫

অধিগ্রহণকৃত উদ্বৃত্ত জমি, ৬২

অধ্যাদেশ, ৪১, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৮৯, ১০৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৫,

১৭৫, ১৯১, ২৪৪, ২৫১, ২৬৯, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৫, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪৯
অনুচ্ছেদ, ১৩, ২৫, ২৬, ৪৫, ৪৬, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১২৮, ১২৯
অবৈধ দখল, ৫৯, ৮৮, ৯৬, ১১১, ১১২, ১১৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ২৯৯, ৩১৬, ৩২১
অভিজ্ঞজন, ৪২, ৪৯
অভিবাসন ৩৬, ৭২১
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, xi
অমৎস্যজীব, x, ১১৯, ১৩২
অর্থদণ্ড, ১৬১, ১৬৪, ১৭১, ১৯৩, ২৮৬
অর্থনীতি, xi, xiv, xvii, ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২১, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৫৪, ১২২, ১৮৯, ২০৫, ২১৩, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২৩২, ২৯৫, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
অর্থনৈতিক উৎপাদন, ৮, ২৮, ৪০
অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ১৮৯
অর্থনৈতিক উপযোগীতা, xi
অশোভন পৃথিবী, ২১৯
অসম বণ্টন, ৭২
অসম সম্পর্ক, ৭২, ৮২, ২০৩
অসামঞ্জস্যতা, ১৩, ৩৭
অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ২৫, ২৬, ৬৯
অস্থাবর, ৯৮, ১৮৩, ২৭৫
অস্থায়ী ইজারা, ৬৩
অস্পষ্টতা, ৪৪, ৪৫, ৫০, ৫১, ৭৮৩, ৮৯, ৯০, ১১৩, ১৪৯, ১৬৫, ১৮০, ১৯৩, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২৪৩, ৩৪৯
অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিকুইজিশন অব ইমমুভেবল্ প্রপার্টি ১৫৭

আ

আইএলও কনভেনশন, ১০৮
আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালা, ১২, ১৫, ১৬, ১৭
আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, ১
আইন মন্ত্রণালয়, ২১৬
আইন বিভাগ, x, vi
আইন/নীতির প্রয়োগোপযোগী ভূমি ব্যবস্থাপনা, ৪১
আইন বাস্তবায়নের অর্থনীতি, ৭
আইন বাস্তবায়নের রাজনীতি, ৭
আইনের অর্থনীতি, ৭, ৮, ৪০
আইনের ইতিহাস, ২
আইনের গড় স্কোর ২১৩, ২১৪
আইনের দুর্বলতা ও ঘাটতি, ১৬৫
আইনের বাস্তবায়ন, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ৩৫১, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫
আইনের ব্যবহার, ১
আইনের রাজনীতি, ৭, ৪০
আইনের শাসন, ৬, ২৫
কার্যনির্বাহী আইন, ৬৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ৬১, ৬২
ট্রাস্ট আইন, ১৯১
তামাদি আইন, ১৪৬, ১৪৭
নির্বাহী আইন, ৬৮, ৬৯
পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ, ৬২
পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ৬২, ৯৯, ১০৭
প্রকৃত আইনের দূরত্ব, ২১৩, ২১৪
বঙ্গীয় পয়োস্তি ও সিকস্তি আইন, ৬১
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ৯৮, ১৯১
বন আইন, ১৯১, ৩৪৩
ভূমি আইন, x, xii, xiv, ৮, ৫, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪১, ১৮৭, ১৯২, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২৩১, ২৩৩, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪
ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ, ২১৮
শাস্তির আইন, ১৫

সংসদীয় আইন, ৬৯
সামরিক আইন, ৯৯, ২৬৯
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ১৫৭, ১৬৬, ১৮০, ১৮১, ১৮২
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ৭৮
আইনানুগ ব্যবস্থা ৬৮, ৭৭, ১৭৯, ২৪৪, ৩১৫
আইনি অসংগতি, x
আইনি এবং নীতিগত সীমাবদ্ধতা, ২১৩
আইনি দৃষ্টিকোণ, ৬৯
আইনি নির্দেশনা, ১৫৬, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৮৩, ১৮৪
আইনি বাধ্যবাধকতা, ১৪, ১৫৫, ১৬৬, ২১৬
আইনি সমস্যা, ৩০, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬০, ৯০, ১৪৬, ১৫৮, ১৮১, ১৯৪, ২০৮, ২১৩, ২১৬
আইনি সত্তা, ৭৩
আইনি সংস্কার, ১৮৩, ২১৩
প্রধান আইনি দলিল, ৬৩, ১৯৪
আইনের আশ্রয়, ৮২, ৮৮
আইনের প্রাধান্য, ১৫৯, ১৫২, ২৭১, ৩৪৪
আইসিসিও কো-অপারেশন, ৪২
আইসিএলআরএম, ১২৫
আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি, ১১, ১২, ৩০, ২১৮
আদর্শ অবস্থা, ১০, ১৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৭০, ৯১, ৯৫, ১১৫, ১২০, ১৫১, ১৫৬, ১৮২, ১৮৮, ১৯৫, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২৪৩, ২৬৫, ২৯৭
আদর্শ আইন, ২১৪
আদর্শ মানদণ্ড, ৭০
আদালত, ৯৯, ১০৬, ১২৯, ২৪৬, ২৬৪, ২৮৫, ২৮৭, ২৯৭, ৩১৬, ৩১৭, ৩৩৮, ৩৫৬
আদিবাসী, xv, ১৪, ২২, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২, ৫৭, ৫৮, ৮০, ৮৩, ৯২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৬, ১৬০, ১৮৭, ১৯১, ১৯৭, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১০, ২১৭
আধি, ১৬৩
আধিপত্য, ১০, ১২, ৩০, ৮২, ১০৭, ১৪৫, ২০২
আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স, ১৯৫, ২৯৭
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ২৪
আন্ডারভ্যালুড, ১৬৬
আপিল, ৯৬, ১১৭, ১৪৭, ১৪৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৭০, ১৭৪, ১৭৯, ২৫৯, ২৬০,২৬৯, ২৭২, ২৮৩, ২৮৪, ৩০৮, ৩৩২, ৩৩৫
আবাদি জমি, ৬০, ১৪৭, ১৮৯, ২৯০
আমলাই, জুমলিয়ান, xv
আম্বাড়িয়া ছেওগাঙ জলাশয়, ১৪৪, ১৪৬
আর এন্ড আর হোল্ডিং, ১০৮
আরবিট্রেটর, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ২৭০, ২৭৬, ২৮০, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮
আরবিট্রেশন, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৭০, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪,২৮৭, ২৮৮
আরবিট্রেশন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৬১
আরাজী সাজিয়াড়া মৌজা, ১১১
আর্থরাজনৈতিক, ২১৮, ২১৯
আর্থসামাজিক, ৮৫, ১৩২, ১৫৫, ১৬৫, ১৮৩, ১৮৯, ২১৭
আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ৫, ৬, ১৮, ৪৩
আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ১৪৩, ১৬৭
আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ১২৭, ১৩৩
আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি, ১১, ১২, ৩০, ২১৮
আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা, ২১৯
আল-আমিন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, ৭৯
আলমগীর মোস্তফা কামাল, ৮৭, ৮৮
আলী, আহসান, xv
আলী, সাবেদ, xvi
আল্লা বিল, ১৪৫
আহমেদ, কবির, xvi
আহমেদ, মঈন ইউ, ৩৭৯
আহমেদ, শাহীন, xvi

ই

ইউনিয়ন, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৬৬, ২৪৩, ২৬০, ২৬৫, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩২৩, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৬৫, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৭৫
ইউনিয়ন পরিষদ, ৭৫, ২৪৩, ২৬০, ২৬৫, ৩১০, ৩১১, ৩২৩, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৫৭
ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ৮৩, ২৬৫, ৩৩৮
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৪৪
ইকোনমিক জোন, ৭৯, ১৭২
ইজমেন্ট, ১৪৬, ১৪৭, ৩৩৮
ইজারা, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৭৭, ৮৩, ৯৭, ১০১, ১০৯, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ২২৩, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৭৯
ইজারাদার, ৬৪, ১২৩, ১২৪, ১৩৪, ২৬৭, ৩৪১
ইটভাটা, ৮৭, ২০০, ২০১, ৩৪৫
ইন্সট্রাক্শন রিগার্ডিং অ্যাকুইজিশন, ১৫৮
ইয়ান, রানী ইয়ান, xvii
ইসলাম, অলিউল, xiv, xvii ৩৭৯
ইসলাম, তৌহিদুল, xv
ইসলাম, নজরুল, ১৪৫
ইসলাম, এস. এম. তরিকুল, xvi
ইসলাম, সাহাদুল, xv
ইসলাম, সিরাজুল, xv, ২২১
ইসলামপুর, ১৪৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ৯৭
ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট, ৬০, ৬২

উ

উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আত্মসাত, ১২
উৎপাদনসম্পর্ক, ৩, ২১৭
উখারিয়া বাড়ি, ১৪৫
উচ্ছেদ, ৬, ৪৭, ৭৮, ৪০, ৪৪, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯৮, ১০৫, ১০৬, ১০৮৯, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১২৪, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৫, ১৭০, ১৭১, ১৭৬, ২২৬, ২৮১, ২৮২, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
উডলট, ২০৬
উড়ির চর, ৬৫, ৬৭, ৭৬, ৮৮, ৯৮, ১০৪, ২৪০, ২৪৮, ২৮১, ৩১১, ৩২৩
উত্তরাধিকারী ব্যক্তি, ৬৫
উৎপাদন ক্ষমতা, ৬৫, ২০৬
উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, ২১৯
উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, ২১৭
উদ্দীন, মোঃ জসীম, xvi
উন্নয়ন অংশীদার, ৯৩
উন্নয়ন প্রকল্প, ২৬৫, ৩৩৯
উন্নয়ন সংস্থা, xiv, xv, ৩২, ৩৯
উন্মুক্ত, ৪২, ৪৮, ৫৮, ৯৩, ৯৬, ১১৬, ১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৯১, ২১১, ২৫৩, ২৬৬, ২৯৬, ৩০০, ৩২৫, ৩৪০, ৩৫৭, ৩৬৩
উন্মুক্ত জলাশয়, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২৬৭, ৩৪০
উন্মুক্ত নিলাম, ১২৪
উপকারভোগী, ৫৭, ৬৮
উপকেন্দ্র, xv, xvi
আখতার মিয়ারহাট উপকেন্দ্র, xvi
চরবাড্যা উপকেন্দ্র, xvi
নওকাঠী উপকেন্দ্র xv, xvi
পাইকগাছা, xv, xvi
পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, xv
মধুপুর উপকেন্দ্র, xv
সমীরহাট উপকেন্দ্র, xvi

সাঘাটা উপকেন্দ্র, xv
উপকূল, ২২, ১১১, ১১২, ১৮৮, ১৯৯, ২০০, ২১১, ২৪০, ২৯৩, ২৯৭, ৩০০, ৩১১, ৩৪৬
উপজেলা, xv, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৬, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৫, ১৬৬, ১৭১, ১৭৮, ২০১, ২০৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৯২, ২৯৩, ৩০০, ৩০১, ৩০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৭৫
উপজেলা কমিটি, ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৯, ৯৬, ১১৭, ২৫৬, ২৬৭, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩, ৩১৬, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬
উপজেলা জলমহাল কমিটি, ১৩৭
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ৬৫
উপজেলা ভূমি অফিস, ৮৩, ১৩৬, ১৪৬
উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা, ১৩৬
উপজেলা সদর, xv, ৭৩, ১১১, ৩১২, ৩১৮
উপযোগী পরিবেশ ও আচরণ, ৪১, ১২৩
উপযোগিতা, ১৯০, ৩৪৯, ৩৫৭
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ৬৯, ৭২

এ

এএলআরডি, xv, xvii, ১৯১, ২২১
এওয়াজ, ৭৯, ১৬৩, ২৭৮, ৩২২, ৩৪৬
একপক্ষীয়-কর্পোরেট শ্রেণিসংগ্রাম, ৩০
একসনা বন্দোবস্ত, ৬৩, ৬৭, ৭৭, ১১৩
একান্নবর্তী পরিবার, ৭২, ৭৩
এখতিয়ার, ১০৩, ১৫১
এনজিও, ৭৫, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৯৬, ২০২, ২৬৬, ২৬৭, ৩১০, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ২০৫
এ্যান্টিথিসিস, ৮
এ্যারিস্টটল, ৩

ঐ

ঐতিহাসিক, ৩, ৮, ১০, ৫৫, ৬০, ৯৭, ১২৩, ১৫৭, ১৬৮, ১৯০, ২২১, ৩৩৮
ঐতিহ্যগত অধিকার, ২০৭

ও

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯১
ওয়াক্ফ ভূ-সম্পত্তির, ১৯১, ২৯৯
ওয়াটার লর্ড, ১৩৯
ওয়াপদা, ১১১
ওয়ার্ড মেম্বার, ৬৫
ওয়েব পোর্টাল, ১৩১

ঔ

ঔপনিবেশিক, x, ৩৭, ৬২
ঔপনিবেশিক মানসিকতা, x
ঔপনিবেশিক-সামন্তবাদী শোষণ, ৬২

ক

কতিপয়তন্ত্র, ১০, ১২
কবির, খুশী, xii, xvi
কবুলিয়াত, ৬৭, ৭৩, ৭৯, ৮৫, ৮৬, ১৪২, ৩০৭, ৩১৪
কমিউনিটিভিত্তিক ফিশারি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, xv, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬,

৯৭, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১২০৭, ১১৭, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৮, ১৫২, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৬, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩২১, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬
কমিউনিটি সংগঠক, xv
কমিটি, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯
কমিশন, ৯৯, ১২২, ২১৮, ২৮৫, ৩২০
কর, ৫, ৬৭, ৯৮, ১৫৫, ১৬৭, ১৮৩, ২৫১, ২৯৬, ৩৪৪
কর্মকার, সুরেশ, xvi
কর্মসংস্থান, ৩৬, ১৯৮, ২৫৪, ২৬৪, ২৯১, ৩২৭, ৩৩৮
কর্মসূচি, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৭৫, ১১০, ১৩২, ১৯৯, ৩০৯, ৩১০, ৩২৮
কর্নওয়ালিস, লর্ড চার্লস, ৯৭
কলকাতা, ১৫৭
কাঠামো, x, xi, ১, ৪, ৬, ৯, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ২২, ২৯, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২৩, ১৫৮, ১৬৫, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৮, ২১০, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২৪, ৩১৮, ৩৪৫, ৩৫৬, ৩৬৪
কাঠামোগত রূপান্তর, ২১৭
কান্দা, ১৪৬, ১৪৭, ১৯০
কাপ্রুপাড়া, ১১০
কামরাভুক্ত, ৮, ৪৩
কাম্য অবস্থা, ১৮, ১৯
কারবারি, ১০৮, ১১০
কারাদণ্ড, ১৬১, ১৭১, ১৯৩, ৩৪৮
কারিতাস, ১২৫
কারেন্ট জাল, ১২
কার্ডধারী জেলে, ১৩৫
কার্যকর চাপ সৃষ্টিকারী জোট, ৯৪
কার্যত ভূমিহীন, ৭৭, ২১৮
কার্যনির্বাহক, ১৩, ৫৭, ৬৮, ৭০
কালেক্টর, ১২৪, ১৫৭, ২৩৮, ২৫৮, ৩০৯, ৩২১, ৩৩১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৪
কালো টাকা, ২৩
কালো তালিকাভুক্ত, ১৩১
কুমার, নিহার, ১৪৭
কুমারঘাটা, ৮৮
কেয়া, নিগার সুলতানা, xv
কোর্ট ফি, ২১, ৬৫, ৬৬
কৃত্রিম বনায়ন, ২০৬
কৃষক, x, xiv, ৫, ৬, ১৪, ২৫, ৩১, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ১৭২, ১৮৭, ২০০, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২১৭, ২১৯, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৯৪, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৫, ৩৩১, ৩৩৩
কৃষক আন্দোলন, ৬০
কৃষক-জলাজীবী-বনজীবী, xiv
ভূমিহীন কৃষক, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৯, ১০৪, ১৪২, ১৪৩, ১৮৭, ২৪৩, ৩১০, ৩১৫
কৃষি অধিদপ্তর, ১২৭
কৃষি উৎপাদন, ৬৩, ২৯৩
কৃষি খাসজমি, ৫৯#
কৃষি খাসজমি বরাদ্দ, ৭৫, ৭৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৮
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১১৬, ২২১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০৩১১৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩৬৭
কৃষিজমি, ৩৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৬, ১০৪, ১০৫, ১৫৬, ১৭১, ১৭২, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২১০,২১১, ২১৭, ২১৮, ২৩৮, ২৯৯, ৩০৯
কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ১৯১
কৃষিনির্ভর, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৭৬, ২০২
কৃষিবান্ধব, x
কৃষিভূমি-জলা সংস্কার, ২১৩

কৃষি শ্রম, ৬৩
কৃষিজীবী-জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী, ১৯, ২১৭
কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষ, ৪০
কৃষিতে শ্রেণিসম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন, ২১৭
কৃষির ওপর নির্ভরশীল ভূমিহীন পরিবার, ৬৩
কৃষির উৎপাদনসম্পর্ক, ২৭
গ্রামীণ কৃষি, ৭২
ক্রামাদি পাড়া, ১০৯
ক্ষমতাকাঠামো, ৩, ৪, ১৫, ৩০, ৩৬, ৪৮, ১৭১, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
ক্ষমতাকাঠামোর বাইরের মানুষ, xi
ক্ষমতাবান, ৪৮, ৮১, ১১১, ১৩৫
ক্ষমতাশালী ভূমিগ্রাসী, ৫৭, ৬০
ক্ষমতাসীন সরকার, ৮৭
ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, ১৯৫
ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি, xi

খ

খতিয়ান, ৬৭, ৭৯, ৮৬, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৬, ১৬৮, ১৯০, ২৪২, ২৫০, ২৫১, ২৭৮, ৩১৪, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫৬
খলিল, ইব্রাহীম, xvi
খসড়া, ৪৪, ৮৭, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১১৬, ১২০, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৮, ২১০, ২২৫, ৩০৫,
খাগছড়া বিল, ১৪৫
খাগড়াছড়ি, ১৫৮, ২৩৬, ২৫২
খাজনা, ৫, ৬২, ৬৪, ৬৭, ৭৯, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১২২, ১২৩
খাতওয়ারি প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ, ২১৬
খাতুন, আলেয়া, xv
খাতুন, জেসমিন, xv
খাতুন, নাসিমা, xv
খাতুন, রেখা, xv
খাতুন, রেবেকা, xv
খাতুন, সোনিয়া, xv
খাদ্য নিরাপত্তা, ১৩, ৩৭, ৬০, ১২৬, ১৮৯, ২০৪, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭৪
খান, আইয়ুব, ৬২
খান, রাসেল, ১৪২
খাস খতিয়ান, ১৫৬, ১৬৮, ২৫০, ২৭৮
খাসজমি, ১৩, ১৪, ১৭, ২৩, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৯১, ২৯৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭
খাসজমি অধিগ্রহণ ও বিতরণের ইতিহাস, ৯৭
খাসজমি প্রাপক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, ৬৯
খাসজমি বরাদ্দের সহজলভ্যতা, ৬৯
খাসজমি বন্দোবস্ত, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ২৩৬, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ৩০৭, ৩১৫, ৩১৮, ৩২১
খাসজমি বাছাই কমিটি, ১০৬
খাসজমিতে ভূমিহীন পরিবারের অধিকার, ৬৯
খাসজমির প্রাপক, ৬৩, ৬৯
খাসজমির বণ্টন স্বচ্ছতা, ৬৩, ৬৯, ৭৭
চিংড়ি ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি, ৬৭, ৭৩
জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, ৬৫, ৬৬, ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, ২৪৪, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৬

জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি, ৬৬, ৮৬, ২৩৬, ২৩৮, ২৪১, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১২, ৩১৩
থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি, ৬৬, ৮৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ৩১৩
প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত খাসজমি, ৬৫
বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত খাসজমি, ৬৭
বরাদ্দকৃত খাসজমি, ৬৭, ৭৩
ভোগদখলকৃত খাসজমি, ৮৫, ৮৬
খাসজলা, ২১৭, ৩৭৫, ৩৭৬
খাসভূমি ব্যাংক, ৯৬
খাসমহাল, ৯৮
খুপড়িভুক্ত, ৮, ৩০
খুলনা, ৩৫৩

গ

গড় স্কোর, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৯০, ৯১, ৯৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৮, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫
গণতন্ত্র, ২৪, ২৫
গণপণ্য, ৭০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২২২
গণমাধ্যম, ১৩৭, ১৭২
গণমানুষের সম্পৃক্ততা, ৩৩, ২১৩, ২১৯
গবেষণা, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮৫, ৯১, ৯২, ১১৫, ১০৬, ১১৪, ১১৬, ১২৩, ১২৯, ১৩৬, ১৫০, ১৫১, ১৭১, ২০৩, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২৪, ২২৫, ২৩১৪, ২৩৩, ২৬৬, ৩০৫, ৩৩৬, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৭৯
গবেষণা রিপোর্ট, xiv
তথ্য-উপাত্তনির্ভর গবেষণা, xiv
মাঠজরিপভিত্তিক গবেষণা, xiv
গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল, ৬১, ১৯১
গভর্নর জেনারেল, ৬২, ৯৭
গাইন, ফিলিপ, ২২২, ২২৩
গাইবান্ধা, xv, ৪২, ১৭৩, ১৭৪
গুচ্ছগ্রাম, ১০৭, ১৪৪, ২৬৫
গোল্ডস্মিথ্, অলিভার, ৩৮
গ্যাংরাইল নদী, ৮৬, ৮৭, ৮৮
গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধন, ২৫
গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য ও বিপন্নতার কারণ নির্ণয়, xi
গ্রিন ইকোনমিক জোন, ১৭২
গ্লোব কোম্পানি, ৭৯

ঘ

ঘুষ, ২১, ২২, ৭৭, ৮৩, ১১৩, ১৩৭, ১৪৬, ১৬৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ১৯০, ২১৭
ঘূর্ণিঝড়, ১১১

চ

চটচটিয়া কুমারঘাটা ভূমিহীন সংগঠন, ৮৮
চরবাটা, ৮৪, ৮৫
চরবাড্যা, ৬
চরমজিদ, ৮৪, ৮৫
চরাঞ্চল, ১৯৬, ২৯৮, ২৯৭, ৩৪৬
চরের জমি, ৫৯, ৬৩, ৭৬, ১৯৯, ২১০
চাকমা, জ্যোতি, xvi, ৩৭৯
চাকমা, লিটন, xvi
চাকমা সার্কেল, xvii
চাকমা সার্কেল চিফ, xvii
চাহিদা, ৮, ৪০, ৪৮, ৯৫, ৯৬, ১০৬, ১৫৭, ১৭৩, ১৯১, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৯, ২৬১, ২৯৪, ৩৫৭
চিংড়ি চাষ, ৭৪, ৮৭, ১৯২, ৩৪৬, ৩৪৭
চিংড়িমহাল, ৩৮, ৩৪৩
চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন, ১৫৮
চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৫৮

চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) রেগুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৫৮
চিম্বুক পাহাড়, ১০৯, ১১০
চেতনায়নেই উন্নয়ন, xi
চেয়ারম্যান, xv, xvi, xvii, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ১০৯, ১১২, ১৩৭, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৬০, ২৬৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩২০, ৩২২, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪
চুক্তি, ৫, ২৪, ১২২, ১২৯, ১৩০, ২০০, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৭৮, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৫
চুক্তিপত্র, ১০৩, ২৪৮, ২৪৯, ২৫১
চুক্তিবদ্ধ চাষ, ২০১, ২০২
চুক্তিবদ্ধ সমিতি, ১২০, ১৩৪
চৌধুরী, হেমচন্দ্র, ১৪৪
চৌহদ্দি, ৭৯
চ্যাং, হ্যা-জুং, ৮
চ্যারিটেবল এন্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট এ্যাক্ট, ১৯১

ছ

ছদ্মরাজনৈতিক, x

জ

জঙ্গল, x, ৩, ১০, ১৬, ১৭, ৩৬, ৯৮, ২১৭
জঙ্গিবাদ, ১৩০, ২৬৬, ৩৪০
জন-উদ্দেশ্য, ১৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৮৩
জনকল্যাণ, ৩০, ৩৭, ৪৭, ৭০, ১৫৭
জনগণের সম্মতি, ২৬
জনগুরুত্বপূর্ণ, xiv
জনপ্রতিনিধি, ৭৭, ৭৮, ১১০, ১৩৬, ১৪১, ২০০, ২৯৩, ৩৫৭
জনপ্রয়োজন, ১৬২, ১৭১, ২৭২
জনবান্ধব, x
জনমানুষ, xii, ৪৩, ৪৭, ১৫৫, ১৬৭, ২১৭
জনমানুষের দুর্ভোগ, x
জনসম্মতি উৎপাদন, ২৪
জনসম্মতি ইঞ্জিনিয়ারিং, ২৪
জনসাধারণ, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৭, ৩০২, ৩৫৪
জনস্বার্থবিরোধী উদ্দেশ্য, ৩, ১৬২
জনস্বার্থ, ১৪, ২০, ১৫৫, ১৫৮, ১৬২, ১৬৫, ১৬৮, ১৮৩, ২৪৪, ২৫৩, ২৬৩, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৮, ৩১৬, ৩২৫, ৩৩৭, ৩৪১
জবরদখল, ১১, ৩৬, ৪৭, ২০৫, ২১০, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
জবাবদিহিতা, ১৩, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৮, ৭০, ৭২, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৬, ১০৬, ১১৪, ১১৭, ১২৩, ১৬০, ১৫৩, ১৭৮, ১৮১, ১৮৮, ১৯৮, ১৯৯, ২০৬, ২১০, ২১১,২১৭, ২১৮, ২২৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮৭, ২৪৯, ২৬৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৭৮, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
জমি, x, xii, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ২১, ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০,১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪
উদ্বৃত্ত জমি, ৩২
চাষযোগ্য জমি, ৫৭, ৬০, ১৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪
জমি-জলা-জঙ্গল, x, ৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২১৮
জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, ১৫, ১৬
জমি-জলা-বনদস্যু, ১৭, ২২, ২৩
জমি রেকর্ড, ৬৩

জমিসম্পর্কিত আপত্তি, ৬৬
জমির উৎপাদনশীলতা, ১৯১
জমির মালিকানার সীমা, ৬৩, ৬৪
জমির সেলামি, ১০৪
নতুন জেগে ওঠা চরের জমি, ৬৪
পয়োস্তি জমি, ৩১৬
পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি, ৮২, ১১৩
বাতিল মালিকানার জমি, ৫৯
রোডস্ এ্যান্ড হাইওয়ে বা সড়ক ও জনপথ-এর জমি, ৮২
সেচ সুবিধাযুক্ত তিন ফসলি জমি, ৬৬
সেচ সুবিধাযুক্ত দু ফসলি জমি, ৬৬
সেচ সুবিধাহীন এক ফসলি জমি, ৬৬
জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী, ২১৪
জমিদার, ৯৮, ৯৯, ১২৪, ১২৫, ২২২
জমিদারি, ৯, ৬২, ৯৪, ৯৯, ১০০, ১২৪
জমিদারি ব্যবস্থা, ৬২, ৬৪
জরিপ, xiv, xvi, ৩২, ৩৮, ৬৮, ৭৪, ৮০, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ১৪৫, ১৬৫, ১৮৯, ১৯১, ১৯৮, ২০০, ২০৮, ২১২, ২৩৮, ২৪৪, ২৬৭, ২৮৬, ৩০২, ৩০৯ ৩১৬, ৩২১, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫৩
জলই বিল, ১৩৯
জলজীবী, ১৫
জলমগ্ন, ১২০, ১২১, ১৪৪, ১৫৪, ৩২৬, ৩৪৫
জলমহাল, ১৪, ২৩, ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫৪, ১২০, ২২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ২১৫, ২১৬, ২২৩, ২২৪, ২৪৯, ২৫০, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৯৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৬
জলা, xii, ১৪, ২২, ৩৫, ৩৯, ৫৮, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯, ১৫৩, ২১৮, ২২৮, ২৫৬
জলা সংস্কার, ৩৩, ২১৪, ২১৮, ২২৮
জলাগ্রাসী রেন্টসিকার, ১৪৪, ১৪৮
জলাজীবী, ৩৫, ৩৬, ১০৫, ১৫৩, ২১৮
জলাবদ্ধতা, ৮৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ২০৭, ৩০২
জলাভূমি, ২৬, ১২৩, ১৯৭, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৮
জলাশয়, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৯০, ১৯২, ২৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ৩০১, ৩০২, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৭, ৩৫৮
জাগীরা চালা, ১৪৬
জাতীয় কৃষিনীতি, ১৯৬, ২৯৮
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, ১৬০, ১৬৬, ২৭১, ২৭৩
জাতীয় নির্বাহী কমিটি, ৯০, ২৪৩, ২৪৫, ৩১৪, ৩১৬
জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, ৯১, ৯২, ১১৫, ১৫১, ১৮২, ২০৯
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ৩৯, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০০, ২০২, ২০৩, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৫, ২১৬,২২৩, ২৯০, ২৯১, ৩০৩, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৭৬
জাতীয় বন নীতি, ২০৭, ২০৮, ২৯৬
জাতীয় মৎস্যনীতি, ১৯৬, ২৯৮
জাতীয়তাবাদ, ২৪
জামান, শফিক উজ, ২২৬
জামানত, ১৩০, ২৫৮, ২৬০, ২৬৩, ২৬৫, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৩৮
জাম্বিল, মিঠুন, xv
জাল দলিল, ৬৩
জাল যার জলা তার, x, ১৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯, ১৫৩, ২৫৬, ৩২৮
জীবনসংলগ্ন বুদ্ধিজীবী, ২৮

জীবিকা, ৩৬, ৮৭, ১২০, ১২৯, ১৩৩, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ২৫৪, ৩২৬
জীবিকার জন্য কৃষিনির্ভরতা, ৭৩
জুলুমবাজি, ৬
জেলা কমিটি, ৬৮, ৭৩, ৮৭, ৯০, ৯৭, ১১৮, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৮, ৩০৮, ৩১৩
জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি, ৬৭, ৮৭, ২৩৭, ২৩৯, ২৪২, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৩, ৩১৪
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৪৮, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১
জেলা প্রশাসক, ৬৬, ৮৫, ৮৭, ৯০, ১০৪, ১১২, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৯, ১৫৬, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৫০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ৩০০, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১
জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৬৭, ৬৯, ৯০, ২৪৫, ৩১৬, ৩১৭
জেলা ভূমি অফিস, ৮৪
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৮২
জোত, ১৯৩
জোতদার, ৮৫, ৭৯, ৮০, ৮২, ১০৮, ১৩৮, ১৪০
জোম্বি কর্পোরেশন, ২৪
জোরদখলকারী জমি-জলাদস্যু, ২১৮
জ্ঞানভিত্তিক-নৈতিক শক্তি, ৩২
জ্ঞানের ব্যবহার, ৩

ঝ

ঝিল, ১৭০, ১২১, ২৫৪, ৩২৬, ২৪৫, ৩৪৭

ট

টংকাবতী ইউনিয়ন, ১০৯
টাঙ্গাইল, xv, ৪২, ৮২, ৮৪, ১০৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ২০৬
টেকসই উন্নয়ন, ১৩, ১৬, ১৮৯, ২১২, ২১৮, ৩৬২, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৭৫
টেন্ডার, ১২৫
টোল, ১২২, ১২৪
ট্যাক্স, ৫, ১৬
ট্যাক্স দাসত্ব, ১৬
ট্রাস্টি, ৭৪
ট্রিকেলডাউন ইফেক্ট, ১০

ঠ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ৩১
ঠিকা প্রথা, ২০৩

ড

ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন, ২৪
ডিক্রি, ১০০, ২৮৪
ডিজিটাল, ১৭, ৫০, ৭৭, ১৯৯, ২১২, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৫, ৩৫৮
ডুমুরিয়া, ৭৯, ৮২, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১০৬, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৭৯, ২০২, ২২৮
ডোবা, ১২০, ১২১, ১৮৮, ১৯১, ২৫৪, ৩৪৫

ঢ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, xvi, xvii

ত

তঞ্চংগ্যাঁ, সুদত্ত বিকাশ, xv
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ৮৫
তথ্য-উপাত্ত, ৩২, ৩৫, ৪১, ৪২, ৫৪, ৮১
তথ্যভাণ্ডার, ৫৭, ৭৭, ১২১, ৩৫৮,
তফসিল, ৮০, ১২১, ১২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৫৩, ১৫৭, ২৬২, ২৬৬, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪০
তহসিলদার, ৮৩
তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অর্থ, ১
তামাক চাষ, ১৯০
তালুকদার, ৯৮, ৯৯
তালেব, আবু, xvi, ৩৭৯
তেলীখালী গেট, ১৪৩
তৃতীয় লিঙ্গ, ৩১৩
ত্রুটি, ৭৯, ১২৭, ১৫৯, ১৬৬, ২০২

থ

থানা/উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৬৭, ৯০,
থানা সদর, ৯৭, ১০৩, ১১৭, ১৯৫, ২৪২, ২৪৭, ২৪৮, ২৯৬
থিসিস, ৮
থেমিস, দেবী, ৯

দ

দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ৭০
দখল, ৪, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ২২, ৩১, ৫৭, ৫৮, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৬, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ১৭৬, ২২৮, ২৪০, ২৪৪, ২৪৮, ২৫২, ২৬০, ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৫, ৩১১, ৩১৫, ৩২৩, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৭৬, ৩৭৭
দখলকারীদের যোগসাজশ, ২১৮
দখলকৃত খাসজমি, ৮৫
দখলগ্রহণ, ১৬৭, ১৬৮
দণ্ড, ১৬২, ১৯৪, ২৮৭
দর-পত্তনি, ৬২
দরদাতা, ১২৪
দরিদ্র, ১২, ১৫, ১৬, ২৩, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৫২, ৫৭, ৬০, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯৫, ১০৪, ১১১, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৩১, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৫, ১৭১, ১৮১, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৬, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ৩২৭, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা ১২২
দরিদ্র ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ১৩৭
দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ২২, ৩৩, ২১৩, ২১৯
দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী-আদিবাসী-প্রতিবন্ধী ১৪
দরিদ্র-ভূমিহীন xiv, ১৩, ৫৭, ১৪২, ১৪৩
দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারী, ৩৩, ২১৩, ২১৬, ২১৮
দরিদ্রবান্ধব, ৩৭, ৯৩
দহতখালী, ১৭৩, ১৭৪
দাগ নম্বর, ৮২
দাতব্য অনুদান, ৭০
দামোদর, ১৭৮
দায়মুক্তি, ১৬১, ৩৫৬
দারিদ্র্য, xi, ১৪, ৬০, ৭০, ৮০, ৯৭, ১১৯, ১২২, ১২৬, ১৩২, ১৯৮, ২১৭, ২৫৪, ২৬১, ২৬৩, ২৯১, ২৯৮, ৩২৬, ৩৩৫, ৩৩৭
দারিদ্র্য দূরীকরণ, ৯৭
দরিদ্রবান্ধব নীতি, ৩৭
দারিদ্র্য বিমোচন, ৬০, ৭০, ১২৬, ১৩২, ১৯৪, ২৫৪, ২৬১, ২৬৩, ২৯১, ২৯৮, ৩২৬, ৩৩৫, ৩৩৭

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ৬০
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, ১১, ৩৬, ২২৪
দারিদ্র্যের মাত্রা, ৭০, ৭১
আয়-খাদ্যপুষ্টি সংক্রান্ত দারিদ্র্য, ১২২
বহুমাত্রিক দারিদ্র্য, ১৪
দালাল, ২২, ৩৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১৫৫, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০
দালাল-প্রতারক চক্র, ১৫৫, ১৬৭, ১৮৪
দাস, জয়শংকর, xv
দাসপ্রথা, ৯
দাস ব্যবস্থা, ৫, ৬
দাস, মঙ্গল চন্দ্র, ১৪৫
দাসমালিক, ৫
দাসশ্রমিক, ৫
দাস, স্বপন কুমার, xv
দিনাজপুর, xv
দিয়ারা জরিপ, ৬৭, ৭৩, ১৮৮, ১৯৯, ২১১, ২৪৩, ৩১৫
দীঘলকান্দী, ১৭৪
দীঘি, ১২০, ১২৩, ২৫৩, ৩২৫, ৩৪৪
দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা, ৬৪, ১৩৬, ২৪১, ৩১২
দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৬৪, ২৪১, ৩১২
দুর্নীতি, ২২, ২৪, ৩৬, ৩৮, ৪৮, ৫৭, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৯৪, ৯৫, ১০৩, ১০৭, ১১২, ১২২, ১৩৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৭১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ২১৬, ২১৮, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
দুর্বল ব্যক্তি, ১৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৮৩
দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্র, ২১৩
দেওয়ানি, ৭৮, ৯৭, ২৪৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ১৭১, ২৭০, ২৮৩, ২৮৪
দেওয়ানি অধিকার, ৯৭
দেওয়ানি আদালত, ৭৮, ১৫৭, ১৬৪, ১৭০, ২৭০, ২৮৩, ২৮৪
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ২৭০, ২৮৩, ২৮৪
দেবনাথ, তরুণ, xvi
দেবনাথ, পরিতোষ, xvi
দৈনিক বণিক বার্তা, ৪২
দ্বৈত-মালিকানা, ৩৮
দো-আঁশ মাটি, ২০৩
দ্বন্দ্বসূত্রীয়, ৮
দ্য ইমার্জেন্সি রিকুইজিশন অব প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১০৭
দ্য অ্যাকুইজিশন অব ইম্‌মুভেবল্ প্রপার্টি রুলস, ১৫৮
দ্রং, পরিতোষ, xv
দ্রং, সঞ্জীব, xv
দ্ব্যর্থকতা, ৪৪, ৪৫, ৫০, ৫১, ৮৯, ৯০, ১১৩, ১৪৯, ১৮০, ২০৭, ২০৮, ২১৪
দ্ব্যর্থবোধকতা, ১৩, ৩৭, ৩৪৯

ধ

ধনী ভূস্বামী, ৬২
ধর্মনিরপেক্ষতা, ২৪
ধর্মীয় উপাসনালয়, ১৬৮, ২৭২, ২৭৮
ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র, ১১, ২১৮

ন

নওকাঠী, xv, xvi
নগরায়ণ, ৬০, ১৮৯, ৩৫৭
নজরদারি, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ১১৭, ১৩৪, ১৫৩, ১৮৮, ২১১
নতুন সৃষ্ট চর জমি, ৫৯
নথিপত্র, ৭৭
নথিভুক্ত, ৭৫, ৯৫, ৯৭
নদী পয়োস্তি জমি বা চর ভূমি, ৭৩, ৩১৫
নদীগর্ভ, ৫৯, ৬৪, ১৮৯
নদীভাঙ্গন, ৬২, ৬৩
নদীভাঙ্গন কবলিত ধনী কৃষক, ৬৩
নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিনির্ভর পরিবার, ৬৩
নদীভাঙ্গনের শিকার জনগোষ্ঠী, ৮৪
নদীভাঙ্গা মানুষ, ১০৭
নব্য-উদারবাদ/নয়া-উদারবাদ, ১২, ৩০, ৪৩
নব্য-উদারবাদী মতবাদ, ৩০
নাইতং পাহাড়, ১১০
নাগরিক সনদপত্র, ৬৫, ৬৬

নাছিমূল, মল্লিক, ১৪১
নামজারি, ৩৮, ১৬৭, ১৯৬, ২৯৯
নামমাত্র মূল্য, ৭৯, ১৪৪, ১৭৬
নারায়ণগঞ্জ, ১০২, ২৪৭, ৩১৯
নারী উন্নয়ন সংস্থা, xv
নারী-দরিদ্র-প্রান্তিক-আদিবাসীর অধিকার, ৪১
নারীপ্রধান খানা, ২২, ৭০, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৮৩
নারীর প্রতি বৈষম্য, ৭১
নারীর ভূমি অধিকার, ১২, ১৩
নিও লিবারেলইজম, ২৪
নিউ ফিশারি ম্যানেজমেন্ট পলিসি, ১২৫
'নিচের ধাপের' মানুষ, ১৩
নিজেরা করি, xi, xii, xiv, xv, ৩২, ৩৯, ৪২, ৮৮, ১৪৫, ১৪৭, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
নির্দেশক, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৮৯, ৯০, ৯১, ১১৩, ১১৪, ১৪৯, ১৫০, ১৮০, ১৮১, ২০৭, ২০৮
নির্দেশপত্র, ৬৩
নির্বাচনী ইশতেহার, ২১৮
নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, ৬৮
নির্বাহী পরিচালক, xv, xvii
নিয়ন্ত্রণ, ২, ৪, ৫, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ২৭, ৪০, ৫৭, ৫৮, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৭, ৯৭, ১০৬, ১১৯, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৬, ১৯৪, ২০৩, ২৭২, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৮, ৩০১, ৩২৬, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৬৩
নিয়ামক-নির্ধারক, ২১৯
নিলাম, ১২৪
নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত সরকারের জমি, ৫৯
নিষ্পত্তি, ৫৮, ৬৮, ৯৩, ৯৬ ১০৯, ১১৬, ১৪৫, ১৫৬, ১৬১, ১৭০, ১৮৫, ২১০, ২৩৬, ২৪৬, ২৫৯, ২৬১, ২৭২, ২৮৪, ৩০৭, ৩২৪, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৭০, ৩৭৩
নীতি, x, xiv, xvii, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ২২, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৫, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৩, ২২৪, ২২৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৬০, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৯, ২৯৭, ৩০৭, ৩০৮, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫
নীতিনির্দেশনা, ৪১, ১২৩
নীতিমালা, ১২, ১৬, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৩০, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৬, ১৫১, ১৭২, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২১, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৬৭, ২৬৮, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৯, ৩০৭, ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ৩৯, ৬১, ৭২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ২২১, ২৪১, ২৪৫, ৩১২, ৩৬৮
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ৩১, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ২১৪, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৪১, ২৪৫, ৩১২, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫

নীতিমালার মূলপাঠ, ৭৩
নীতিশাস্ত্র, ৭৮
নীরবতার সংস্কৃতি, ১৫
নীলগিরি পর্যটনকেন্দ্র, ১১০
নুরুন্নাহার, xv, ৩৭৯
নেট-পাটা, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩
নোটিফিকেশন, ৬৭, ৭৩, ২৪৩, ২৪৬, ৩১৫
নোটিশ, ৬৫, ৬৭, ৭৭, ৮৫, ৯৬, ১০৯, ১১২, ১১৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৪, ২২৭, ২৪৩, ২৫৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ৩১৪, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৩
ন্যায্য অধিকার, ১৫, ৮১
ন্যায্য হিস্যা, ১৬, ৩১, ৩৫, ৫৭, ১২৬৯
ন্যায্যতার তত্ত্ব, ১৬
ন্যায়সঙ্গত, ১৩, ২৯, ৩৫, ৩৯, ৬৯, ৮৭, ১০৮, ১২২, ১২৬

প

পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন, ১৬৭
পটুয়াখালী, ২৪০, ৩১১
পতিত জমি, ২৯৮
পত্তনি চাষ, ১৮৮, ২০১, ২০২, ২১১, ২২৫
পদ্ধতিতত্ত্বীয় কাঠামো, ১
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ১৫৮
পয়োস্তি, ৫৯, ৬১, ৭৩, ১৯১, ৩১৫, ৩৪৫
পরজীবী শ্রেণি, ১১, ১৭
পরিকাঠামো, ৪১, ১২৩
পরিপত্র, ৪১, ২৩৬, ২৬৮, ৩০৭, ৩৪১
পরিবেশ নীতি, ১৯৯, ২০৭, ২৯৫
পরিবেশগত ব্যয়, ১৪, ১৫৫, ১৬৫, ১৮৩
পরিবেশগত সুরক্ষা, ১৬৭
পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়ন, ৩৭
পরিমাণগত, ৮, ১৮, ১৯, ৪৩
পরিমার্জন, ১৯৪, ২১৬, ২৬৮, ২৬৯, ৩৪১, ৩৪৭
পরোক্ষ, ১২, ৪৮, ১৪০
পলি, ৫৯, ৭৬, ১৪০
পাইকগাছা, xv, xvi
পাকিস্তান, ৩, ৬১, ৬২, ১২৩, ১৯১
পাঠ্যের স্পষ্টতা, ৭৪
পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৮০, ৮১, ১০৫, ১১১, ১১২, ১১৩, ২৫৮, ৩৩১, ১৯৫
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ১৯৫
পাণ্ডুলিপি, xvi, ৩৭৯
পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব, ১৩০, ১৩২
পাভলভ, আইভান, ১৫
পারিবারিক, ২১, ২২, ৭১, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ২১৮
পার্বতীপুর, xv
পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১০৯, ১৯১, ২০৫, ২১৭, ২৯৫, ২৯৭ ৩০১
পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯১
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধিকার কর্মী, xv
পিতলগঞ্জ, ১৭৬
পীরগঞ্জ, xv
পুঁজিবাদ, ৩, ৩০, ২২১, ২২৪
পুনঃগ্রহণ, ৬৬, ৬৮, ৮৯, ১৫৬, ১৬৮, ১৯৫, ২৭৮, ২৯৬, ২৯৮
পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ৬২, ২৪৪, ৩১৫
পুনর্বন্দোবস্ত, ১৪, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৭, ১৮৩
পুনঃসংজ্ঞায়িত, ৬৩
পুনরুদ্ধার, ৯৫, ৯৭, ১০৪, ১৬৩, ১৭৯, ১৮০, ১৯৫, ২১১, ২৭৮, ২৯৮, ২৯৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮
পুনর্বণ্টনযোগ্য, ২১৭
পুনর্বহাল প্রকল্প, ২৬৭
পুনর্বাসন, ১৪, ৮৪, ৮৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৭, ১৮০, ২৭০
পূর্ববঙ্গীয় জরুরি সম্পত্তি দখল অধ্যাদেশ, ১৫৭

পুলিশ, ২১, ৮৫, ১৩৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৮, ৩০৮, ৩০৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৭, ৩৩১, ৩৫৩
পেটি, স্যার উইলিয়াম, ৭, ২১৮
পেশার নিরিখে সংখ্যালঘু, x
প্রকৃত উন্নয়ন, ৩৬
প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশত, ৩৩, ২১৩, ২১৭
প্রকৃত দাবিদার, ৮৩
প্রকৃত ভূমিহীন, ৬৩, ৬৬, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ৩১১, ৩১৩
প্রকৃত মৎস্যজীবী, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭৮, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪১
প্রকৃতিজগত, ২
প্রকৃতিবিজ্ঞান, ১, ৭
প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ২, ২১৯
প্রকৃতির পণ্যায়ন, ৫
প্রকৃতির বিধান, ১, ২
প্রক্রিয়াগত অদক্ষতা, ৯৭
প্রজ্ঞাপন, ১৬০, ১৯২, ২৪৬, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮, ৩৪২
প্রজনন, ১৩৫
প্রজা, ৭৯, ৩৪৪
প্রজাতন্ত্র, ১৩, ২৫, ২৬, ৬৮, ২৭৬, ২৮০
প্রজাতন্ত্রের মালিকানাধীন সম্পত্তি, ৬৮
প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, ২৫
প্রতিপক্ষ, ২৩, ৩০, ৮২
প্রতিবন্ধী, ২৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৮৩, ৩৬৫
প্রতিনিধিত্ব, ৫৮, ৭২, ৭৫, ৮৩, ৯৩, ১২৭, ১৮৭, ১৯৬
প্রত্যক্ষ, ১২, ১২৭, ১৪০, ২৯৮, ২৬৩
প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা, ১৯২
প্রথাগত অধিকার, ১২৩
প্রবহমান জলাশয়, ১৩৬
প্রবিধান, ৯৮, ১৫৭
প্রভাবশালী রেন্টসিকার, ১০৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৮
প্রভাবশালীদের আধিপত্য, ১০৭
প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য, ১৩৬, ২০০
প্রবৃদ্ধি, ১২২, ২৯১
প্রযুক্তিগত নির্ধারকতাবাদ, ১৭
প্ররোচিত আত্মহত্যা, ২৩
প্রশাসন, ১৭, ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৬৩, ৬৯, ৭৮, ১০৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৭৬, ১৭৯, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২২৫, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৭৩
প্রশাসনিক ক্ষমতা, ৬৯, ২০১
প্রশিকা, ১২৫
প্রাকৃতিক সম্পদ, ৪, ২৬, ২১৭, ২৯০, ২৯১, ৩৫০
প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা, ৪
প্রাক্কলিত অর্থ, ১৭৫, ২৭৬, ২৭৭
প্রাদেশিক সরকার, ১২৩
প্রান্তিক, x, xi, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩৬, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৪, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৮, ২০২, ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২৯৪, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬
প্রান্তিক কৃষক, ৫৪, ৯২, ২১৭
প্রান্তিক, জনগোষ্ঠী, x, ১২, ২২, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৮, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৭৫, ৮০, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৬, ১৬৮, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৮, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ৩৬৪

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, ৯৭
প্রান্তিক-দরিদ্র মানুষ, ১৭৩
প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা অসামর্থ্য, ২১৩
প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আছে এমন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, ৬৩
প্রামাণ্য গবেষণানির্ভর জ্ঞান, xi
প্রামাণ্য দলিল, xi
প্রায়োগিক সংজ্ঞা, ২৮
প্রায়োগিক সমস্যা, ৩৭, ৩৮, ১৬৭
প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড, ৭০
প্রার্থীর অর্থনৈতিক অবস্থা, ৭০
প্লট-টু-প্লট সার্ভে, ৮৫
প্লট, ৮৭, ২৯৫, ৩২২, ৩৪৮, ৩৫৬
প্লাবনভূমি, ১৩০, ২৬৬, ৩৪০
প্লেটো, ১০, ১৮, ২৩

ফ

ফকির, ইদ্রিস আলী, xvi
ফাউখাওয়া শ্রেণি, ১১
ফাটকা ব্যবসা, ৩৬, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭৪
ফাটকাবাজ গোষ্ঠী, ১১
ফিউডালিজম, ৫
ফার্সি, ৫৮
ফুলছড়িঘাট, ১৭৩, ১৭৪
ফুলতলা, ১৭৮
ফৌজদারী, ১৪৫, ১৬৪, ১৭১, ২৮৭
ফ্লাউড, ফ্রান্সিস, ৯৯

ব

বংশাই নদী, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
বঙ্গবন্ধু, ২২৪
বঞ্চিত, x, xi, ২৯, ৩৬, ৩৮, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮১, ১২০, ১২২, ১২৬, ১৩২, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৭, ১৬৬, ১৬৯, ২০২, ২১৭, ২১৮
বটিয়াঘাটা, ১১১
বণ্টনযোগ্য, ৫৯, ২১৭
বদ্ধ, ১২০, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৬, ২৯৬, ৩২৫, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪
বদ্ধ জলমহাল, ১২০১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৮, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৬, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪০
বদ্ধ জলাশয়, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২৬৪, ২৯৬, ৩৩৮, ৩৪৪
বনজ, ১০১, ২৬৬, ২৯১, ৩৪০
বনজীবী, ১৫, ৩৬, ৯৬, ১১৭
বনভূমি, ৫৮, ৬৭, ৭৩, ১৩০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২০৫, ২০৬, ২১০, ২২২, ২৪৩, ২৪৬, ২৬৬, ২৯২, ২৯৫, ৩০০, ৩১৫, ৩২৪, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫৭
বন্দর, ১৫৭, ১৭৮, ২০৪
বন্দোবস্ত, ১৩ ,৩৯, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৯১, ১৯৫, ১৯৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৩৬, ২৬৫, ২৬৭, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৭ ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫
বন্দোবস্তকৃত জমি, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৮৯, ১০৩, ২৪৩, ২৪৪, ২৫১, ৩১৪, ৩১৫

বন্দোবস্তগ্রহীতা, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৮৯, ১০২, ১০৩, ১৩০, ১৪০, ২৬৩, ৩১০, ৩১৫, ৩৩৬, ৩৪০
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি, ৭৬, ২৩৬, ২৪২, ৩১৩
বন্ধক, ৬৮
বরগুনা, ২৪০, ৩১১
বর্গা চাষি, xi
বর্গাদার, ৯৭
বর্তস্বত্ত্ব অধিকার, ১৪৭
বর্তস্বত্ত্ব মামলা, ১৪৬
বর্ষা মৌসুম, ১৩০, ১৩৪, ২৬৬
বলপূর্বক অভিবাসন, ৩৬
বসতবাড়ি, ৬৫, ৬৬, ৭৬, ১৪৬, ৩৪৪, ৩৪৫
বস্তিয়ায়ন, ১৮৯
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, xv
বাংলাদেশ গেজেট, ২৩৫, ২৪৫, ২৬৯
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সিটিটিউট, ৮৫
বাংলাদেশ ল্যান্ডহোল্ডিং লিমিটেড অর্ডার (পিও ৯৮), ৬১
বাংলাদেশ স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার (পিও ১৩৫), ৬১
বাংলাদেশের অনুন্নয়নের গোড়ার কথা, ২১৭
বাংলাদেশ সংবিধান, ৩৩, ৫৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৫, ২২২, ২৬৯
বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধান, ২১৩, ২১৬
'বাইরে থেকে যাওয়া অদরিদ্র', xiv
বাওর, ৫৮, ১১৯, ১২০, ২৫৩, ৩৪৬
বাঁশতলা, ৮৬, ৮৭,
বাঁশের পাটা, ১৩৮
বাগেরহাট, ১৭৯, ২৪০, ৩১১
বাজার অর্থনীতির মারপ্যাঁচ, ২১৪
বাজারদর, ৯৬, ১০২, ১০৫, ১১৭, ১৬৬
বাজেট, ৪৮, ৭৮, ১৬৯, ২১৬, ৩৭৩
বাজেট ঘাটতি ৪৮, ৫২, ৯০, ৯১, ১১৪, ১৫০, ১৮১, ২০৮, ২১৫
বাজেয়াপ্ত, ৬২, ১০৩, ১২৯, ১৩১, ১৯৩, ২৫১, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৭
বাটলার, স্যামুয়েল, ৩৮
বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১২৭, ১২৯, ২৬৪, ৩৩৭
'বাদপড়া' জনগোষ্ঠী, ৩১, ৩৭
বান্দরবান, ১০৯, ১১০, ১৫৮, ২৩৬, ২৫২
বান্দরবান সেনানিবাস, ১০৯
বারকাত, আবুল, xi, xiv, xvii, ৬, ৮, ১২, ১৪, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৭৪, ৭৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১১৬, ১২২, ১২৩, ১৫১, ১৫৮, ১৯১, ১৯৪, ২০৩, ২০৪, ২১০, ২১৩, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ৩০৫, ৩৭৯
বালুমহাল, ৩৮, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৬
বাস্তবায়ন সমস্যা, xi, xiv, ৮, ৯, ১০, ১৩, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৫, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৩০, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ১৮৮, ১৯৬, ২০৮, ২০৯, ২১৫, ২১৬, ৩৬১৪, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪ ৩৭৫, ৩৭৬
বাস্তবায়নের দূরত্ব, ৫৫, ২১৩, ২১৫
বাস্তচ্যুত, ৭১
বাস্তভিটা, ৬৫, ১১৩, ১৭৮
বাস্তহারা, ১৫৫, ১৭১
বিএস, ১৯০
বিঘা, ২৯, ৫৯, ৮৭, ৮৮, ৯৯, ১৪৬, ১৭৪, ১৮৯, ২০৩, ২০৪, ২৭৩
বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ১২, ২২, ২২৪
বিচ্ছিন্ন-দূরদৃষ্টিহীন-জনসংযোগহীন, x
বিত্তবান রেন্টসিকার, ১৩২
বিধবা, ৫৮, ৬৩, ৯৭, ৭১, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৯২, ২৪১, ৩১২
বিধান, ২, ১৩, ২৪, ২৬, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১১৭, ১১৯, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৪৬, ১৫২,

১৫৬, ১৫৭, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ২১০, ২১১, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮৩, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৯, ৩১৭, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৬
বিধিবহির্ভূত ব্যয়, ২১৭
বিধিমালা, ৩৭, ৪০, ৪১, ১২০, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮, ১৭৯, ১৮৪, ১৯২, ১৯৭, ১৯৮, ২১৬, ২৩৮, ৩০৫, ৩০৯, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫১
বিপণন, ১২৭, ১২৯, ১৩৩, ২৬৪, ২৯৫, ৩৩৭
বিপন্ন, জনগোষ্ঠী, xi
বিপ্লব, ৬, ২৮
বিবর্তন, ১, ৬০, ৬১
খুলনা বিভাগ, xv, ২৩৭, ৩০৮
ঢাকা বিভাগ, xv, ২৩৭
রাজশাহী বিভাগ, xv, ২৩৭, ৩০৭
বিরোধ, ৩৭, ৫৮, ৯৩, ৯৬, ১১৬, ১৫৭, ১৯৬, ২১০, ২৯৯
বিল, ৫৮, ১২১, ১২৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৭৮
বিল ডাকাতিয়া, ১৭৮
বিল পাবলা, ১৭৮
বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ১২১
বিশ্ব ব্যাংক, ২৪
বিশ্ব মহামন্দা, ১১
বিশ্বযুদ্ধ, ৬
বিশ্বাস, আশুতোষ, ১৪১
বিশ্বাস, মনিন্দ্র, ১৪১
বিশ্লেষণ, xiv, ২, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৪, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪১, ৫৪, ৬৮, ১৫৭, ১৯০, ২২৪, ৩৫৩, ৩৫৭
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, xiv
বিসিক শিল্প নগরী, ১৯৫, ২৯৬, ৩০১
বুদ্ধিজীবী, ২৪, ২৮, ১০৬
বুলডোজার, ৮৫
বেঙ্গল, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ১৫৭, ১৯১, ৩৪৩, ৩৪৪
বেঙ্গল ক্রাউন এস্টেটস ম্যানুয়াল, ৬১, ১৯১
বেঙ্গল টেনান্সি (বৈধকরণ এবং সংশোধন) অ্যাক্ট, ৬১
বেদখল, ১১, ৪৭, ৫৮, ৮০, ৯৩, ১১০, ১২২, ১৩৭
বেসরকারি, xiv, ১৯, ৭৭, ৯৩, ১১৯, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৫২, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৮৫, ১৮৮, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২৪৩, ২৭০, ২৭১, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৯১, ২৯৬, ৩১৪, ৩২৩, ৩২৮, ৩৪৫, ৩৫৬, ৩৫৭
বৈধ দাবিদার, ১৬০, ১৭৫, ২৭৬, ২৮০,
বৈরী অন্তর্ভুক্তকরণ, ২১৭
বৈরী-প্রতিকূল পরিবেশ, xi
বৈশ্বিক সংকট, ৮
বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীনস্থ সত্তা, ২১৮
বৈষম্য-অসমতার শিকার, ১১৭
বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা, ৩৭
বোনারপাড়া, ১৭৪
ব্রাত্যজন, ১২, ১৬
ব্র্যাক, ১২৫
ব্রাহ্মণখালী, ১৭৬
ব্রিটিশ, ৩, ৬. ৭, ৩৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৯৭, ৯৮, ১৫৭, ১৯১
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক, ৬২
ব্রিটিশ পুঁজিবাদ, ৬২

ভ

ভদ্রা নদী, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩
ভলটেয়ার, ৩৮
ভাগচাষ, ৯৩
ভাগচাষী, ৯৭
ভাণ্ডারপাড়া, ১৪০
ভালো আইনের মন্দ প্রয়োগ, x
ভাসান পানি, ১৩৪
ভিত্তিকাঠামো, ৩, ৪৭
ভুয়া দলিল, ৮২

ভূপ্রকৃতি, ২৫০
ভূমি অধিকার, ১২, ৩১, ৩৫, ৩৯, ৪২, ৪৬, ৩৮, ৫৮, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ৯৭, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮, ১৭১, ১৭২, ১৮৪, ২০০, ২০১, ২০৭, ২১০, ২১৮, ৩৬৬, ৩৩৭
ভূমি অধিকার কর্মী, ৪২, ৫৮, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৬, ৯৩, ১০৬, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮, ১৭১, ১৭২, ২০০, ২০১, ৩৬৬
ভূমি অধিগ্রহণ, ৩৮, ৭১, ১০৯, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ২২৭, ২৭২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৭
ভূমি আইন, x, xii, xiv, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪১, ১৮৭, ১৯২, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২৩১, ২৩৩, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪
ভূমি আইন বাস্তবায়ন, ৭, ১৩, ৩২, ৪০
ভূমি আইন বাস্তবায়ন সমস্যা, ১৩
ভূমি আইনের অর্থনীতি, ৮, ৪
ভূমি আইনের রাজনীতি, ৭, ৪০
ভূমি আইনের সমস্যা, ১৩, ৩০
ভূমি আচ্ছাদন, ১৮৯
ভূমি উদ্ধার, ২৯৭
ভূমি কর্মকর্তা, ৭৭, ৭৮, ১৩৪, ১৩৬, ১৯৯, ২০০, ৩১০, ৩১৭, ৩৩৯, ৩৪৮, ৩৫৬, ৩৭১, ৩৭২
ভূমিখাজনা, ৫
ভূমিগ্রাসী, ৫৭, ৬০, ৭৫, ৯৫, ১০৩, ১৭৬
ভূমি জোনিং, ১৯২, ১৯৬, ১৯৮, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭
ভূমি ডেটা ব্যাংক, ১৯২, ১৯৭, ২৯৮, ২৯৯
ভূমি দখল, ১১০
ভূমিদাস, ৫
ভূমি-ধনী, ২১৮
ভূমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা-বিবাদ, ২০
ভূমিনির্ভর, ৯, ৪০
ভূমি নীতি, ৪, ২৮৯, ৩০২
ভূমি প্রশাসন, ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৬৩, ১০৬, ১০৭, ১২৪, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২২৫
ভূমি ব্যবস্থাপনা, ৪১, ৫৪, ৬৭, ১০৩,১০৬, ২২৩, ২৯৯
ভূমি মামলা, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ২১৮
ভূমি মামলা কর্পোরেটাইজ, ২৩
ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়, ২১
ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি, ২১
ভূমি মালিকানার পুঞ্জীভবন, ২১৮
ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়নবান্ধব, ৯৩
ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ৬৭
ভূমি রেকর্ড, ৮৭, ১৬৭, ২১৭, ৩০৮, ৩২০
ভূমি রাজস্ব কমিশন, ৯৯
ভূমি শাসন ব্যবস্থা
ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন
ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান, ৩৩, ২১৩, ২০৯
ভূমি সিলিং পদ্ধতি, ৯৯
ভূমিকেন্দ্রিক সহিংসতা, ৩৬
ভূমিদস্যু, ৫৮, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ১০৪, ১০৪, ১১৩, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ২০০, ২১৮, ৩১৭
ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যুপগাষ্ঠী, ২১৮
ভূমির অর্থনীতি, ৭
ভূমির ওপর অধিকার-মালিকানা-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব-দখল, ৪
ভূমির ওপর কৃষকের অধিকার, ৬২
ভূমির উপযোগমূল্য, ৩৬
ভূমির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, ৯৭
ভূমির পুঞ্জীভবন, ২১৮
ভূমির প্রকৃত মূল্য, ১৭০
ভূমির ব্যবহার ধরন, ১৮৯
ভূমির রাজনীতি, ৭
ভূমিহীন, x, xiv, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৬৯-৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১৩৯, ১৪১-১৪৯, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২,

১৯৫, ১৯৮, ২১৭, ২১৮, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯-২৪৪, ২৯১, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৭, ৩০৯-৩১৫, ৩২০, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫
ভূমিহীন কৃষক, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৯, ১০৪, ১৪২, ১৪৩, ১৮৭, ২৪৩, ৩১০, ৩১৫
ভূমিহীন পরিবার, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৮৪, ২৪০, ৩১১
ভূমিহীন পরিবারের অধিকারের ন্যায়ানুগ স্বীকৃতি, ৭০
ভূমিহীন বাছাই কমিটি, ৭৯, ৮২
ভূমিহীন বাছাইপ্রক্রিয়া, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮১
ভূমি ব্যবহার, ১৭, ২৬, ৩৯, ১১০, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২২২, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫
ভূমিহীন সমিতি, ৮২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯
ভূমিহীন সংগঠন, ৭৫, ৮৭, ৮৮, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭
ভূমিহীনতা, ৭০, ৭১, ২১৮, ৩৬১, ৬৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
ভূমিহীনদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রণয়ন, ৬৭
ভূমি সংস্কার, ৬০, ৬৩, ১০৭, ১২৪, ২১০, ২১৭, ২২৫, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৫, ৩০৮, ৩২০, ৩৫২
ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ৫৯, ৬১
ভূমি সংস্কার কমিশন, ২১৮, ৩২০
ভূমি সংস্কার কর্মসূচি, ৬৩
ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচি, ৫৯, ৬১
ভোগান্তি উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনকারী, x
ভোগান্তিবর্ষ

ম

মঞ্জুরি, ১৫৯
মজিদ, ১৪৫
মজুরিশ্রমিক, ৬
মৎস্য অধিদপ্তর, ১২৬, ১৪০, ১৪৩, ২৬৬, ২৬৭, ৩৩৯, ৩৪০
মৎস্য চাষ এলাকা, ৬২
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, ১২০, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৪৮, ২৫৮, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪১
মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ১৩২
মতাদর্শের মৃত্যু, ৩০
মধুপুর, xv, ৮১, ৮৩, ১০৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৬, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২২২, ২২৩, ২৯৫
মধ্যস্বত্বভোগী, ৬২, ৯৮
মন্ত্রণালয়, ৫৮, ৬৩, ৬৫, ৭৪, ১০৯, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৫, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ১২১, ২১৬, ২১২, ২২২, ২২৫, ২৩৫, ২৩৭, ২৪১, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৯, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৬-৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬
আইন মন্ত্রণালয়, ২১৬
ভূমি মন্ত্রণালয়, ৬৫, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৯৭, ২২১, ২২২, ২২৫, ২৩৫, ২৩৭, , ২৪১, ২৪৫, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৬২-২৬৬, ২৬৮, ২৮৯, ২৯৮, ২৯৯, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৭, ৩২০, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ১২৬
শিল্প মন্ত্রণালয়, ১৯৫, ২৯৬, ৩২০
মণ্ডল, নিউটন কুমার, xvi
মোস্তফা, গোলাম, , ১৪৫
ময়মনসিংহ, xv, ৪২, ১৩৯, ১৭২, ২০১
মহাজন, ১২৩
মহামন্দা, ১১, ১১৯
মহিলা অধিকার সংস্থা, ৯৩
মাগুরখালী, ৮৭
মাটির জৈবিক গুণাগুণ, ২০২
মাঠজরিপ, xvi
মানবাধিকার কর্মী, xv
মানবিক আইনি কাঠামো, x
মানবিক বিকাশ, x
মানবিক ভুল, ১৩
মানবীয় কর্মকাণ্ড, ১৮৯
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ৩৬, ৩৭, ৫৪, ৬০, ৯২, ৯৭, ১১৬, ১৫১, ১৫৮, ১৯৪, ২১০, ২২৫, ৩০৫
মান্নান, আব্দুল, ১৪৫, ১৪৯
মামলা, ৪, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৭৯, ৮২, ৮৭, ১১২, ১২৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৬, ১৬৮, ১৬৫, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৮৫, ১৯৬, ১৯৮, ২১০, ২১৭, ২১৮, ২৫৭, ২৬২, ২৬২, ২৭৬, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৯, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৫৬, ৩৮৯, ৩৯০
মামলা-মোকদ্দমা, xi, ৩৮, ১১০, ১৩৮, ২১৭
মার্কস, কার্ল, ৩৮, ২২৬
মালিকানা, ৪, ১৬, ১৭, ২১, ৩৩, ৩৬, ১২২, ১২৩, ২১৪, ২১০, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২৪৬, ২৭৬, ২৮০, ২৯৯, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৬
ব্যক্তিগত মালিকানা, ২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ২৫
সমবায়ী মালিকানা, ২৫, ২৬
মাহাতো, শিল্পী রাণী, xv
মিঠাপানি, ১১৯, ১২১
মিত্র, বিমল, ১৪১
মিয়া, আরিফ, xvi, ৩৭৯
মির্জাবাড়ী, ১৪৩
মিল, জন স্টুয়াট, ৭
মিশনারি, ৮৭
মিস্ত্রী, সরোজ কুমার, ১৪২
মুক্তবাজার, ৩০
মুক্তবাণিজ্য, ৩০
মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, ৬
মুদ্রা, ৫, ৬, ৮, ২৪, ৪০, ১৭৩, ২৪৭, ৩১৯
মেট্রোপলিটন এলাকা, ৭২
মেট্রোরেল প্রকল্প, ১৭৬
মোকদ্দমা, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৬, ৩৩৩
মেমো, ৩৭, ৩০৫
মোঘল সম্রাট, ৯৭
মোতালেব, ১৪৫
মোহাম্মদ, নূর, ১৪২
মোংলা, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০
মৌজা, ৬৭, ৭৬, ৭৯, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৪৬, ৮৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১২০, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৪৪, ১৫২, ১৭৬, ১৯৮, ২১০, ২৪৩, ২৬৫, ২৭৪, ৩১৪, ৩৩৯, ৩৪৭
মৌজা ম্যাপ, ৮৭
মৌলিক দায়বদ্ধতা, ৬৩
মৌলিক মানবাধিকার, ২৫, ৩১, ১৭০
মৌলিক সংস্কার, ৩৩, ২১৩, ২১৬
ম্যালথাস, থমাস রবার্ট, ৭
ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন, ১৭৬
ম্রো, ১০৬

য

যথাযথ আইনি সংশোধন, xii
যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ১৫৮
যুগ্ম জেলা জজ, ১৭০, ১৮২
যুগ্মসচিব, ৬৫, ৩০৮, ৩৩৬
যোগান ৮, ৪০, ৪১, ৭৭, ১২৩, ১৭৩
যোগ্য প্রার্থী, ৬৯, ৭২, ৮০, ৯৫, ১০৪
যৌথ তালিকা, ১৫৯, ১৬২, ১৬৫, ২৭১, ২৭২, ২৭৫
যৌথ বন্দোবস্ত, ৬৪

র

রংপুর, xv, ৪২, ৩০৮
রজ্জু, ১৬৫
রপ্তানি উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল, ১৫৭
রশিদ, মামুনূর, xv
রহমান, ড. মিজানুর, ১৭৯
রহমান, মুজিবর, xv
রহমান, মো. মাকছুদুর, ১৭৯
রহিতকরণ ও হেফাজত, ১৫৯, ২৮৭
রাউলস, জন, ১৬
রাঙ্গামাটি, ৪২, ১৫৮, ২৩৬
রাজনীতি, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ২২, ৩৮, ৪০, ৪১, ২১৯
রাজনৈতিক অঙ্গীকার, x, xiv, ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৭-৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫২, ৫৪, ৬২, ৮০, ৮১, ৮২, ৯০, ৯১, ৯৪, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৫০, ১৭৩, ১৮১, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৫, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
রাজনৈতিক অর্থনীতি, xiv, ৮, ৯, ৩০, ৩২ ৪০, ৫৪
রাজনৈতিক ইতিহাস, ৬২
রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়, প্রশাসনের সহযোগিতায়, ১৩৪
রাজনৈতিক দল, ১৯, ৪৭, ১৪৬
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ৪৭, ৯০, ৯১, ১০৭, ১১৪, ১৫০, ১৮১, ২০৮, ২১৪
রাজনৈতিক প্রভাব, ৮০, ৮১, ৯৪, ১০৬, ১০৭, ১৩৮, ১৪৪, ২০১
রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-পেশী-অর্থশক্তি, ১৭০
রাজনৈতিক সদিচ্ছা, ৩৩, ২১৩, ২১৯
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ৩১
রাজশাহী, xv, ২২৪, ২৩৭, ৩০৭
রাজস্ব বিভাগ, ১২৩
রানী এলিজাবেথ, ৬
রানী ক্যাথরিনা, ৬
রাবার চাষ, ১০৫, ১০৬
রামরি পাড়া, ১১০
রায়, ২১, ২২, ৮২, ১৪৭, ১৪৯, ২৮৩, ২৮৪
রায়, ধ্রুবল চন্দ্র, xvi
রায়, নিরোদ চন্দ্র, xv
রায়, সুপ্রিয়া, xv
রায়ত, ৬০, ৬৪, ৯৮
রায়হান, সেলিম, ২২৫
রাষ্ট্র, ২, ৫, ২৫, ২৬, ৩৩, ৪৭, ৬০, ৬৮, ৯৫, ৯৬, ১৭১, ২১৩
রাষ্ট্রপতির আদেশ, ২৩৫, ২৪৫
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, ২৫, ৯৫, ৯৬
রাষ্ট্র বিধান, ২
রাষ্ট্রশক্তি, ২
রাষ্ট্র-শাসকশক্তি, ২
রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি, ১০
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৯৮, ৯৯, ১২৩, ১৯০, ১৯১, ৩৪৫
রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা, ৬৯
রাসেল, রফিকুল ইসলাম, xvi, ৩৭৯
রিকার্ডো, ডেভিড, ৭, ৩০
রিজার্ভ ফরেস্ট, ১৯৪, ২০৪, ২৯৫
রিট, ৭৮
রুশো, ২৯
রূপকল্প ২০২১, ২১৮
রূপগঞ্জ, ১৭৬
রেকর্ডীয় জমি, ৮৭
রেজা, সেলিম, xvi, ২২৫, ৩৭৯
রেজিস্টার, ৫৯
রেজুলেশন, ৯৮, ৩৫৫
রেন্ট এ্যাক্ট, ৯৮
রেন্টসিকার, ১২, ৩৩, ৫২, ৯০, ৯১, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৪৩, ১৫০, ১৮১, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২১৮
রেন্টসিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, ৫২, ৯০, ৯১, ১১৪, ১৫০, ১৮১, ২০৮, ২১৪
রেন্টসিকিং, ১১, ১২, ২১, ২৩, ৩০, ২১৯
রেলপথ, ১৫৭, ১৭৮
রেয়াতী মূল্য, ২৪৭

রোজ, রেজানুর রহমান, xiv
রোয়েদাদ, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৭, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮

ল

লক্ষিরাজ, ৯৮
লাইসেন্স, ১২৫, ১৩০, ২৬৭, ৩৪০
লাকী, আয়েশা সিদ্দিকা, xvi
লাপ্পু, কবিরুজ্জামান, xvi, ৩৭৯
লাল পতাকা, ৮০
লিগ্যাল, ৮২
লিঙ্গবৈষম্যহীন, ৯৩
লিজ, ৬৩, ৬৫, ১০৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৭, ১২৩, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৫২, ২৭৯, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১
লুটতরাজ, ৪৭
লুটেরা, ১১, ১৪, ১৭, ২৪, ৩০, ২১৯
লেখার হরফ আবিষ্কার, ৫
ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (এলএ) , ১৫৮
ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাকশন প্রোগ্রাম (এলআরএপি), ৬৩

শ

শফিকুজ্জামান, ড., xvi
শব্দগত উপস্থাপন, ৭১
শরাফপুর, ১৪০, ১৪২
শস্য, ১২২, ১৮৯, ১৯১, ২০৩, ২০৪, ২৯৩, ২৯৮, ৩৫৭
শস্য-নিবিড়তা, ২০৩
শহর-বন্দর-গ্রাম-চর-হাওর-বন-পাহাড়, xiv, ৩৭৯
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৬৩
শাওলী, হাসনা হেনা, xiv, ৩৭৯
শালবন, ২০৬, ২২২
শাসক, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ৪০
শাসকশ্রেণি, ৩৮, ৬৪
শাসনব্যবস্থা, ৯, ২৯, ৪০, ২৭৩
শাসিত, ৯, ১৩, ১৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৪০, ১০০, ১০১১০৪, ২৪৯, ২৯৮, ২৯৯, ৩১৮
শাস্তি, ১৫, ৬৪, ১৩১, ১৬১, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ২৪১, ৩১২, ৩৪৮
শাহীন, সাইদ, ২২৭
শিকারবৃত্তি, ৪
শিবনগর, ৮৭, ৮৮, ৮৯
শিল্পায়ন, ৬০, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫
শিল্পোন্নয়ন, ২৯০
শুনানি, ২৩, ১৬০, ১৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ৩১৩
শোভন, xv, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৪, ৪৭, ৫৫, ২১৩, ২১৯, ২২৪
শোভন পৃথিবী, ২১৯
শোভন উন্নয়নপ্রক্রিয়া, ৩১
শোভন রাজনীতি, ৩৩, ২১৩, ২১৯
শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ, ৩৩, ২১৩, ২২৪
শোভন সমাজ, xv, ২৯, ৪৪, ৪৭, ৫৫
শোভন সমাজব্যবস্থা, ২১৯
শোষক, ৫, ৯, ১৩, ২৩, ২৭
শোষক শ্রেণি, ৯, ১৩, ২৩
শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা, ২১৯
শোষিত, ৯, ১০, ২৯, ১৩৯
শোষিত শ্রেণি, ৯, ১০
শ্মশান, ২৪৭, ২৫০, ২৭২, ৩৪০
শ্রমজীবী, ১৫, ১৬, ১৯
শ্রেণিকাঠামো, ১৩, ৩৬
শ্রেণিনিরপেক্ষ, ২, ৩
শ্রেণিবিভাজন, ২, ৬৫
শ্রেণিস্বার্থ, ২, ৩, ৩৩

স

সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৫, ২০, ২৮, ২৯, ৭৭, ২৪৩, ৩১৪, ৩২৪
সংখ্যালঘু, x, ২১৮
সংগ্রহবৃত্তি, ৪

সংজ্ঞা, ১৪, ২৮, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮৯, ৯০, ১০৩, ১০৪, ১১৩, ১২৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৮০, ১৮৩, ১৯২, ১৯৬, ২০৭, ২১৩, ২১৪, ২৪১, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৭০, ৩১২, ৩১৭, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫১, ৩৮৮
সংবিধান, ১৩, ৩৪, ২৫, ২৬, ৬৮, ৬৯, ২২২, ২৬৯
সংবিধানের মৌলিক অধিকার, ৬৬
সংসদ সদস্য, ৬৯, ১২০, ১২৭, ১৩৩, ১৪১, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৯, ২৬০, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩২০, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৫৫
সংস্কার, ১২, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৯২, ৯৬, ১০৭, ১১৬, ১২৪, ১৪২, ১৫৬, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৪, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২৩৫, ২৩৭, ২৫০, ২৮১, ৩০০, ৩০৫, ৩০৮৩২০, ৩৫২০৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
সক্ষম পুত্র, ৫৮, ৬৭, ৭৪, ৭৬, ৯২, ২৪১
সক্ষমতা, ২৪, ১২০
সদস্যসচিব, ৬৫, ৮৬, ৮৯
সন্ত্রাসী বাহিনী, ৮৭
সভাপতি, ৬৫, ৮২, ১১২, ১৪৫, ১৯৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭, ৩০২, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪
সভ্যতার প্রভু, ৩, ২৯
সমবায় অধিদপ্তর, ১২৩, ২৫৩, ২৫৫, ৩২৫, ৩২৭
সমাজ, xi, ২, ৩, ৪, ৫, ১২, ২৪, ৪৭, ১৩৮, ২১৯, ২২৪, ২২৭, ৩২৭
সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র, ১১, ৩৬, ২১৩, ২১৯, ২২৪
সমাজতন্ত্র, ৯, ২৪, ৬৮
সমাজপরিবর্তনের বিপ্লব, ২৮
সমাজপরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ১৭
সমাজের পণ্যায়ন, ৫
সমীর হাট, xvi
সমুদ্রগর্ভ, ১৯৫, ২৯৭
সম্প্রদায়, x, ১২৩, ১৪৪
সম্ভাব্য প্রার্থী, ৭১
সরকার, গৌতম কুমার দে, xv
সরকার, পবিত্র, xv
সরকার পরিবর্তন, ২৪
সরকারি, ১৪, ৪২, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬০, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৯, ১৮০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৫, ২০৬, ২১৭, ২১৮, ২২২, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮, ৩১৪, ৩১৮, ৩১৯, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮
সরকারি ইজারামূল্য, ১২৯, ১৩৩, ২৫৬, ৩২৮
সরকারি গেজেট, ১৫৬, ১২৬৮
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ৩৯, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৭৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ২১৪, ২১৫, ২২২, ২৫৩, ২৬৭, ৩২৫, ৩৪১, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫

সরকারি দপ্তর, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১৫৭, ২৪৭, ৩১৮
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, ১২৮, ১৩২
সরকারি মালিকানা, ৫৭, ৫৮, ২১৭
সরকারি সম্পত্তি, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ১৪৪, ১৪৬
সরল বিশ্বাস, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৬, ১৭১, ১৮৩
সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ, ১৬১
সরেজমিনে তদন্ত, ৬৬, ৭৫, ৮৬, ৮৯, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪৯, ৩০৯, ৩১১, ৩১২
সরোয়ার, মিয়া গোলাম, ১৪১
সহকারী কমিশনার (ভূমি), ৬৭, ৭৩, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৬০, ২৬১, ২৬৫, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৯
সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ১২৭, ১২৯, ২৬৪, ৩৩৭
সশ্রম কারাদণ্ড, ১৯৩
সাংঘর্ষিকতা, ১৩, ৪৪, ৪৫, ৫০, ৫১, ৮৯, ৯০, ১১৩, ১৪৯, ১৬৫, ১৮০, ২০৭, ২০৮, ২১৪
সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, ১৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৮৩
সাঘাটা, xv, ১৭৪
সাচিবিক সেবা, ১৯৭
সামন্ত, ২৯, ৬২
সামন্ততন্ত্র, ৯
সামন্ত প্রভূ, ৬২
সামন্তবাদ, ৫, ৬, ৬২
সামন্তবাদী জমিদারি ব্যবস্থা, ৬২
সামন্তবাদী সিস্টেম, ৬
সামরিক সরকার, ৬২
সামাজিক আইন-বিধান, ২
সামাজিক গবেষণায় রাজনৈতিক অর্থনীতির পদ্ধতিতত্ত্ব, ১৮
সামাজিক চাপ প্রয়োগ, ৯৪, ৯৬, ১১৭
সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার, ২৫
সামাজিক বনায়ন, ২০৫, ৩০০
সামাজিক বিজ্ঞান, ১, ২
সামাজিক বিধান, ১
সামাজিক বিধি-বিধান-আইন, ২
সামাজিক বিধি-বিধান-আইন-কানুন, ২
সামাজিক বৈষম্য, ৯৭
সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, ৯৭
সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, xi
সাম্রাজ্যবাদ, ৬, ২৪, ২২৪
সাব-রেজিস্ট্রার, xv
সাব-রেজিস্ট্রার অফিস
সাবালক, ১৬৪
সায়রাতমহাল, ১৯২, ৩৪৪, ৩৪৬
সার্কুলার, ২৫১
সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ, ১২৮৭, ১৯২, ১৯৭
সার্ফ, ৫
সার্বজনীন সম্পদ, ৪
সার্বিক, x, ২, ৩১, ৬৩, ৬৭, ৭৮, ৯৭, ১০৩, ২৪৩, ২৫১, ২৯১, ২৯৪, ৩১৫, ৩২৪
সার্বিক ইতিহাস, ৯৭
সার্বিক নির্দেশনা, ৯৭
সার্বিক সতর্কতা, ৬৭, ২৪৩, ৩১৫, ৩২৪
সার্ভেয়ার, ৮২, ১১২
সালিস আইন, ১৬১, ২৮৪
সালিসি, ১৫৭, ১৬৪, ১৭০
সাহস ইউনিয়ন, ৮৬, ৮৭
সাহাপুর বাজার, ১১২
সিআরইডি, ১২৫
সিএস খতিয়ান, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭
সিকদার গ্রুপ, ১০৬, ১০৮
সিকস্তি, ৬১, ৬৪, ১৯১, ৩৪৫
সিটি কর্পোরেশন, ১০১, ১৯৪
সিডর, ১১১
সিনথেসিস, ৮
সিবিএফএম, ১২৫
সিভিল সোসাইটি, ১০, ২৯
সিল টেন্ডার পদ্ধতি, ১২৪
সিলিং, ৫৯, ৭৬, ৯৯
সিলেট, ১২১, ২০৫, ২৩৭, ২৯৫, ২৯৭, ৩০৮
সিসমন্ডি, লিওনার্দ, ৭
সিসেরো, ৪
সুইজারল্যাণ্ড, ৭
সুনামগঞ্জ, xv, ৪২, ১২১, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯

সুবর্ণচর, ৭৬, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ১০৭
সুয়ালক, ১০৯
সুষম বন্টন, ২৬, ৭২, ৭৭
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ৬০, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ২৫৬, ২৬৫, ২৯৯, ৩২৯, ৩৩৯, ৩৪১
সুযোগ ব্যয়, ২১
সুযোগের সমতা, ১২, ২৬, ২৯
সুসংগঠিত কমিটি, ৯৫, ৯৭, ১০৪
সুসংহত আইনি ব্যবস্থা, x
সুস্পষ্ট সংজ্ঞা-নীতি-নির্দেশনার অভাব, ২১৩
সূচক, ৩৬
সেঁই, জ্যাঁ বাতিস্ত, ৭
সেটেলমেন্ট অফিস, ১১২
সেনগুপ্ত, সুভাস কুমার, xvi, ৩৭৯
সেনাকল্যাণ ট্রাস্ট
সেনাবাহিনী, ৬, ৮৪
সেলামী, ২৪২, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ৩১৪, ৩১৮, ৩২০
স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট, ৬০, ৬১, ৬২
সোহ্‌রাওয়ার্দী গা. মো, xvii
স্কোর, ১৮, ১৯, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৯০, ৯১, ৯৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৬, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৮, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬
স্কোরিং, ১৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৮, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬
আইনি অবস্থার স্কোরিং, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫১
স্থানীয় সরকার, ৭৫, ১২১, ১৯৪, ২০৬, ২৫৩, ২৬৮, ২৯৩, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৮, ৩২০, ৩২৫, ৩৪১, ৩৫১, ৩৫২
স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ৪২, ১৮৪
স্থানীয় ভূমি অধিকার সংগঠন ৮৭
স্থাবর ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ২২২, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ৩৪৯, ৩৬৯
স্থাবর সম্পত্তি ৩২, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ১৭৯, ১৮০, ২২২, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ৩৪৯, ৩৬৯
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা ১৫৮
স্থায়ী বন্দোবস্ত ৬৩
স্থায়ী রাজস্ব ৯৭
স্বচ্ছ, ৭৭, ৯৬, ১০৩, ১১৭, ২০৬
স্বচ্ছতা, ৪১, ৫২, ৬৯, ৭০, ৯০, ১১৪, ১২৩, ১৪৫, ১৫০, ১৭৮, ১৮১, ২০৮
স্বত্ব, ১৪, ১২৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৯৩, ২১৮, ২৬৬, ২৭০, ২৯৯, ৩৩৯
স্ব-স্বার্থ, ১১
স্বল্পমেয়াদি-মধ্যমেয়াদি-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, ২১৬
স্বাধীনতা, x, ৩, ২৫, ২৯, ৩৭, ৬২, ৬৩, ৯৯, ১১১, ১১৪, ১৯০, ১৯১, ২০২, ৩১৯
স্বামী পরিত্যক্তা নারী, ৯২
স্বামী পরিত্যাগ করা নারী, ৫৮, ৬৭, ৭১, ৭৬
স্বার্থান্বেষী মহল, ১৭২
স্বাধীনতাপূর্ব ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল, ১৯১
স্বায়ত্তশাসিত, ১০০, ১০১, ১০৪, ২৪৯, ৩১৪
স্টুয়ার্ট, স্যার জেমস্, ৭
স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণ, ৫৭, ৬৮
স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত, ৭০
স্বৈরাচারী সামরিক শাসক, ৬২
স্মারকলিপি, ১১০, ১৩৮, ১৪২
স্মিথ, এডাম, ৩, ১১, ৩৩

হ

হক, ফজলুল, xv
হক, মোজাম্মেল, xvi, ৩৭৯

হয়রানি, ৭৮, ৮৫, ১১০, ১১২, ১২৫, ১৩৫, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৮৪, ১৯৯
হর্টিকালচার, ২৯৩, ৩৪৬
হরণ, ১১, ৪৭, ১৩৩, ২১৮
হস্তান্তর, ১১, ৬৫, ৬৭, ৭৬, ৮১, ৮৮, ৮৯, ৯৮, ১০৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৪০, ২৫৮, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ৩১১, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪২
হাই, আব্দুল, ১৪৫
হাইকোর্ট, ৭৮৮
হাওর, xiv, ৪২, ৫৮, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৮, ১৯৫, ১৯৮, ২৪২, ২৫৩, ২৬৬, ৩২৫, ৩৪০, ৩৪৪
হাওরবাসী, ৪২
হাকিম, আব্দুল, ১৪৫
হামিদ, আব্দুল, ১৪৪
হায়দার, মির্জা মোঃ আজিম, xv
হালনাগাদ, ৫৭, ৫৮, ৭৩, ৭৯, ৯৩, ৯৬, ১১৬, ১২৭, ১৩১, ২১০, ৩১০, ৩৫৭
হালুয়াঘাট, xv, ১৩৯, ১৭২, ২০১
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি), ৩৬১, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭৪
হুদা, শামসুল, xvii, ২২৭
হুমকি, ৬০, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ১০৮, ১১০, ১২৫, ১৭৪, ১৯১, ২০২
হুকুমদখল, ১৪, ২৩, ৩৫, ৩৯, ৪০, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২১৪, ২১৫, ২২২, ২৬৯, ২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৫
হুকুমদখল অবমুক্তকরণ, ১৬০, ২৮১
হেক্টর, ১২২, ১৮৯, ২৯৬
হেডম্যান, ১১০
হোলমস্, ওয়েন্ডেল, ৩৮
হোসেন, আলমগীর xv
হোসেন, রেজাউল xvi
হ্রদ, ১২০, ৩২৫

A

Access, ৩৩, ২২৯, ২৩০
A Contribution to the Critique of Political Economy, ৭
An Inquiry into Principles of Political Economy, ৭
"Appearance" to "essence", ৮
Aquarian Reform, ১২৩
arithmetic mean, ৪৯
Assumption, ২৭
A Treatise on Political Economy, ৭

B

Barkat, Abul, ৩৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৮, ১৫৮, ১৮৯, ১৯১, ২২৮, ২২৯
Basic structure, ৩
BS Khatian, ১৯০
burden of proof, ৭

C

Capitalism, ৯, ২৩০
Cartesian framework, ১
Certificate of Land Ownership (CLO), ১৯৬, ২৯৯
Chang, Ha-Joon, ২২৯
Commodification of nature, ৫
Commodification of society, ৫
consent engineering, ২৪
consent manufacturing, ২৪
Content and essence, ১
Contract, ৫, ২২৯
Cost of corruption, ২২
Culture of injustice, ২২
Culture of silence, ১৫

D

Das Capital: Critique of Political Economy, ৭

Dominance of criminalise oligarchs regulated by rent-seekers, ১০

E

End of ideology, ৩০
Epistemologically, ১
Expected state/situation, ১৮
Externalities, ২১

F

Feudalism, ৫
Financialised capital, ১১
Flawed framework, ১
Form and appearance, ১
"Form" to "content", ৮

G

Ghosh, P. S., ২২৮
Good governance, ১২

H

Human error, ১৩

I

Ideal state/situation, ১৮
Ideological, ২৪
Illegitimate, ৭
Income-food-nutrition poverty, ১২২
Indicator, ৪৪
Indicator selection, ৪৪
Informed, ৪৪
Instrument, ৪৪
Invisible hand of market, ১১

J

Justiciable, ১২২

L

Land Cover, ১৮৬
Landlord, ৫
Land Policy, ৪
Land rent, ৫
Land use, ১, ৪, ১৪৯, ৩০২
Law, ১, ২, ৩, ৪, ৬, ২২২, ২২৮, ২৯৩, ৩০০
Law of nature, ১, ২
Application and implementation of law, ১
Use of law, ১
Liberty-Equality-Fraternity, ৬
Legitimacy, ৭

M

Masters of mankind, ৩
Methodology, ১
Moral science, ৭

N

Natural science, ১, ৭
Negative sum game, ১১
Neoliberalism, ২২৯
Neo-liberal doctrine, ৩০
New horizon in social research, ১৮
New Principles of Political Economy, ৭
Non-bailable, ১৪৫
Non-financial, ১৪

O

One-sided class struggle, ৩০
Osman, Asmar, ১৮৯, ২২৯
Operational definition, ২৮

Organic intellectual, ২৮

P

Pattern, ২০, ১৮৯
Pattern under general situation, ২০
People’s consent, ২৬
Pessimism of the intellect and optimism of the will, ২৮
Political Arithmetic, ৭
Political Economy, ৭, ৮, ৪১, ২২৮, ২২৯, ২৩০
Possession of knowledge, ৩
Power, ৬, ৭, ১২, ২২৮
Praxis, ৪৩
Principles of Political Economy, ৭
Principles of Political Economy and Taxation, ৭
Prioritization, ৪৪
Production relations, ৩

Q

Qualitative, ১৮, ৪৩
Quantitative, ১৮, ৪৩, ৩০৫
Qui Bono, ৪

R

Rahman, M. I., ২২৯
Record of Rights, ১৪৪
Reform, ১২, ৫৯, ১২৩, ২২৮,, ২২৯, ২৩০
Regime change, ২৪
res cognitans, ১
res extensa, ১
Retention, ১৩
Right, ১৮, ১৪৪, ২৩০
Rule of Law, ৬
Rule/law of nature, ১
Rule/law of society, ১

S

Score value, ১৮
selfinterest, ১১
Slavery, ৫, ১৬
Social science, ১
Specialisation, ৮
State, ৭, ১৮, ২২৮, ২২৯
Subjective, ১৯
sufferings-year, ২১
Suhrawardy, G. M., ৬০, ৬১, ৬৩, ১৮৯, ২২৮, ২২৯
Superstructure, ৩

T

Tax slavery, ১৬
Technological determinism, ১৭
The Political Anatomy of Ireland, ৭
Theoretical and practical meaning, ১

U

UK Essays, ১২৩, ১২৪
Uncertainty, ৪৫
Use of knowledge, ৩

V

Veils of ignorance, ১৬
Village Improvement Act ১৯৮, ২৯২

W

Wealth transfer, ১১

Z

Zero sum game, ১১

আবুল বারকাত-এর নির্বাচিত গ্রন্থ

১. *নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ: ২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত– ২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা।* ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, মার্চ ২০২১। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৯০১-১।

২. *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে।* ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, নভেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮৩৬৪-৫।

৩. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও সুপারিশ* (খণ্ড ১)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১।

৪. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল* (খণ্ড ২)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।

৫. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন* (খণ্ড ৩)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৩।

৬. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত* (খণ্ড ৪)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৪।

৭. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– বালুমহাল, চরের জমি, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা, চা বাগানের ভূমি* (খণ্ড ৫)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৫।

৮. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– জলমহাল* (খণ্ড ৬)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৬।

৯. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– দেবোত্তর, ওয়াক্‌ফ* (খণ্ড ৭)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৭।

১০. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– আদিবাসীদের ভূমি* (খণ্ড ৮)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৮।

১১. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন* (খণ্ড ৯)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৯।

১২. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি সংস্কার, রেজিস্ট্রেশন, কৃষি ভূমি ব্যবহার* (খণ্ড ১০)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১০।

১৩. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি রেকর্ড ও জরিপ* (খণ্ড ১১)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১১।

১৪. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ট্রাস্ট* (খণ্ড ১২)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১২।

১৫. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* (খণ্ড ১৩)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১৩।

১৬. *Bangladesh Migration Governance Framework.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: Asmar Osman, Sk Ali Ahmed. Dhaka: International Organization for Migration (IOM), 2020.

১৭. *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ১, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৫০৩৯-৫।

১৮. *বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৬৬২৯-৭।

১৯. *বাংলাদেশে মৌলবাদ: জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৩২৩৫-৩।

২০. *অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-২৪৬৭-৯।

২১. *Agriculture Production Practices in Chittagong Hill Tracts.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman, M. A. Sobhan & R. B. Rafique. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and Human Development Research Centre (HDRC), 2017. ISBN: 978-84-34-2552-2.

২২. *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এম তাহের উদ্দিন, রওশন আরা, ফরিদ এম. জাহিদ, এবং এম. বদিউজ্জামান। বাংলা অনুবাদ: সেলিম রেজা ও সাজেদা রেহানা, ২০১৭। ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০৩৫০-০২৫১-৪।

২৩. *Rural Land Market in Bangladesh: An Exploratory Study with Poor and Marginalized People*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman & A (Aroni). Barkat. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and HDRC, 2017. ISBN: 978-984-34-1450-2.

২৪. *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।

২৫. *Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh.* Dhaka: MuktoBuddhi Publishers, 2016. ISBN: 978-984-34-0891-4.

২৬. *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩৭৬-০।

২৭. *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৭৯১-১।

২৮. *Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. H. Khan, S. Majumder, M. Badiuzzaman, N. Sabina, K. Ahamed & Md. Abdullah. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2015. ISBN: 978-984-8866-99-3.

২৯. *Economic Impacts of Inadequate Sanitation in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-author: Marc P. DE Francis. Dhaka: The World Bank, 2012.

৩০. *The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. U. Chowdhury, N. Nargis, M. Rahman, M. S. Khan, A. P. Kumar, S. Bashir & F. J. Chaloupka. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2012.

৩১. *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: R. Ara, M. Taher Uddin, F. M. Zahid & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Ramon Publishers, 2011. ISBN: 984-70350-0080-0.

৩২. *Social Protection Measures in Bangladesh: As Means to Improve Child Well-being.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. Karim & A. A. Hussain. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2011. ISBN: 978-984-8866-38-2.

৩৩. *Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Hoque, S. Halim & A. Osman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2009. ISBN: 978-984-70212-0021-4.

৩৪. *বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. জামান, এম. এস. খান, এ. পোদ্দার, এস. হক এবং এম. তাহের উদ্দিন। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৭-৭।

৩৫. *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি ও জলায় দরিদ্রের অধিকার।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস জামান ও এস রায়হান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং ওবায়দুর রহমান। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৩-৯।

৩৬. *চেতনায়নেই উন্নয়ন: বাংলাদেশে নিজেরা করি'র অভিজ্ঞতা।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. হালিম, এ. পোদ্দার এবং এ. ওসমান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং সেলিম রেজা। ঢাকা: নিজেরা করি, এইচডিআরসি ও পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৮৬৬-১৪-৬।

৩৭. *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, M. S. Khan, A. Poddar & M. Taheruddin. Justice Mohammad Gholam Rabbani. (Foreword). Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0017-7.

৩৮. *Development As Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Halim, A. Poddar, A. Osman & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0005-4.

৩৯. *Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: P. K. Roy & M. S. Khan. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2007. ISBN: 984-8120-67-X.

৪০. *বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: পি. কে. রায়। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, ওবায়দুর রহমান ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৭। আইএসবিএন: ৯৮৪-৮১২০-৬৬-১।

৪১. *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage.* Principal author: Abul Barkat, Co-author: P. K. Roy. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori, 2004. ISBN: 984-32-1577-X.

৪২. *বিশ্বায়ন ও নারী: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এ কে এম. মাকসুদ ও মাহ্‌বুব কবীর। ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০২। আইএসবিএন: ৯৮৪-৩২-০১৭০-৬।

৪৩. *Political Economy of Khas Land in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, & S. Raihan. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 2001. ISBN: 984-31-482-5.

৪৪. *An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman, A. Poddar, M. Ullah, K. A. Hussain & S. K. Sengupta. Dhaka: PRIP Trust, 2000. ISBN: 984-31-0920-6.

৪৫. *Political Economy of Vested Property Act in Rural Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman & A. Poddar. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 1997. ISBN: 984-30-0251-4.

৪৬. *Family Planning Unmet Need in Bangladesh: Shaping of a Client-Oriented Strategy.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. R. Howlader, B. Khuda, J. Ross & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation Bangladesh, 1997. ISBN: 984-8175-17-2.

৪৭. *Transforming Human Deprivation into Human Development: DipShetu Experience of Integrated Socio-economic and Health Programs for the Destitute in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Ullah & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation, Bangladesh, 1995. ISBN: 984-8175-00-8.